সাইমুম-৪৯

বিপদে আনাতোলিয়া

আবুল আসাদ

সাইমুম সিরিজ কপিরাইট মুহতারাম আবুল আসাদ এর
ইবুক কপিরাইট www.saimumseries.com এর।

ইবুক সম্পর্কে কিছু কথা

সম্মানিত পাঠক,

আসসালামু আলাইকুম

সাইমুম সিরিজকে অনলাইনে টেক্সট আকারে আনার লক্ষ্য নিয়ে ২০১২ সালের ১৭ই আগস্ট গঠন করা হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট (SSUP) গ্রুপ। তারপর বিভিন্ন ব্লগে ও ফেসবুকে প্রোজেক্টের জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করা হয়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন একঝাক স্বেচ্ছাসেবক এবং এই স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট টীম। টীম মেম্বারদের কঠোর পরিশ্রমে প্রায় ৮ মাসে সবগুলো সাইমুম অনলাইনে আসে। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

SSUP টীমের পক্ষে

Shaikh Noor-E-Alam

ওয়েবসাইটঃ www.saimumseries.com

ফেসবুক পেজঃ www.facebook.com/SaimumSeriesPDF

ফেসবুক গ্রুপঃ www.facebook.com/groups/saimumseries

১

মিসেস গাজেনের বাড়িটা সুন্দর একটা ডুপ্লেক্স। নিচের তলাতে থাকে আয়া ও পরিচারিকা। রান্না-বান্না, ষ্টোর সব নিচ তলাতেই। সব মিলিয়ে নিচ তলায় ৫টি ঘর।

নিচ তলা থেকে সার্চ শুরু করেছিল আহমদ মুসা।

কাজে লাগতে পারে এমন কিছুই পেল না সে নিচ তলায়।

নিচ তলায় সিঁড়ির গোড়ায় বড় একটা লাউঞ্জের মত জায়গা। নিচ তলার কেন্দ্র এটাই। এখান থেকে রান্নাঘর, স্টোর, ড্রয়িং, শোবার ঘর সবই দেখা যায়। এখানে দোল খাওয়া একটা ইজি চেয়ার।

আহমদ মুসা আয়াকে জিজ্ঞেস করল, ‘এ ইজি চেয়ারটা কার?’

সার্চের সময় আয়া ও পরিচারিকাকে আহমদ মুসা সাথেই রেখেছিল।

‘এখানে ম্যাডাম বসতেন। ছুটির দিন কিংবা অফিস থেকে আসার পর বিকেলে এখানে বসতেন। আমরা কাজ তরতাম, আর তিনি বসে বসে দেখতেন এবং গল্প করতেন।’ আহমদ মুসার প্রশ্নের উত্তরে বলল আয়া।

পরিচারিকা ও আয়া দু'জনেই মধ্যম বয়সের। পরিচারিকা গোবেচারা চেহারার, কিন্তু আয়ার চোখ-মুখ খুব শার্প। আর্মেনীয়, না তুর্কি বুঝা মুশকিল। তবে কথায় আর্মেনীয় টানটা একটু খেয়াল করলেই বুঝা যায়।

'মিসেস গাজেন ছুটি ও অবসর আর কিভাবে কাটাতেন আয়া?' জিজ্ঞাসা আহমেদ মুসার।

'লিখে-পড়ে তিনি সময় কাটাতেন,' বলল আয়া।

'কি লিখতেন?' জিজ্ঞাসি আহমদ মুসার।

''দৈনিক ভ্যানের নিকল'-এ নিয়মিত তিনি ছদ্মনামে কলাম লিখতেন।' আয়া বলল।

'তাঁর সে কলামের কি কোন কালেকশন আছে?' বলল আহমদ মুসা।

'আছে অবশ্যই। তার স্টাডিতে পাওয়া যেতে পারে।' আয়া বলল।

'নিচের কাজ শেষ। চলুন উপরটা দেখব।'

বলে আহমদ মুসা ইজি চেয়ার ক্রস করে সিঁড়ির দিকে যাবার সময় ইজি চেয়ারের পেছনের 'সেফারস প্লেট' তার নজরে পড়ল। প্রস্তুতকারী প্রতাষ্ঠানের নামটাই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। টার্কিস হরফে 'আডিরা ফার্নিচারস'। 'আডিরা' হিব্রু শব্দ। অর্থ- 'শক্ত', 'শক্তিশালী'। সেফারস প্লেটে একটা মনোগ্রাম। বহুকোণ বিশিষ্ট তারার মধ্যে আর্টিস্টিক কায়দায় হিব্রু অক্ষরে আডিরা লেখা।

হঠাৎ আহমেদ মুসার কি মনে পড়ল। একটু ঘুরে সামনে গিয়ে ইজি চেয়ারের একটা হাতলের উপর চোখ ফেলল। তার সন্দেহ ঠিক। এগুলোও হিব্রু অক্ষর। এগুলোও হিব্রু অক্ষর। উপর থেকে নিচে একটি করে অক্ষর বেশ স্পেস দিয়ে লেখা হয়েছে। মোট চারটি অক্ষর। চারটি অক্ষরকে একত্রিত করলে একটা শব্দ হয়ে যায়। সেটা হলো হিব্রু 'বাটিয়া' শব্দ যার অর্থ 'ঈশ্বরের কন্যা'।

এগুলো নিশ্চয় মিসেস গাজেনের হাতের লেখা, তাহলে হিব্রু তিনি জানতেন, ভাবল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।

আপনাতেই আহমদ মুসা বলল, 'একটা কিছু লেখা দেখলাম। কিন্তু বুঝলাম না।' বলেই আহমদ মুসা সিঁড়ির দিকে চলল।

উপরে উঠে এল আহমদ মুসা আয়াকে সাথে নিয়ে।

উপরে চারটি রুম। একটা ড্রইং, একটা মাস্টার বেড, একটি অতিথি কক্ষ এবং একটি স্টাডি রুম। মাস্টার বেড রুমের সাথে আরেকটা ছোট কক্ষ আছে। ওটা ড্রেসিং রুম।

মাস্টার বেডে ঢুকেই আহমেদ মুসা দেয়ালে দেখল একটা ছবি টাঙানো। নবযৌবনা এক মহিলা।

'মিসেস গাজেনের ছবি, না?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা আয়াকে।

'জি হ্যাঁ, অনেক আগের ছবি তাঁর।' বলল আয়া।

'তোমার ম্যাডাম তো খুবই সুন্দরী, বিয়ে করেননি কেন? মিসেসই বা হলেন কেমন করে?' ছবির দিকে চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকল আয়া। তারপর বলল, 'স্যার, এটা তার পার্সোনাল ব্যাপার। তিনি কোন দিন বলেননি, আমিও জিজ্ঞেস করিনি। তবে আমি শুনেছি, তিনি প্রথম যৌবনে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হন। কিন্তু এসব নিয়ে তার কোন দুঃখবোধ ছিল না। তিনি নিজেকে 'ডটার অব গড' ভাবতেন। যতদূর জানি, তাঁর মিসেস লেখার কারণ মানুষের কৌতুহল থেকে নিজেকে রক্ষা করা।'

'উনি কোন ধর্ম অনুসরণ করতেন?' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার, আমি তাঁকে কোনদিন কোন ধর্মশালায় যেতে দেখিনি। বাড়িতে কোন ধর্মগ্রন্থও আমার চোখে পড়েনি।'

আয়াকে ধন্যবাদ দিয়ে আহমদ মুসা আয়ার সহযোগিতায় শোবার ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কাগজ-পত্র, খাতা-ডাইরি এসবই তার লক্ষ্য ছিল। আলমারি, ড্রয়ার, সবই দেখা হয়ে গেল। কিছুই পাওয়া গেল না।

স্টাডি রুমটাও দেখা গেল ফাঁকা। কিছু বই কিছু ফাইল ছাড়া কিছুই নেই। বইয়ের অধিকাংশই ইতিহাস বিষয়ক। প্রত্নতত্ত্বের উপর কিছু বই আছে। চরিত্রের দিক দিয়ে বইগুলো সবই একাডেমিক ও প্রফেশনাল। ফাইলগুলো দুই ধরনের। তাঁর লেখার কালেকশান, অন্যদিকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিষয়ক অন্য লেখকদের লেখা একটি কালেকশন। মিসেস গাজেনের লেখার কিছু শিরোনাম দেখে বুঝল তার লেখার মূল বিষয় হলো, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে জাতিগত

বিভেদের বিলোপ সাধন। মনে মনে হাসল আহমদ মুসা। মিসেস গাজেনের নাম খ্রীস্টান ধর্মযাযিকার হলেও তিনি লেখেন ইহুদি স্বার্থের পক্ষে। ইহুদিদের তথাকথিত মানবতাবাদের রাজনীতিকরা চাচ্ছে, দুনিয়ার সব ধর্ম ও সব জাতির বিলয় ঘটু। শুধু টিকে থাকুক বনি ইস্রাইল জাতি ও তাদের ইহুদি ধর্ম।

অবশ্য আহমদ মুসা স্বীকার করল তুরস্কের পূর্ব আনাতোলিয়া অঞ্চলের রাজনীতিতে মিসেস গাজেনের ভূমিকা খৃস্টানদের পক্ষে গেছে। কারণ এ অঞ্চলে তুর্কি স্বতন্ত্রের বিলুপ্তির পর হবে তুর্কি শাসনের বিলুপ্তি। মাউন্ট আরারাতকেন্দ্রিক পূর্ব আনাতোলিয়া অঞ্চল নিয়ে আর্মেনিয়ার যে নীল-নকশা তার বাস্তবায়নের জন্যে এমন একটা পরিস্থিতিই দরকার।

কিছু বই, বইয়ের র‍্যাক, টেবিল, টেবিলের ড্রয়ার ও একটা কম্পিউটার ছাড়া স্টাডিতে আর কিছু নেই।

আহমদ মুসা কম্পিউটার চেক করল। কম্পিউটারে মাত্র কয়েকটি ফাইল আছে। ফাইল সবই লেখা এবং লেখা সংক্রান্ত তথ্যবিষয়ক। কোন গোপন ফাইল কম্পিউটারে নেই।

ড্রইংরুম ও গেস্টরুমও দেখা হয়ে গেছে। সেদু'টি রুম আরও ফাঁকা।

কোথাও কোন কিছু না পাওয়াই প্রমাণ করেছে, বিষয়টা অস্বাভাবিক। মিইজিয়ামে রক্তাক্ত অভিযানে জড়িতদের সাথে মিসেস গাজেনের যোগসাজশ, তার হিব্রু জানা, জিউইশ ব্যাকগ্রাউন্ডর ভ্যান-ক্রনিকল পত্রিকায় লেখা, তার নাম, তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে বড় কোন বিষয়ের সে একটা গ্রন্থি। যদি তাই হয়, তাহলে এর পরিচয় কোথাও না কোথাও সে রাখবে। সে 'কোথাও' টা কোথায়?

এ সম্পর্কে জানার হাতের কাছে একমাত্র মাধ্যম হলো আয়া মেয়েটা। এই বুদ্ধিমতি, চালাক মেয়েটা কিছুই জানে না, তা হতে পারে না।

আহমদ মুসা আয়া মেয়েটাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মিসেস গাজেনকে না জানলে, হত্যাকারীদের মোটিভ বুঝা যাবে না। হত্যার মটিভ না জানলে হত্যাকারীদের চিহ্নিত করা মুস্কিল। কিন্তু মিসেস গাজেনের পরিচয়মূলক কিছুই তো পেলাম না।'

মেয়েটার চোখে-মুখে চাঞ্চল্যের প্রকাশ ঘটল। বলল, 'স্যার একটা জায়গা অবশিষ্ট আছে, কিন্তু...।'

'কিন্তু কি?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'স্যার, বিষয়টা আমি পরিষ্কারভাবে জানি না। শোবার ঘরের আলমারির নিচ থেকে একটা কিছু বের করতে দেখেছি। এর বেশি কিছু আমার জানা নেই।'

'কি ধরনের জিনিস বের করতে দেখেছেন?' বলল আহমদ মুসা।

'ছোট আয়তাকার বাক্সের মত।' বলল আয়া মেয়েটা।

'চলুন তো দেখি।' বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

দু'জনে মাস্টার বেডে ঢুকে আলমারির গোড়ায় গিয়ে বসল।

আহমদ মুসা নিজেই একটা স্টিক দিয়ে আলমারির নিচের জায়গাটা এদিক-ওদিক দেখল। কাঠিতে কিছুই বাঁধলো না।

এবার আহমদ মুসা আলমারির নিচটা হাত দিয়ে হাতড়াল। আলমারির তলা ও মাটির মধ্যবর্তী স্থান গোটাই ফাঁকা।

আরেকটা জিনিস দেখে বিস্মিত হলো। সেটা আলমারির বটমে দু'পাশ থেকে দূরত্বের ঠিক মাঝখানে আলমারির 'মেকারস প্লেট' লাগানো। আহমদ মুসার কাছে এটা স্বাভাবিক মনে হলো না। এ প্লেট সাধারণত আলমারির মাথায় লাগানো থাকে, যাতে সহজে মানুষের চোখে পড়ে। আরেকটা জিনিসও বিদঘুটে ঠেকল। মেকারস প্লেটটা অবস্থানগত ভারসাম্যের দিক দিয়ে যেখানে লাগানো দরকার ঠিক তার দুই তিন ইঞ্চি উপরে লাগানো। অন্য একটি বিষয় হলো, আলমারির দরজার নিচের কাঠামোটা যার সাথে আলমারির খুরা রয়েছে, সেটা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি চওড়া।

এ সবের সাথে কি আলমারির নিচ থেকে আয়তাকার বাক্স বের করার কোন সম্পর্ক আছে?

মেকার্স প্লেট নেড়েচেড়ে দেখার সময় দু'আঙুল দিয়ে দুই প্রান্তে চাপ দিল। সংগে সংগে প্লেটটি খসে পড়ে গেল। প্লেটটি চুম্বকে আটকে ছিল, বুঝল আহমদ মুসা।

মেকার্স প্লেট সরে গেলে সেখানে প্লেটটির আকার থেকে কিছুটা ছোট আয়তাকার একটা উইনডো বেরিয়ে এল। সেই উইনডো পথে সবুজ রংয়ের আংটার মাথা দেখা গেল।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নিশ্চিত হলো সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

আংটা ধরে টান দিতেই ইঞ্চি খানেক বেরিয়ে এল। সংগে সংগেই কিছু একটা পড়ার শব্দ হলো আলমারির তলায়।

আহমদ মুসা আলমারির তলায় হাত দিয়ে স্টিলের আয়তাকার একটা বাক্স বের করে আনল।

আয়া মেয়েটি আনন্দে বলে উঠল, ‘স্যার, এই বাক্সই আমি ম্যাডামের হাতে দেখেছি।’

আহমদ মুসা ঢাকনা খুলে দেখর বাক্সে একটা ডাইরি রয়েছে।

আহমদ মুসা আয়াকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, ‘বাক্সে একটা ডাইরি দেখে যতটা খুশি হয়েছি, বাক্স ভর্তি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হীরা পেলেও এত খুশি হতাম না। আপনি সাহায্য করেছেন। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।’

‘ধন্যবাদ নয় স্যার, ম্যাডামের হত্যাকারীরা শাস্তি পেলেই আমি খুশি হবো।’ বলল আয়া মেয়েটা।

‘অবশ্যই ওরা শাস্তি পাবে।’ বলে উঠে দাঁড়ার আহমদ মুসা।

‘আমরা কী করব স্যার, আমাদের কী হবে?’ বলল আয়া।

‘আপনারা যেভাবে আছেন, সেভাবেই থাকবেন। আপনাদের কোন ভয় নেই। আপাতঃত পুলিশ পাহারা তো থাকছেই।’ আহমদ মুসা বলল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য হাঁটা শুরু করল আহমদ মুসা।

একটা প্রাইভেট বাড়িকে আহমদ মুসা তার অফিস বানিয়েছে। ডিজিপি মাহির হারুন ও অন্যদিকে ড. আজদা, সাবিহা সাবিত, ড. সাহাব নূরী, ড. মোহাম্মাদ বারজেনজো ছাড়া এই বাড়ির নতুন পরিচয়ের খবর আর কেউ জানে না।

ড. মোহাম্মদ বারজেনজো সেই রাতের ঘটনার পর জরুরী প্রয়োজনে ইস্তাম্বুল গিয়েছিলেন।

সেই প্রাইভেট হাউস মানে আহমদ মুসার অফিসে তার বিশ্রাম কক্ষে আহমদ মুসা সেই ডাইরী নিয়ে বসেছে।

ডাইরির পাতা উল্টাচ্ছে আহমদ মুসা। ঠিক ডাইনী নয় এটা। বিচ্ছিন্ন স্মৃতিচারণ।

স্মৃতিচারণের বিষয় দেখে দেখে পড়তে লাগল আহমদ মুসা। শুরুতেই সে লিখেছে:

'প্রথম যেদিন নিজের সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জানলাম, দেখলাম জীবনটাই কৃত্রিমতায় সাজানো। যে পিতাকে মুসলিম পিতা হিসাবে জেনেছি, জানলাম তিনি একজন ইহুদি আর্মেনীয়। আর জানতাম আমার মুসলিম পিতা বিয়ে করেছেন কনভার্টেড সুন্দরী আর্মেনীয়কে, যার হাজারো দৃষ্টান্ত আছে তুরস্কে, আর্মেনিয়ায়। পরে জানলাম মায়ের এ পরিচয় ঠিক নয়। তিনিও আর্মেনীয় ইহুদি। মুসলিম ও আর্মেনীয় শব্দ মিলিয়ে আমার নাম হলো অ্যানোশ আব্দুল্লাহ্ গাজেন। আমি মুসলিম পরিচয় নিয়ে বড় হলাম। কিন্তু আমার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হলো ইয়েরেভিনের একটি হিব্রু স্কুলে। তারপর আমরা একদিন রাতের অন্ধকারে মাইগ্রেট করে তুরস্কের পূর্ব আনাতোলিয়ার সবচেয়ে বড় শহর ভ্যানে চলে এলাম আর্মেনিয়া থেকে পালিয়ে আসা এক মুসলিম পরিবার হিসেবে। ভ্যানে আমাদের জন্যে বাড়ি, ব্যবসা, নাগরিক কাগজপত্র সবই প্রস্তুত ছিল। কিভাবে ছিল তা তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝেছি। এসবই জগতজোড়া ইহুদি আণ্ডারওয়ার্ল্ডের কাজ।'

'এ বিষয়গুলো আমি জানতে পারি, যখন আমার আঠারো বছর বয়স। তখন আমি ভ্যানের এক সুন্দরী কলেজ ছাত্রী। আমি মুষড়ে পড়ি আমার নতুন পরিচয়ে। কিন্তু আমার এই মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটে যখন আমি ভ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, যখন আমি আর্মেনীয় বংশজাত একজন ইহুদি তরুণকে ভালোবেসে ফেলেছি। অতীতকে ভুলে গিয়ে আমি আমার প্রতিভাবান প্রেমিককে ঘিরে নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠি। তখন আমার সুখস্বপ্ন ষোলকলায় পূর্ণ

হয় যখন আমি পূর্ব আনাতোলিয়ান সুন্দরী প্রতিযোগীতায় প্রথম হই এবং প্রেমিককে বিয়ে করার কথা প্রকাশ করে দিন-তারিখের জন্য পিতামাতাকে বলি।’

‘আমার স্বপ্নের ষোলকলা যখন পূর্ণ ভাবছি, তখনই আমার জীবনের অন্ধকার পথে যাত্রা শুরু। একদিন গভীর রাতে আমাদের বাড়িতে আমার পিতা-মাতার সামনে তিনজন আগন্তুক আমাদের কম্যুনিটি লিডারের পরিচয় দিয়ে বলল, আংকারা সামরিক স্কুল থেকে অলরাউন্ডার, ব্রিলিয়ান্ট রেকর্ড নিয়ে পাস করে আসা ভ্যান সামরিক গ্যারিসনে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত একজন অমিত সম্ভবনাময় সামরিক অফিসারকে ভালোবাসতে হবে। তাকে বিয়ে করতে হবে। আমি এ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি। উত্তরে সাপের মত ঠাণ্ডা গলায় ওরা জানায় যে, আমার জীবন, আমার বাপ-মায়ের জীবন, আমাদের বাড়িঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই তাদের। তাদের কথার অন্যথা করার উপায় আমাদের নেই। তাদের কথা না মানলে পরের দিনই আমার প্রেমিকের লাশ আমি দেখতে পাব। তারপর আমার পিতামাতা, তার...। আমি তাদের কথায় রাজি হয়ে যাই। আমি হয়ে যাই তাদের হাতের পুতুল। সেই সামরিক অফিসারের সাথে তারাই আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রথম দৃষ্টিতেই সে আমাকে পছন্দ করে, তারপর ভালোবাসা, তারপর...। সে পাগল হয়ে উঠে। আমি বুঝতে পারি, সে অলক্ষ্যেই আমাদের স্বার্থের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে। সে স্বার্থ কি আমি জানি না, জানে আমাদের কম্যুনিটির গুরুরা, যারা আমাদের ব্যবহার করে। সে গোপনে আমাকে বিয়ে করে। এই কথা সে প্রকাশ করতে পারেনি পারিবারিক ও আইনি কারণে। কারণ স্ত্রী আছে। আজও আমি তাঁর গোপন স্ত্রী। আজও আমার গোপন স্বামী আমাদের কম্যুনিটির স্বর্থে কাজ করছেন। সে স্বার্থটা কি আমি জানি না। জীবনটা যদি আমার এটুকুর মধ্যে শেষ হতো, তাহলেও ভালো ছিল।’

‘কিন্তু তা হয়নি। আমার সৌন্দর্য্য, আমার যৌবনকে এটুকু মূল্যে বিক্রি করে আমার কম্যুনিটি সন্তুষ্ট হতে চায়নি। তখন আমি আমার পিতা-মাতা থেকে আলাদা হয়ে এক গোপন বাড়িতে থাকি। এ গোপন বাড়িটি আমার গোপন স্বামীই ঠিক করে দিয়েছেন। আমার স্বামীর পোস্টিং তখন আংকারার হেডকোয়ার্টারের সেন্ট্রাল কমান্ডে। প্রতি উইক-এন্ডে আসেন। সেই সময় একদিন রাতে আমাদের

কম্যুনিটির দু'জন এলেন। তারা দু'জন সামরিক অফিসারের ফটো দেখিয়ে তাদের পরিচয় বললেন। একজন ভ্যান-এর ব্রিগেড কমান্ডার। এরা এখন থেকে সপ্তাহের দুইদিন ভিন্ন দিনে আসবেন সময় কাটাবার জন্যে। আমাকে তাদের সংগ দিতে হবে। তারা নাকি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে দেখেছেন এবং তারা নাকি আমার সাথে সাক্ষাতের জন্যে উদগ্রীব। উল্লেখ্য, যে ধরনের অনুষ্ঠানে তারা আমাকে দেখেছেন, সে সব অনুষ্ঠানের আয়োজক আমাদের কম্যুনিটির লোকেরা। শান্তি, সম্প্রীতির প্রসারমূলক ও বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনমূলক এসব অনুষ্ঠানে সম্ভাবনাময়, প্রতিভাবান সামরিক অফিসারদেরও ডাকা হয় গণসংযোগের কথা বলে। যথারীতি আমি এ প্রস্তাব অস্বীকার করে বলি, গোপন হলেও সে আমার স্বামী। তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা আমি করতে পারবো না। তখন আবারও আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তাদের কথার অমান্য করার সুযোগ আমার নেই। আমার জীবন তাদের, আমার নয়। এর সাথে ভয় দেখানোর পালা। তারাই জয়ী হয়। আমার জীবন আরও অন্ধকারে ডুবে যায়। এ ভাবেই চলছে আমার জীবন।'

'মিউজিয়ামে চাকুরীর ব্যবস্থাটা আমার কম্যুনিটির লোকরাই করে দিয়েছে। আমার গোপন স্বামীর অনুমতিও এতে ছিল। চাকুরীর সুবাদে নতুন ডুপ্লেক্স বাড়িটাতে আছি আমি। এটা একদিকে সামরিক গ্যারিসন, অন্যদিকে মিউজিয়াম দু'টোরই কাছে। এ ডুপ্লেক্স বাড়ির ভালো দিক হলো, উপর তলাটা নির্জন, আমার অন্ধকার জীবনের জন্যে সুবিধাজনক।'

'আমাকে ওরা সন্দেহ করছে কি? ডিজিপি মাহির হারুন সেদিন আমার সাথে যেভাবে কথা বলল, তাতে সেটাই মনে হয়। সেদিন আমার সাথে যেভাবে কথা বলল, তাতে সেটাই মনে হয়। সেদিন আমার কম্যুনিটির লোকেরা এসে আমাকে বলে গেছে, সবই ঠিক-ঠাক চলছিল, কিন্তু কি যেন আবু আহমদ নামের ঘোড়েল একজন লোক এসেছে ভ্যান-এ। আমি যেন কথা-বার্তায় সাবধান থাকি। বিশেষ করে সামরিক অফিসারদের পরিচয়ের ব্যপারটা খুবই স্পর্শকাতর। এটা কোনও ভাবেই প্রকাশ হতে দেয়া যাবে না।'

'সেদিন এক অনুষ্ঠানে দেখলাম, প্রথম যৌবনে আমি যেমন ছিলাম, সে ধরনেরই কিছু মেয়ের আনাগোনা। বুঝলাম, আমাদের কম্যুনিটির লোকেরাই

তাদের আমদানি করেছে। আমার অফিসারদের সাথেও দেখি তাদের পরিচয় করানো হচ্ছে। বুঝতে বাকি রইল না, তারা আমার মতই কোন হতভাগি। আমার মত এই হতভাগিদের জীবনের বিনিময়ে আমাদের কম্যুনিটির লোকেরা যে ব্যবসায় করছে, সে ব্যবসায়ের স্বার্থ কি, লক্ষ্য কি?'

ডাইরিটা এ পর্যন্ত পড়েই আহমদ মুসা পড়া বন্ধ করল। আগে-পিছের পাতা উল্টাতে লাগল সেই সামরিক অফিসারদের নাম কোথাও আছে কিনা, কোনওভাবে নাম কোথাও পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু না, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও নাম কোথাও পেল না। আশ্চর্য, অনাহুত বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্ল্যাকমেইলের শিকার একজন মহিলা তার কম্যুনিটির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। সব কথাই সে বলেছে, কিন্তু নামগুলো উল্লেখ করেনি। কম্যুনিটির স্বার্থ কি জানতো না, তবু কম্যুনিটির স্বার্থ সে রক্ষা করতে চেয়েছে, স্বার্থ রক্ষা করেছে তার সাথে সম্পর্কিত সামরিক উচ্চপদে আসিন। তাদের নাম-পরিচয় জানা একন এই মুহূর্তের জন্য সবচেয়ে বড় কাজ।

আহমদ মুসা টেলিফোন করল মিসেস গাজেনের আয়া সোমিকে।

ওপার থেকে সোমির কণ্ঠ পেতেই আহমদ মুসা বলল, 'আমি মিসেস গাজেনের খবর নিতে চাই। আমার কয়েকটা কথা জানার আছে।'

'ওয়েলকাম স্যার, বলুন।' বলল গাজেনের আয়া।

'মিসেস গাজেনের কি এক বা একাধিক বন্ধু ছিল যাদের সাথে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

ওপার থেকে কোন জবাব এল না। নিরব সোমি, মিসেস গাজিনের আয়া।

সোমাকে নিরব দেখে আহমদ মুসাই আবার বলল, 'দেখুন সোমি, মিসেস গাজেনের হত্যাকারীদের পাকড়াও করতে আপনার সাহায্য আমরা চাই। ওদের পাকড়াও করতে যে প্রশ্ন আমি করেছি, তার উত্তর জানা খুবই জরুরী।'

'স্যরি স্যার। ম্যাডামের পার্সোনাল বিষয় নিয়ে কথা বলতে বিব্রত লাগছে স্যার।' সোমি ওপার থেকে বলল।

'তিনি এখন নেই। এখন তাঁর পার্সোনাল বিষয় নিয়ে কথা বলতে বিব্রত লাগছে স্যার।' সোমি ওপার থেকে বলল।

‘তিনি এখন নেই। এখন তাঁর পার্সোনাল ব্যপার আর পার্সোনাল নেই। তার হত্যাকারীদের ধরার জন্যে সব কথা আমাদের জানা দরকার।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কি বলব বুঝতে পারছি না।’ প্রতি উইক এন্ডে নিয়মিত একজন আসতেন। শনিবার রাতে আসতেন। রোববার রাতে চলে যেতেন। ঘর থেকে তিনি বেরুতেন না। আমরা উপরে যেতাম না। খানা পরিবেশন ম্যাডামই করতেন। ম্যাডাম তার সম্পর্কে কিছু বলেননি। তবে আচার-ব্যবহারে তাঁকে স্বামীস্থানীয় বলেই আমাদের মনে হয়েছে। পরের উইকে মঙ্গল ও বৃহঃস্পতিবার রাতেও তিনি বা কেউ আসতেন। সব আসাটাই রাত দশটার পর। রাত দশটার পর আমরা শুয়ে পড়তাম।’ আয়া সোমি বলল।

‘আপনারা তাঁকে বা তাদেরকে দেখেছেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘মঙ্গল ও বৃহঃস্পতিবার রাতে যারা আসতেন, তাদের দেখার প্রশ্নই ওঠে না। রাতেই তারা চলে যেতেন। উইক এন্ডে যিনি আসতেন, তিনি দু’একবার পলকের জন্য আমার চোখে পড়েছেন মাত্র।’ বলল সোমি।

‘তার মুখের বা শরীরের কোন বৈশিষ্ট্য বা চিহ্ন আপনার মনে পড়ে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘কপাল চওড়া, হাসি মাখা মুখ। এটুকুই আমার নজরে পড়েছে।’ বলল সোমি।

‘ওদের কোন জিনিসপত্র, ফেলে যাওয়া কোন চিহ্ন?’ আহমদ মুসার আবার জিজ্ঞাসা।

‘স্যার, এ রকম কিছু মনে পড়ছে না।’ বলল সোমি।

‘কত দিন পর্যন্ত ওরা এসেছেন। মনে ওদের আসাটা অনাহুত ছিল কিনা, ওরা এখনও আসে কিনা?’ আহমদ মুসা বলল।

‘কোন আসাটাই এখন আগের মত নিয়মিত নয় স্যার। তবে আসা বন্ধ হয়নি।’ বলল সোমি।

‘তোমার ম্যাডামের বয়স কত ছিল?’ জিজ্ঞেস করলো আহমদ মুসা।

‘স্যার, চল্লিশ হবে। তবে স্যার, তিনি বয়সের চেয়ে ছোট ছিলেন। অদ্ভুত ছিল তার দেহগঠন। মেকআপ না করলেও তাঁকে তিরিশের বেশি মনে হতো না।’ বলল সোমি।

‘তাই হবে। ওরা কম্যুনাটির শ্রেষ্ঠ মেয়েদেরকেই বাছাই করে তাদের স্বার্থক যুপকাষ্ঠে বলি দেয়ার জন্যে।’ আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা সোমিকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, ‘দরকার হলে আপনাকে আবার বিরক্ত করব ম্যাডাম সোমি।’

কর অফ করে দিয়ে আহমদ মুসাও সোফায় গা এলিয়ে দিল।

মাথা খালি করে একটু বিশ্রাম নিতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজ্যের চিন্তা এসে ঘিরে ধরল।

ওয়েটার কফি দিয়ে সরে যেতেই সোহা’র (Son of Holy Ararat) প্রেসিডেন্ট মিহরান মুসেগ মিসিস বলল, ‘মি. জেনারেল, তাড়াতাড়ি আমাদের আসল কথাটা দরকার।’

‘বলুন।’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

জেনারেল মেডিন মেসুদ তুর্কি সেনাবাহিনীর শীর্ষ জেনারেলদের একজন। তিনি স্টাফ অফিসের প্রধান। অফিসারদের ট্রান্সফারের প্রধান ব্যক্তি সে।

মিহরান মুসেগ মাসিস তাকাল হোলি আরারাত গ্রুপের অন্যতম ভারদান বুরাগের দিকে।

ভারদান বুরাগ নড়ে-চড়ে বসে বলল, ‘দেখুন, গত কয়েকদিনে পূর্ব আনাতোলিয়ায় আমাদের আরারাত অঞ্চলে আমাদের প্রায় অর্ধশত নিরপরাধ মানুষ নিহত হয়েছে। অথচ মাদকের বিস্তারের মত সামাজিক অপরাধ দমনে আমাদের লোকরাই সেখানে সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। আমাদের লোকদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন ও হত্যার জন্যে দায়ী শুধু পুলিশ, ঐ অঞ্চলের সেনা অফিসাররাও দারুন উৎসাহী।’

বলে ভারদান বুরাগ পকেট থেকে ভ্যান, অগ্রি, ইজদির ও কারস প্রদেশের সামরিক অফিসারদের তালিকা জেনারেল মেডিন মেসুদের সামনে রেখে বলল, 'এই অফিসারদের সরিয়ে দিয়ে তাদের নামের বিপরীতে লিখা অফিসারদের এনে বসাতে হবে।'

ভারদান বুরাগের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মিরহান মুসেগ মাসিস বলল, 'এটা করতেই হবে, না করলে আমাদের ধ্বংস করে ছাড়বে।'

'কিন্তু এত স্টাফ এইভাবে বদল হয় না, করা যায় না।' ক্ষোভ ঝরে পড়ল জেনারেল মেডিন মেসুদের কণ্ঠে।

তার চোখে-মুখে বিরক্তিরও চিহ্ন।

'সবই সম্ভব। আপনারা ইচ্ছা করলে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। অনেক সাহায্য করেছেন আপনি। এ সাহায্যও করতে হবে।'

'তাহলে গোটা দেশের সেনা অফিসারকেই বদলি করুন। তাহলে অন্যকিছু ধারণা করার সুযোগ হবে না।' ভারদান বুরাগই বলল।

দুই চোখ ছানাবড়া করে তাকাল জেনারেল মেডিন মেসুদ ভারদান বুরাগদের দিকে। বলল, 'দেখুন, রসিকতা করার ব্যপার নয় এটা।'

'আমরা রসিকতা করছি না। সত্যিই বলছি, শুধু চারটি প্রদেশে সেনা অফিসারদের ট্রান্সফার নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারে কেউ। সুতরাং সারা দেশের সেনা অফিসারদের ট্রান্সফার করার কথা আমরা সিরিয়াসলি বলছি।' বলল ভারদান বুরাগ।

'এ ধরনের ঘটনা নজিরবিহীন। কোন যুক্তি নেই এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের।' জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল। বিরক্তি ও অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠল ভারদান বুরাগ ও মিহরান মুসেগের চোখে-মুখে। ভারদান বুরাগ বলল, আপনার কোন যুক্তি আমরা শুনতে চাই না। বলুন, আমরা যা বলেছি, তা করবেন কিনা। আপনি যদি অস্বীকার করেন, তাহলে কি ঘটতে পারে আপনি জানেন। আপনার মান-সম্মান শুধু নয়, চাকরিই শুধু নয়, কোর্ট মার্শাল হবে আপনার।'

মুহুর্তেই মুষড়ে পড়ল জেনারেল মেডিন মেসুদ। নিচু হয়ে গেল তার মাথা। বলল, 'আমি করব না বলছি না।'

একটু থেমেই আবার বলল, ‘এক সাথে করায় অসুবিধা আছে, আপনাদের প্রায়োরিটি বলুন।’

সংগে সংগে উত্তর না দিয়ে ভারদান বুরাগ ও মিহরাম মুসেগ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল এবং ভারদান বুরাগ বলল, ‘ঠিক আছে, আগ্রি ও ইজদির প্রদেশের সেনা অফিসারদের আগে ট্রান্সফার করুন।’

ইজদির প্রদেশেই মাউন্ট আরারাত অবস্থিত।

আর আগ্রি এই প্রদেশের পশ্চাৎভুমি। ভ্যান প্রদেশ আগ্রির পেছনে। আর কারস ইজদির প্রদেশের উত্তরে।

‘ওকে, তাই হবে। তবে এমাসে নয়, বিভিন্ন সময়ে।’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

‘ধন্যবাদ। কিন্তু বাকি দুই প্রদেশের ট্রান্সফার করতে হবে, একটু পরে হলেও।’ বলল ভারদান বুরাগ।

‘ঠিক আছে। কিন্তু এই ট্রান্সফার দিয়ে আপনারা কী করতে চান?’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

হাসল ভারদান বুরাগ। বলল, ‘অন্য কিছু নয়, লক্ষ্য আমাদের লোকদের বাঁচানো।’

‘কিন্তু শুধু সেনা অফিসারদের বদলি করলেই কি এলক্ষ্য অর্জন হবে? এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকাই তো বড়।’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

‘ওটা আগে থেকেই আমাদের বিবেচনায় আছে।’ বলল মিহরান মুসেগ মাসিস।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ, ‘ওকে, আপনারা সফল হোন। কিন্তু আপনারা আমার প্রতি অবিচার করেছেন।’

‘কিন্তু আমরা আপনার জন্যে তো কম করিনি। আপনি যত দ্রুত এতদূর এসেছেন, তার পেছনে আমাদের অবদান অনেকখানি। আপনি তুরস্কের সবচেয়ে ধনী জেনারেলদের একজন সেটাও কি আমাদের কাজ নয়? আর আমরা তো অবিচার করিনি, আমরা উপকার চাচ্ছি আপনার কাছে। এটা কি চাইতে পারি না?’

‘চাইতে পারেনা। কিন্তু চাওয়াটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সীমাছাড়া।’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

হাসল ভারদান বুরাগ। বলল, ‘কিন্তু আমাদের চাওয়াটা আমাদের কাছে এক ইঞ্চিও বেশি নয়। সুতরাং গাছাড়া চাওয়া এটা নয়।’

‘একথা ঠিক, প্রয়োজন থেকেই চাওয়ার সৃষ্টি হয়, কিন্তু সব চাওয়া পূরণ হবার মত নয়। কিন্তু আপনারা সেটাই করতে চাচ্ছেন।’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

‘কি করব, এটাই আমাদের নীতি।’

‘আমাদের চাওয়া পূরণ হতেই হবে এবং আপনাকে তা করতেই হবে।’ ভারদান বুরাগ।

‘হ্যাঁ, আমি পণবন্দী।’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল। তার মুখে অসহায় ভাব।

‘যদি এটাই ভাবেন, তাহলে...।’

বলেই উঠে দাঁড়াল ভারদান বুরাগ। বলল আবার জেনারেল মেডিনকে লক্ষ্য করে, ‘আমাদের সময় দেয়া, আমাদের সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ।’

মিহরান মুসেগ মাসিসও উঠে দাঁড়িয়েছে।

উঠে দাঁড়াল জেনারেল। হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল ভারদান বুরাগ ও মিহরান মুসেগের সাথে। অতিকষ্টে মুখে হাসি ফুটানোর চেষ্টা করেছিল জেনারেল। বেরিয়ে এল তারা রেস্টুরেন্ট থেকে।

মিহরান মুসেগ ও ভারদান বুরাগ রেস্টুরেন্টের সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। আর জেনারেল মেডিন মেসুদ ভিন্ন আর একটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

গাড়িতে উঠল মিহরান মুসেগ ও ভারদান বুরাগ। ড্রাইভিং সীটে বসল মিহরান মুসেগ। গাড়িটা তারই। তার পাশের সীটে ভারদান বুরাগ। ভারদান বুরাগের মুখে হাসি।

কিন্তু ভাবছিল মিহরান মুসেগ মাসিস। বলল সে, ‘আজ জেনারেলকে আনউইলিং হর্স মনে হলো। আমি তার পিঠে চড়ে বসে আছি সেটা পছন্দ করছেন না।’

সেটাই স্বাভাবিক। তার উপর মুসলমানের বাচ্চা। বিশ্বাসঘাতকতা করলেও ঈমান ওদের সরে যায় না। সুযোগ পেলেই মাথা তোলে। কিন্তু জেনারেল মাথা তুলে কোন ফল পাবে না। আমাদের কিছু ভিডিও অডিওর মধ্যে তার প্রাণ বাধা আছে। সুতরাং প্রাণ রক্ষা করতে চাইলে আমাদের পুতুল তাকে হতেই হবে।' বলল ভারদান বুরাগ হাসতে হাসতেই।

'তার ভাবান্তর ঘটেছে বেশ আগে থেকেই। গাজেনের গোপন স্বামী হওয়া সত্ত্বেও অনেক আগে থেকেই তিনি মিসেস গাজেনের খোঁজ খবর নেওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন।' মিহরান মুসেগ বলল।

ওটা বড় কথা নয়। কারণ তার জন্যে নতুন সারপ্রাইজ ছিল। যাদের প্রতি তার আকর্ষণ মিসেস গাজেনের চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং দেশপ্রেম তার মনে উঁকি-ঝুঁকি মরলেও সে সাধু হয়ে যায় নি। অতএব, ভয়ের কিছু নেই তার তরফ থেকে।' বলল ভারদান বুরাগ।

'কিন্তু ধরুন দু'টো প্রদেশ থেকে আমাদের বাঞ্ছিত সেনা অফিসারদের বসাল অন্যদের সরিয়ে দিয়ে, তাতেই কি আমাদের কাজ হয়ে যাবে? একাই একশ আবু আহমদ তো আছেই, কার সাথে এসে জুটেছে দেশভক্ত পুলিশ অফিসাররাও। তাদের ম্যানেজ করা না গেলে আমরা এগোবো কিভাবে?' মিহরান মুসেগ মাসিস বলল।

'ভাববেন না মি. মুসেগ। সেনাবাহিনী হাতে থাকলে খুব বেশি চিন্তা আর আমাদের থাকে না। আর আমরা তো দু'টো কাজ করব। এক, মাউন্ট আরারাতের স্বর্ণভান্ডার হস্তগত করার চেষ্টা, দ্বিতীয় হলো, আমাদের লোক দিয়ে গণবিদ্রোহ শুরুর মাধ্যমে গণহত্যা ঘটিয়ে এই অঞ্চলকে তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা। এই দুই বিষয়ে পুলিশের করণীয় কিছু নেই। মাউন্ট আরারাত পাহারা দেয় সেনাবাহিনীর লোকেরা, সুতরাং সেখানে পুলিশ থাকছে না। অন্যদিকে সরকার ও পুলিশের গণহত্যা ইস্যু করে যে বিদ্রোহ হবে সেখানে কিছু করার শক্তি পুলিশের থাকবে না। ডাকা হবে সেনাবাহিনী যারা থাকবে আমাদের অনুগত। অতএব, চিন্তার কিছু নেই মি. মিহরান মুসেগ।' বলল ভারদান বুরাগ।

‘এ দু’টো কাজই তো লং টার্মের। এখন আমরা কি করব?’ বলল মিহরান মুসেগ।

‘কি করব মানে? আমাদের মাউন্ট আরারাতের স্বর্ণভান্ডার অভিযানের গ্রাউন্ডওয়ার্ক তো চলছেই, চলবে। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে, এমন বাছাই করা লোকদের মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে জেলে পাঠানোর কাজও যেমন চলছে, তেমনি চলবে।’ ভারদান বুরাগ বলল।

‘কিন্তু এই কাজগুলো তো বন্ধ হওয়ার পথে। কমপক্ষে দশ জায়গায় আমাদের লোকেরা হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। আর প্রাণহানির ঘটনা তো এলার্মিং। আমাদের বেস্ট জনশক্তির একটা অংশ শেষ হয়ে গেছে। পুলিশ ও গোয়েন্দারা আমাদের কৌশল বুঝে ফেলেছে। এই পথে আমরা আর এগোতে পারবো বলে মনে হয় না। সব নষ্টের মূল আবু আহমদ। সেই আমাদের সব লোককে খুন করেছে। তার ব্যাপারে তো আমরা কিছুই করতে পারলাম না। তাকে এভাবে মাঠে রেখে কি আমরা এগোতে পারব? শোনা যাচ্ছে, মিউজিয়ামে হানা দেয়া ও হত্যাকান্ডের ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব সরকার নজীরবিহীনভাবে তাকেই দিয়েছে। ক্ষমতাহীনভাবে সে যতটা ভয়ংকর, ক্ষমতা পেয় সে কতটা ভয়ংকর হবে কে জানে।’ বলল মিহরান মুসেগ।

ভারদান বুরাগের চোখে মুখেও বিমর্ষতা নেমে এল। বলল, ‘আপনি ঠিকই বলেছেন, ঐ লোকটা আমাদের ব্যর্থতার জীবন্ত নজীর। কিন্তু আমরা কি করব। চেষ্টার তো আমরা ত্রুটি করিনি। লোকটা যাদু জানে, কিংবা আগের-পরের সবকিছুই সে দেখতে পায়। তাকে কোন ফাঁদেই আটকানো গেল না। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের কৌশল হলো, সামনের বাধা এড়িয়ে এগোবার নতুন পথ সৃষ্টি করা। আমরা তাই করেছি। আমাদের দু’টি লক্ষ্যই এধরনের। এখানে আবু আহমদ বাধা হয়ে দাঁড়ানোর আর কোন স্কোপ নেই। এ অর্থ তাকে আমরা রেহাই দিচ্ছি না। সামনে এগোবার বিজয় রথ থেকে ঠিক সময়েই মোক্ষম অস্ত্রটি মারা হবে।’

‘ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।’ বলে স্লো হয়ে আসা গাড়ির গতিতে ব্রেক কষল মিহরান মুসেগ। পৌঁছে গেছে তারা হোটেলে।

২

প্লেনটা আছে আংকারার খুব কাছের শহর আংগোরায়। আংগোরা তুর্কি সেনাবাহিনীর প্রশাসনিক সদর দফতর।

গন্তব্য আংগোরা হলেও আহমদ মুসাকে নামতে হবে আংকারা বিমান বন্দরে। সেখান থেকে পাহাড়ী পথে বিশ মিনিটের ড্রাইভে আংগোরা।

আংকারা বিমান বন্দরে তাকে রিসিভ করার জন্যে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে আসতে চেয়েছিল জেনারেল মোস্তফা। কিন্তু আহমদ মুসা রাজি হয়নি। বলেছিল, আমার মিশনটা গোপন। শুরুতেই ভিআইপি পরিচয় পেলে মিশনটা আর গোপন কি! জেনারেলের পরিচয় তো জানাই গেছে। উত্তরে আহমদ মুসা বলেছিল, আমরা তাকে জানাতে পেরেছি, কিন্তু সে জানতে পারুক তা আমি চাই না। তার মাধ্যমে ষড়যন্ত্র জানা যায় কিনা, সেই চেষ্টাই আমরা করব। এজন্যই তাকে গ্রেফতারের আমি বিরোধিতা করেছি।

মিসেস আব্দুল্লাহ্ গাজেনের ডিইরি থেকে যে ইংগিত পাওয়া গেছে, তার ভাত্তিতে অনুসন্ধান চালিয়েই জেনারেল মেডিন মেসুদের পরিচয় জানা গেছে। মিসেস গাজেনের ডিইরিতে জেনারেল সম্পর্কে কয়েকটা ক্লু পাওয়া গিয়েছিল। তার প্রশস্ত কপাল। সদা হস্যোজ্জ্বল মুখ। ট্রেনিং-এ ব্রিলিয়ান্ট রেকর্ডের অধিকারী। ট্রেনিং-এর পর প্রথম নিয়োগ পায় ভ্যান ইউনিটে। এনব ক্লু সামনে রেখে আহমদ মুসার অনুরোধে তুরস্কের অভ্যন্তনীণ নিরাপত্তা প্রধান জেনারেল মোস্তফা অনুসন্ধান চালিয়ে চারজন সিনিয়র জেনারেলকে চিহ্নিত করে। এই চারজন জেনারেলের ব্যক্তিগত জীবনের উপর অনুসন্ধান চালানো হয়। খোঁজ নেয়া হয় ভ্যান-এর সাথে কার যোগাযোগ বেশি, কে বেশি বেশি ভ্যান-এ যায়। এই অনুসন্ধান থেকে বেরিয়ে আসে জেনারেল মেডিন মেসুদের নাম। সে এক সময় প্রতিটি উইক এন্ডে ছুটি কাটাতে ভ্যান-এ যেত। ভ্যান-এ তার কোন নিজস্ব বাড়ি নেই। সুতরাং ভ্যান-এ

গেলে তার ওঠার কথা সেখানকার সবচেয়ে সুন্দর সেনা রেস্ট হাউজে। কিন্তু অধিকাংশ সময় সেনা রেস্ট হাউজে উঠতোই না। কোন কোন সময় যখন উঠতো, তখনও সে সেখানে থাকতো না। তার ফ্যামিলি রেকর্ড থেকে এটাও জানা যায় যে, তার দাম্পত্য জীবনে কোন সমস্যা না থাকলেও বিয়েটা তার অমতে হয়েছিল। তার সার্ভিস রেকর্ড থেকে আরেকটি বিষয়ও জানা যায়, সেটা হলো ভ্যান-এ তার প্রথম পোস্টিং হওয়ার পর সেখান থেকে তার ট্রান্সফার ঠেকানো এবং তদ্বির করে কয়েকবার ভ্যান-এ পোস্টিং নেবার তার একজন সেনা অফিসারের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে এবং বিভিন্ন সাক্ষ্য থেকে সেনা অফিসার মেডিন মেসুদ বলেই প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং মিসেস গাজেনের গোপন স্বামী হিসেবে জেনারেল মেডিন মেসুদের বিশাল সম্পত্তির সাথে তার আয়ের কোন সংগতি নেই। এটাও প্রমাণ করে তার অবৈধ আয়ের পেছনে তার কোন অবৈধ তৎপরতা বা যোগসাজশের সম্পর্ক আছে।

জেনারেল মেডিন মেসুদ চিহ্নিত হবার পর তাকে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু আহমদ মুসা এই সিদ্ধান্তে বাধা দেয়। বলে যে, তাকে গ্রেফতার করে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু কোন্ ষড়যন্ত্রে সে যুক্ত, সে ষড়যন্ত্রের প্রকৃতি ও পরিধি কি তা নাও জানা যেতে পারে। অথচ সেসব জানা, শাস্তি পাওয়ার চেয়ে অনে বেশি প্রয়োজন। আহমদ মুসার এ যুক্তিকে তুর্কি সরকার গ্রহণ করে এবং বিকল্প হিসাবে কি করা যায় সে দায়িত্ব তারা আহমদ মুসার উপরই অর্পণ করে।

সে দায়িত্ব নিয়েই আহমদ মুসা আজ যাচ্ছে আংগোরায়।

কারও 'এক্সকিউজ মি!' শব্দে আহমদ মুসার চিন্তার স্রোতটা বাধা পেয়ে থেমে গেল।

সুন্দর সুরেলা কণ্ঠ। মিষ্টি উচ্চারণ।

আহমদ মুসা মুখ তুলে চাইল। দেখল, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশ-বাইশ বছরের অসম্ভব সুন্দরী একটি মেয়ে।

দেখেই আহমদ মুসা চিনতে পারল। ইস্কান্দরুন থেকে এ মেয়েটি বিমানে উঠেছে। তার বাম পাশের প্যাসেজের ওপারে জানালার কাছের একটা সীটে বসেছিল মেয়েটি।

ভ্যান থেকে আহমদ মুসার বিমানটি উড়ে ইস্কান্দরুনে কয়েক মিনিটের একটা যাত্রা বিরতি করেছিলে। ইস্কান্দারুন তুরস্কে ভূমধ্যসাগর উপকুলের একটা গুরত্বপুর্ণ নৌবন্দর। এটা পর্যটন শহরও। সেই সাথে এটা তুরস্কের কৌশলগত নৌঘাঁটিও।

আহমদ মুসা মুখ তুলে তাকাতেই মেয়েটি বলল, 'আমি আপনার পাশের সীটে বসতে পারি? আমি স্টুয়ার্ডকে বলেছি।' মেয়েটির চোখে-মুখে বিব্রত ভাব। কণ্ঠে সংকোচ।

মেয়েটির বিব্রতভাব ও সংকোটকে মেকি বলে মনে হলো না আহমদ মুসার। তার চোখের ভাষায় কোন মতলবের চিহ্ন নেই। তার বদলে আছে অসহায়ত্বের প্রকাশ।

'আসনটা শূন্য। আমার আপত্তি নেই।'

'থ্যাংক ইউ...।' মেয়েটি কথা শেষ করল না। প্রশ্নবোধক চিহ্ন ফুটে উঠেছে তার চোখে মুখে।

'আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।' নিজের নাম বলল আহমদ মুসা।

'থ্যাংক মি. আব্দুল্লাহ।' বলে মেয়েটি আহমদ মুসার পাশের শূন্য সীটে বসে পড়ল।

'স্যরি, টু ডিস্টার্ব ইউ। আমি ওখানে কমফোর্ট ফিল করছিলাম না।' বসেই বলল মেয়েটি।

আহমদ মুসা এর আগেই লক্ষ্য করেছে মেয়েটার পাশের সীটে খুবই সুবেশধারী ক্রিমিনাল চেহারার একজান মানুষ।

আহমদ মুসা মেয়েটার কথার জবাবে বলল, 'ওয়েলকাম মিস। আপনার অবশিষ্ট ভ্রমণ সুন্দর হোক।'

আহমদ মুসার পাশের শূন্য আসনটিতে বসতে গিয়ে বলল মেয়েটি, 'আমার নাম সানেম, সালিহা সানেম।'

'ধন্যবাদ।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনি তো আংকারা যাচ্ছেন?' মেয়েটির প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, আংকারা।' আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি কি সেনাবাহিনীতে চাকুরী করেন?’ জিজ্ঞানা আবার মেয়েটির।

বিস্মিত আহমদ মুসা তাকাল মেয়েটির দিকে। বলল, ‘সেনাবাহিনীতে চাকুরীর কথা ভাবলেন কি করে?’

‘স্যরি, সেনাবাহিনীর অফিসাররা সাধারণঃত স্মার্ট হয়, চৌকশ হয় এবং শরীরাও সাধারণঃত মেদহীন হয়। আপনিও সেরকমই, তাই বলছিলাম।’ মেয়েটি বলল।

‘স্যরি, আমার ইমেজ আপনাকে বিভ্রান্ত করেছে। আমি সেনাবাহিনীতে চাকুরী করি না।’ আহমদ মুসা বলল।

ট্রলিতে নাস্তা আসছে। সালিহা সানেমের চোখ ওদিকে গেল।

আহমদ মুসা উঠে টয়লেটের দিকে চলে গেল। ফিরে এসে দেখল নাস্তা পরিবেশিত হয়েছে।

সালিহা সানেম মদ খাচ্ছে পানির মত। পুরা এক বোতল সে নিয়ে নিয়েছে।

তার নাস্তার সাথেও মদের বোতল দেখল আহমদ মুসা।

বিস্মিত আহমদ মুসা বসতেই সালিহা সানেম বলে উঠল, ‘আপনি ছিলেন না। আমি যা নিয়েছি, আপনার জন্যেও তাই নিয়েছি। ঠিক করিনি?’

‘ধন্যবাদ।’ বলল আহমদ মুসা।

নাস্তা দেয়া শেষ করে নাস্তার ট্রলি নিয়ে ফিরছিল বিমান ক্রুরা।

আহমদ মুসা মদের বোতল ওদের ফেরত দিয়ে বলল, ‘এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দিন।’

পানি দিয়ে ওরা চলে গেল।

‘আমি আমার বোতল শেষ করে ফললাম, আর আপনি ফেরত দিলেন?’

‘আমি মদ খাই না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ডাক্তারের নির্দেশ? কোন অসুখ-বিসুখ?’ বলল সালিহা সানেম।

‘কোন অসুখ-বিসুখ নয়। আমি মুসলিম।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমিও তো মুসলিম।’ বলল সলিহা সানেম।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘মুসলিম অবশ্যই, কিন্তু মুসলিমদের জন্যে মদ নিষিদ্ধ, এটা আপনি মানেন না।’

‘আমি কেন, আমার চারদিকের প্রায় সবই তো মদ খায়।’ সালিহা সানেম বলল।

‘তারাও মানেন না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বুঝলাম, আপনি ধর্ম মেনে চলেন। আমি আপনাকে আধুনিক মানুষ মনে করেছিলাম।’ সালিহা সানেম বলল।

আবার হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ধর্ম মানলে বুঝি আধুনিক মানুষ হওয়া যায় না? ধর্ম ও আধুনিকতা কি দুই ভিন্ন জিনিস?’

‘স্যরি, আমি তাই মনে করি। যারা ধর্ম মানে, তারা অতীতমুখী। অতীতমুখী হয়ে আধুনিক হওয়া যায় না।’ বলল সালিহা সানেম।

‘আচ্ছা বলুনতো, যারা ধর্ম মানে, তারা কি আধুনিক ডিজাইনের বিল্ডিং-এ বাস করে না? তারা কি আধুনিক কল-কারখানায় তৈরি আধুনিক কাপড়ের, আধুনিক ডিজাইনের পোষাক পরে না, যেমন আমি? খাবার টেবিলে কি আধুনিক বাসন-কোসন ব্যবহার করে না তারা? কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানসহ সব আধুনিক বিষয় কি তারা পড়ে না? তারা কি নানা ধরনের আধুনিক পেশায় নিয়োজিত নেই? তাদের ঘরে কি কম্পিউটার নেই? তারা কি সব ধরনের আধুনিক কম্যুনিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করে না? তারা কি আধুনিক কালের সমৃদ্ধ ভাষা চর্চ্চা করে না? আধুনিক হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাবার খায় না? পর্যটন-দেশ ভ্রমণে তারা কি নেই? তারা কি স্কলারশীপ পায় না? স্কলারশীপ নিয়ে বা নিজ খরচে তারা কি দেশ-বিদেশে পড়ছে না? ধর্ম যারা মেনে চলে তাদের মধ্যে বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, লেখক, কবি, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার কি নেই?’ আহমদ মুসা থামল।

‘আপনার সব প্রশ্নের জবাব আমার কাছে ‘হ্যাঁ’।’ বলল সালিহা সানেম। সে কিছুটা বিব্রত।

‘তাহলে ধর্ম যারা মানে তারা তো আধুনিক। অতীতমুখী হলো কেমন করে তারা?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘বিশ্বাসে তারা অতীতমুখী।’ বলল সালিহা সানেম।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সে বিশ্বাসগুলো কি? আল্লাহতে বিশ্বাস করা, সে বিশ্বাসের ভিত্তিতে আল্লাহর হুকুম অনুসারে নামায পড়া, রোযা রাখা, যাকাত দেয়া, আখেরাতে বিশ্বাস করা, ইহজগতের কৃতকর্মের জন্যে পরজগতে পুরস্কার অথবা শাস্তি পাওয়া, এসব কি?’

সালিহা সানেমের চোখে-মুখে বিব্রত অবস্থা বেড়ে গেছে। বলল, ‘হ্যাঁ, এসবই। আরও আছে যেমন বোরখা পরা, ছেলেমেয়েদের মেলা-মেশাকে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখা, ইত্যাদি।’ কণ্ঠ তার শিথিল।

‘ধন্যবাদ, কথাগুলো খোলাখুলি বলার জন্য। কিন্তু বলুন তো, আল্লাহতে বিশ্বাস করা যদি অতীতমুখিতা বা পুরাতনপন্থা হয়, তাহলে এর আধুনিক পন্থাটা কি হবে?’ খুব শান্ত ও নরম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

চোখ-মুখের সেই বিব্রত ভাব নিয়েই সে বলল, ‘না, ঠিক আল্লাহতে বিশ্বাস করা পুরাতন পন্থা বা অতীতমুখিতা নয়, এই বিশ্বাসকে উপলক্ষ্য করে যে বাড়াবাড়ি করা হয়, সেটাই অতীতমুখিতা।’

‘আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দাবী অনুসারেই তো নামায পড়া হয়, রোযা রাখা হয়, যাকাত দেয়া হয়। এসবকে আপনি কি বলবেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘নামায, রোযা, যাকাত এসব কারও অভ্যাস হিসাবে ভালো জিনিস। কিন্তু এসব নিয়ে যখন বাড়াবাড়ি করা হয়, অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, এসব না করলে কাফের বলা হয়, তখন এই প্রবণতা অন্ধ অতীতমুখী মানসিকতার পর্যায়ে পড়ে যায়।’ সালিহা সানেম বলল।

‘সমাজে কখনও কখনও কেউ কেউ এটা করেন। কিন্তু আল্লাহ এটা করতে বলেননি। নামায, রোযার মত এবাদতগুলোতে যদি আন্তরিকতা না থাকে, নিজ ইচ্ছা না থাকে, একাগ্রতা না থাকে তাহলে তা আল্লাহ গ্রহণই করবেন না। কিন্তু একটা কথা বলুন মিস সালিহা সানেম, আপনি যা বিশ্বাস করেন, আপনি যা স্বীকার করেন, তা করা আপনার উচিত কিনা?’ আহমদ মুসা বলল।

‘অবশ্যই তা করা উচিত।’ বলল সালিহা সানেম।

‘যদি তা না করেন, তাহলে মানুষ আপনাকে কি বলবে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘ওয়াদা ভংগকারী বলবে, বিশ্বাস ভংগকারী বলবে’ বলল সালিহা সানেম।

‘আল্লাহকে যদি আপনি বিশ্বাস করেন, আপনি যদি নিজেকে মুসলিম মনে করেন, তাহলে বিশ্বাসের দাবী মুসলমান হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসাবে সে কাজগুলো, যেমন নামায, রোযা, হজ্জ্ব, যাকাত, সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন, হারাম পরিহার ইত্যাদি করা দরকার, সেগুলো না করলে আপনার পরিচয় কী হবে, কী বলবে মানুষ আপনাকে?’ আহমদ মুসা বলল।

সংগে সংগে উত্তর দিল না সালিহা সানেম। তার বিস্মিত দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে মাথা নিচু করল। তারপর মুখ না তুলেই আস্তে আস্তে বলল, ‘তার মানে আপনি বলছেন, আমি বিশ্বাস ভংগকারী। আর বিশ্বাস ভংগকারী মুসলিম হওয়ার মানে অপরিহার্য শর্ত লংঘনকারী হিসাবে আমাকে কফের বলা যায়।’ বিস্মিত কণ্ঠ সালিহা সানেমের।

‘না মিস সানেম, আমি তা বলছি না। যদিও ‘কাফের’ শব্দের অর্থ বিশ্বাস অস্বীকারকারী, তবুও এ শব্দ কোন মুসলিমের উপর প্রয়োগ করা যায় না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে একজন মুসলিম নামায না পড়লেও, রোযা না করলেও, হারাম খেলেও, পবিত্র জীবন যাপন না করলেও সে তার বিশ্বাস বা ঈমান পরিত্যাগ করে না। কাজে-কর্মে ঈমানের প্রকাশ না ঘটলেও ঈমান তার মধ্যে থাকে। তাই তো দেখা যায় বেনামাযি লোক এক সময় নামায পড়ে, এক সময় রোযা না করলেও, কোন এক সময় সে একনিষ্ঠ রোযাদার হয়ে যায়। সুতরাং কোন মুসলিমকে কাফের বলা ঠিক নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ। আপনি ঠিক বলেছেন। মুসলিম হিসাবে ইসলামের কোন অনুশাসন আমি অনুসরণ করি না, এ কথা ঠিক। কিন্তু আল্লাহর প্রতি আমার বিশ্বাস নেই, রসূলকে মানি না, এমন চিন্তা আমার মনে কোন সময় আসেনি। কিন্তু দেখুন, আমার পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণ, চলা-ফেরা দেখেই আমাকে কাফেরের খাতায় নাম লিখে দিয়েছে। এটাই তো অন্ধত্ব, পশ্চাৎমুখিতা।’ বলল সালিহা সানেম।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ওদের বাড়াবাড়ি আছে ঠিকই, কিন্তু আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, চলা-ফেরায় কি বাড়াবাড়ি নেই?’

সালিহা সানেম একটু ভাবল। বলল, ‘সোসাইটিতে যা প্রচলিত আছে, তার বাইরে আমি কিছুই করতে পারি না, কিছুই করি না। এসব আমার বাড়াবাড়ি নয়।’

‘আপনি আপনার সোসাইটির একজন। আপনার মত বহুজন নিয়েই আপনার সোসাইটি। সমাজ যা প্রচলন করে, সমাজে যা প্রচলিত হয়, তাতে সোসাইটির প্রত্যেক সদস্যের অংশ আছে। কিন্তু সে দায় সম্পর্কে আমার কোন কথা নেই। আমি জানতে চাচ্ছি, আধুনিকতা হিসাবে আপনি যা পরেন, যা করেন সে ব্যাপারে আপনার মন কি বলে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘কঠিন প্রশ্ন। এসব ব্যাপারে মন আলাদা কিছু বলে কিনা বুঝিনি, ভেবেও দেখিনি কখনও। আমি যা করছি, মন তো তার সাথেই আছে।’ বলল সালিহা সানেম।

‘আচ্ছা, আপনাদের ক্লাবে আড্ডায় যখন আপনি দেখেন ছেলেরা ফুলড্রেসে, আর মেয়েরা অর্ধনগ্ন বা নামমাত্র পোষাকে, তখন কি আপনার কিছুই মনে হয় না? কেন মেয়েদের এ পোষাক? কার স্বর্থে? সে স্বার্থ কি মেয়েদের?’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার প্রশ্ন শেষ হলেও তৎক্ষণাত উত্তর এল না সালিহা সানেমের কাছ থেকে। তার মাথাটা নিচু হয়েছে। ভাবছে সে।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে সালিহা সানেম বলল, ‘আমি বুঝেছি আপনার কথা। আপনি বলতে চাচ্ছেন, নারীদের মনোরঞ্জনের উপকরণে পরিণত করা হয়েছে, ভোগের পন্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে নারীরা। আমি এভাবে কোনদিন ভাবিনি। আমি মনে করতাম এটা নারীদের অধিকার, স্বধীনতা । কিন্তু আপনি যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন, সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। তবে মেনে নেয়ার জন্যে আরও ভাবতে হবে।’

‘অবশ্যই ভাববেন মিস সালিহা সানেম। ইসলাম বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানচর্চ্চাকে স্বাগত জানায়। আল্লাহর গোটা সৃষ্টিই তো জ্ঞানময়, বিজ্ঞা...।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই সীট বেল্ট বাঁধার ঘোষণা এল, 'আংকারায় ল্যান্ড করতে যাচ্ছে বিমান।'

আহমদ মুসা থেমে গিয়েছিল। সীট-বেল্ট বাঁধায় মনোযোগ দিয়েছে সবাই। আহমদ মুসা এবং সালিহা সানেমও।

ট্যাক্সিএ সীটে গা এলিয়ে দিয়ে আহমদ মুসা তার গন্তব্য আংগোরার কথাই ভাবছে। আংগোরা একটি সামরিক নগরী। পর্বত্য শহর। এখানে বেসরকারি কিছু লোকও আছে। কিন্তু তারাও সামরিক ব্যক্তিদেরই বংশধর। এখানে কয়েকটা ভালো হোটেল আছে পর্যটকদের জন্যে। সে হোটেলগুলোরই একটিতে আহমদ মুসার জন্যে সীট বরাদ্দ হয়েছে একজন পর্যটক হিসাবে।

রাস্তার দু'পাশের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলো আহমদ মুসা। চারদিকটা সবুজ টিলা, আর সবুজ উপত্যকায় ভরা। গাড়িটা যখন চড়াইয়ে উঠেছে তখন চারদিকের সবুজ দৃশ্য এবং টিলার উপরের ছবির মত রং-বেরং এর বাড়ি চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে। রাস্তার দু'ধারটাও ছবির মত সাজানো।

ড্রাইভারের কাছ থেকে জানল প্রাইভেট বাড়ি কিছু আছে, কিন্তু রাস্তার দু'পাশের অধিকাংশ বাড়িই হোটেল-মোটেল জাতীয়। প্রচুর পর্যটক আসে। তাছাড়া প্রচুর দেশীয় লোক এখানকার নিরিবিলি পরিবেশে ছুটি কাটাতে আসে।

আহমদ মুসার গাড়ি একটা সবুজ চড়াই অতিক্রম করছিল। দেখতে পেল, দু'টি মাইক্রো ও একটা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে একটা মেয়েকে পাঁচ-ছয় জনে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে রাস্তার পাশের একটা মোটেলে ঢুকে গেল। মেয়েটা প্রাণপণে চিৎকার করছিল বাঁচাও, বাঁচাও বলে।

ড্রাইভার বলল, 'স্যার, এমনটা এই অঞ্চলে প্রায়ই ঘটে। বাড়িগুলো যেমন সুন্দর লাগছে, এখানে যারা সময় কাটাবার জন্যে আসে তারা সবাই কিন্তু এ রকম সুন্দর নয়। নানা রকম গ্যাং এখানে আছে, বাইরে থেকেও আসে। অপহরণ ও নানা অপরাধমূলক ঘটনা এখানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।'

আহমদ মুসার গাড়িটা চড়াই অতিক্রম করে একটা উপত্যকায় নামছিল। আহমদ মুসার কানে মেয়েটার বাঁচার জন্যে প্রাণপণ চিৎকার তখনও বাজছিল।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল মেয়েটার পরনে দেখা নীল প্যান্ট ও গোলাপী শার্টের কথা। মানে নীল প্যান্ট আর গোলাপী শার্টই সালিহা সানেমের পরনে ছিল। সেই সাথে আরও মনে পড়ল, সালিহা সানেম যে সীট ছেড়ে দিয়ে সরে এসেছিল সে সীটের পাশের সীটের সুবেশধারী ক্রিমিনাল চেহারার লোক ও তার লোলুপ দৃষ্টির কথা।

মনে পড়ার সংগে সংগেই আহমদ মুসা বলল, 'গাড়ি ঘুরাও ড্রাইভার। ঐ মেয়েটাকে যে বাড়িতে নিয়ে গেছে, সেখানে চল।'

ড্রাইভার বলল, 'স্যার, ওখানে যেতে হলে সাত-আট মাইল ঘুরতে হবে। সামনে আরও তিন মাইল গেলে তবেই আমরা ফিরতি পথে যাওয়ার প্যাসেজ পাব।'

'গাড়ি ঘুরিয়ে এই পথেই ব্যাক করো।' নির্দেশ দিল আহমদ মুসা।

ড্রাইভার ভীত কণ্ঠে বলল, 'স্যার, তাহলে নির্ঘাত আমাকে জেলে যেতে হবে। গাড়িটাও আটক হয়ে যাবে বহুদিনের জন্যে।'

'আমি সেটা দেখবো। গাড়ি ঘুরাও ড্রাইভার।' ধমকে উঠল আহমদ মুসার কণ্ঠ।

ড্রাইভার একবার মুখ ফিরিয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। আর মনে মনে বলল, 'আল্লাহ্! এটুকু পথ যেন আমি পুলিশের হাতে পড়া ছাড়াই অতিক্রম করতে পারি।'

নির্বিঘ্নে পথটুকু পেরিয়ে এল গাড়িটি। যে বাড়িটিতে মেয়েটিকে তারা তুলেছে তার সামনে মেইন রোডের উপর আহমদ মুসা নেমে পড়ল।

ড্রাইভারকে ধন্যবাদ দিয়ে তার হাতে একশ ডলারের একটি নোট তুলে দিয়ে বলল, 'তুমি থাকতে পারো, আবার চলেও যেতে পার।'

গাড়ির ভাড়া ঠিক হয়েছিল পঞ্চাশ ডলার। একশ ডলার হাতে পেয়ে ড্রাইভার আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল, 'স্যার, দরকার হলে সারাদিন আমি এখানে আপনার জন্যে অপেক্ষা...।'

আহমদ মুসা দৃঢ় পদক্ষেপে এগোলো বাড়িটার দিকে, যেন সেও একজন কাস্টমার ঐ মোটেলের। মোটেলের প্রধান গেটে তাকে আটকাল দু'জন নিরাপত্তা প্রহরী। বলল, 'স্যার, রুম খালি নেই। রেস্টুরেন্টও বন্ধ।'

আহমদ মুসা প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'যারা মেয়েটিকে ভেতরে নিয়ে গেছে, আমি তাদের দলের লোক। আমাকে নিয়ে চল তাদের কাছে।'

নিরাপত্তা প্রহরীদের একজন বলল, 'স্যার, আমাদের গেট ছাড়ার অনুমতি নেই। আপনি ভেতরে গিয়ে অন্যদের বলুন।'

নিরাপত্তা প্রহরীরা বিশ্বাস করেছে তার কথা। খুশি হলো আহমদ মুসা।

'বাইরে কার সাথে কথা বলছিস তোরা। কাউকে ভেতরে ঢকতে দিবি না। মোটেল বন্ধ।' বলতে বলতে বিপুল বপু একজন লোক গেটে এসে দাঁড়াল।

নিরাপত্তা প্রহরী দু'জন তাকে স্যালুট করল। একজন বলল, 'স্যার, এই লোক ওদের সাথের। যেতে চায় তাদের কাছে।'

বিপুল বপু লোকটি আহমদ মুসার দিকে তাকাল সন্দেহের দৃষ্টিতে। বলল, 'বলুন তো, তাদের সাথে যে মেয়েটি আছে, তার পোষাক কেমন?'

'নীল প্যান্ট ও গোলাপি শার্ট।' বলল আহমদ মুসা।

লোকটির দু'চোখ থেকে সন্দেহ সরে গেল।

বলল, 'আসুন ভেতরে।'

আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকল। বলল, 'ওরা কোথায়? আমাকে নিয়ে চলেন ওদের কাছে। জরুরি কথা আছে ওদের সাথে।'

'ওদের কি কথা শোনার সময় আছে? যে মাল নিয়ে এসেছে, কোটিতে একটাও সে রকম মেলে না! ওরা এখন পাগল তাকে নিয়ে।' বলল লোকটি।

'সেটা আমি জানি।'

বলে আহমদ মুসা তাকাল মোটেলের দু'তলার সিঁড়ির দিকে। সেদিকে যাবার জন্যে পা বাড়াল আহমদ মুসা।

'আহা কি করেন, ওরা তো উপরের দিকে নেই। যে চিৎকার, আর্তনাদ চলছে, তাকি উপর তলায় বলে? ওরা আছে আন্ডার গ্রাউন্ডে।'

বলে বিশাল বপু লোকটি এগোলো উপরে ওঠার সিঁড়ির পাশের একটা রুমের দিকে। রুমের দরজা বন্ধ। লোকটি চাবি দিয়ে লক খুলে ঘরে প্রবেশ করল। ঘরে বড় একটি আলমারি। লোকটি এগোলো আলমারির দরজার দিকে। আলমারির দরজা বন্ধ। হাতল ঘুরিয়ে সে আলমারির দরজা খুলে ফেলল। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'যান, ভেতরে বেজমেন্ট ফ্লোরে তাদের সবাইকে পাবেন।'

আলমারির দরজা আসলে একটা সিঁড়িমুখের গেট।

গেট পেরিয়ে সিঁড়ি মুখের স্ট্যান্ডিং-এ এসে দাঁড়াতেই সা নারী কণ্ঠের কান্না এবং কথা-বার্তা ও হাসির শব্দ শুনতে পেল।

পেছনে আলমারির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা শিকারী বাঘের মত নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নিচে নামতে শুরু করল। নেমে এল বেজমেন্টে। বিরাট ঘরের দু'পাশ জুড়ে 'এল্'(L) প্যাটার্নে বেশ কিছু ঘর। সবগুলো ঘরই বন্ধ।

কান্নাকাটি ও কথা-বার্তার শব্দ আসছে শেষ প্রান্তের দিক থেকে।

সারিবদ্ধ ঘরগুলোর দেয়াল ঘেঁষে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল আহমদ মুসা। তার জ্যাকেটর দুই পকেটে তার দুই হাত। দুই হাতের তর্জনী দুই রিভলভারের দুই ট্রিগারে। দুই রিভলভারের মিনি সাইলেন্সেরও অন করে নিয়েছে।

কিছুটা এগোনোর পর নিশ্চিত হলো ডান পাশের একটা ঘরের কোনার দিক থেকে কথা-বার্তা ও কান্নাকাটির শব্দ আসছে। শিকারী নেকড়ের মত নিঃশব্দে এগোচ্ছে আহমদ মুসা। আর একটা কক্ষ পার হলেই করিডোরের বাঁকে পৌঁছে যাবে। করিডোরটা ঐখনে বাঁক নিয়ে ডান দিকে এগিয়ে গেছে, যেদিক থেকে কথা ও কান্নাকাটির শব্দ আসছে, সেদিকে।

করিডোরে পৌঁছাতে আর গজ দুয়েক জায়গা বাকি। হঠাৎ খুবই অস্পষ্ট একটা শব্দে গোটা দেহে উষ্ঞ শিহরণ জাগাল।

অজান্তেই থমকে গেল সে। শব্দটা স্পষ্ট হচ্ছে তার কাছে। পদশব্দ।

এগিয়ে আসছে কেউ। তার পায়ের শব্দই বলছে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে স্টেপ নিয়ে ফেলেছে।

এই চিন্তার সাথেই পকেট থেকে রিভলভার সহ ডান হাত বের করে সোজা লম্বা বসে পড়ল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে একটা লোহার রড ঘাড়ের উপর দিয়ে মাটিতে গিয়ে আঘাত করল। সে আঘাতের একটা অংশ তার ঘাড়েও অনুভূত হলো। ঘাড়টা থেঁতলে যাওয়ার মত চিন চিন করে উঠল। অন্যদিকে লোহার রডধারী লোকটিও ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তার মাথাটা এসে পড়ল আহমদ মুসার পিঠের উপর।

আহমদ মুসা বোঁ করে ঘুরেই রিভলভার চেপে ধরল তার মাথায়। কিন্তু সে সময়েই লোকটির দুই জোড়া পায়ের আঘাত দুই হাতুড়ির মত এসে পড়ল আহমদ মুসার মাথায়। আহমদ মুসা উল্টে পড়ে গেল। কিন্তু আহমদ মুসা হাতের রিভলভার ছাড়েনি।

লোকটি দু'পা দিয়ে আঘাত করেই পা দু'টি মাটিতে ছুড়ে দিয়ে তার ওপর ভর করে দক্ষ এ্যাক্রবেটের মত উঠে দাঁড়িয়েছে। কোমর থেকে ছুরি খুলে নিয়েই লোকটি ছুঁড়ে মারল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসা গড়িয়ে একপাশে সরে গিয়ে আঘাতটা আড়াল করল।

আঘাতটা ব্যর্থ হওয়ায় লোকটি পকেট থেকে পিংপং বলের মত একটি গোলাকার বস্তু হাতে নিয়ে ছুঁড়ে মারার জন্য হাত তুলল।

আহমদ মুসা আর সময় নষ্ট করল না। তার তর্জনি চেপে বসল তার রিভলভারের ট্রিগারে।

সাইলেন্সার লাগালো রিভলভার থেকে নিঃশব্দে একটা গুলি বেরিয়ে লোকটির কপাল দিয়ে ঢুকে মাথাটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। জ্যাকেটটা ঠিক করে বিভলভারটা হাতে নিয়েই এগোলো সামনের দিকে।

ঘরটির দেয়ালের শেষ প্রান্তে গিয়ে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাওয়া করিডোরের দিকে উঁকি দিল। দেখল করিডোরে কেউ নই। করিডোরের দক্ষিণ পাশে একটা দরজা। দরজাটা আধাবন্ধ। ঐ ঘর থেকেই শব্দগুলো আসছে।

আহমদ মুসা করিডোরে নেমে গেল। নিঃশব্দ পায়ে এগোলো দরজার দিকে। দরজার পাশে দাঁড়াল আহমদ মুসা। কোন কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবে সব কথা, সবার কথা পাচ্ছে, বুঝতে পারছে সে। কিছু একটা ঘটল, মেয়েটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। কান্নারত অবস্থায় বলছে, 'আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। আমার সর্বনাশ করো না। আমি তোমাদের কী ক্ষতি করেছি? আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা।'

এখন নিঃসন্দেহ হলো যে, এটা সালিহা সানেমের গলা।

সালিহা সানেম থামতেই এজন লোক হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'অত বাহাদুরি কোথায় গেল? তুমি না জেনারেলের মেয়ে? কোথায় জেনারেল, ডাক? আমাদের চেন না। তোমার বাপের মত অনেক জেনারেল আমাদের পকেটে আছে। মন্ত্রীরাও আমাদের সালাম করে। আমাদের না হলে ওদের একদিনও চলে না। আমাদের কোন ক্ষতি করনি বলছো? নাইট ক্লাবে আমাদের সাথে নাচতে তো আপত্তি করনি। নেচে-গেয়ে তো আমাদের পাগল করেছ। যখন বললাম, এই পাগলকে শান্ত কর। তখন গালি-গালাজ শুরু করলে। অত সতী-সাধ্বী হলে নাইট ক্লাব গিয়েছ কেন? মানুষের মনে আগুন জালিয়েছ কেন? এটা ক্ষতি নয়? জামা খুলেছি। এবার শালির প্যান্ট কেটে ফেল, খুলে পড়ে যাক।'

সম্ভবতঃ ভিতরে কিছু ঘটল। সালিহা সানেম চিৎকার করে উঠল।

আহমদ মুসা ভাবল, আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

আমদ মুসা তার জ্যাকেটের পকেটে একটা রিভলভার রেখে ডান হাতে একটা রিভলভার বাগিয়ে ধরে এক লাফে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। নির্দেশ দিল সবাইকে মাথার উপর হাত তুল...

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারল না। তার বাম দিকে কিছু দূরে এ দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো একজন লোক এদিকে ঘুরেই গুলি করল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

এমন ঘটনা আহমদ মুসার জন্য অপ্রত্যাশিত ছিল না।

আহমদ মুসা নিজেকে এক পাশে সরিয়ে নিয়েই লোকটিকে গুলি করল।

লোকটি দ্বিতীয় গুলি করার আগেই বুকে গুলি খেয়ে ভূমিশয্যা নিল।

ইতিমধ্যে ঘরের অন্য পাঁচজনই রিভলভার পকেট থেকে আহমদ মুসার বাম হাত রিভলভারসহ বেরিয়ে এসেছিল। আহমদ মুসার ডান হাত গুলি করার সাথে সাথেই তার বাম হাতও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রথম গুলি করার পর ডান হাতও বাম হাতের সাথে যুক্ত হলো। পাঁচ জনের মধ্যে চারজনই গুলি খেয়ে পড়ে গেল। পঞ্চম লোকটি, মানে ক্রিমিনাল চেহারার সুবেশধারী লোকটি সালিহা সানেমের পেছনে দাঁড়িয়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল।

লোকটি তার রিভালভারের নল সালিহা সানেমের মাথায় ঠেকিয়ে দাবী করল যে, আহমদ মুসা তার হাতের রিভলভার ফেলে না দিলে সে সালিহা সানেমকে গুলি করবে। সে আহমদ মুসাকে রিভলভার ফেলে দিয়ে হাত তুলে দাঁড়াবার নির্দেশ দিল।

আহমদ মুসা রিভলভার ফেলে দিয়ে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠাল।

লোকটি সালিহা সানেমের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'তুমি যেই হও, তোমার হাতের তারিফ করি। তেমার মত এত দ্রুত রিভলভার চালানোর মত লোক জীবনে আমি দেখিনি, ওয়েস্টার্ন উপন্যাসে পড়েছিই শুধু।'

লোকটি মুহূর্তের জন্যেও সালিহা সানেমের মাথা থেকে রিভলভার সরায়নি।

সে আহমদ মুসাকে নির্দেশ দিল হাত উপরে রেখে দরজা থেকে সরে পশ্চিমের দেয়ালের দিকে চলে যেতে।

আহমদ মুসা বিনা বক্য ব্যয়ে তাই করল।

লোকটি সালিহা সানেমকে দরজার দিকে হাঁটার নির্দেশ দিল।

হাঁটতে লাগল সালিহা সানেম।

লোকটিও তার রিভলভারের নল সালিহা সানেমের মাথায় চেপে ধরে চোখ দু'টো আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ রেখে সালিহা সানেমের সাথে হাঁটা শুরু করেছে।

আহমদ মুসা বলল, 'বৃথাই চেষ্টা করছ। তোমার বাঁচার উপায় নেই। একবার দরজার দিকে তাকাও।'

লোকটি ফাঁদে পড়ে গেল। সত্যিই সে সংগে সংগে চোখ ফিরাল দরজার দিকে। এটুকু সুযোগেই আহমদ মুসা চাচ্ছিল।

লোকটি চোখ ফেরাতেই আহমদ মুসা মাথার পেছরে জ্যাকেটের গোপন এক পকেটে আটকানো রিভলভার ডান হাতে তুলে নিয়েই গুলি করল।

আহমদ মুসা গুলি করেছিল লোকটির রিভলভার ধরা হাতে।

লোকটি অসম্ভব ক্ষীপ্র। সে দরজার দিকে চোখের একটা পলক ফেলেই বুঝতে পেরেছে যে তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে।

সংগে সংগে সে তার রিভলভার ধরা হাত ও মুখ এক সাথেই আহমদ মুসার দিকে ঘুরিয়েছে। তার ফলে তার হাতটা আগের জায়গা থেকে সরে এসেছে। আর তার জায়গায় গিয়ে সেট হয়েছে তার মাথা।

হাতের বদলে মাথায় গুলি খেল লোকটা।

দেহটা তার পাক খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

মেয়েটা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে এবং ডুকরে কেঁদে উঠল।

আহমদ মুসা সালিহা সানেমের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'শান্ত হও বোন, আর ভয় নেই।'

আহমদ মুসা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গায়ের জ্যাকেটটা খুলে সালিহা সানেমের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'জ্যাকেটটা পরে নাও।'

সালিহা সানেমের বোধ এতক্ষণে যেন ফিরে এল। বিব্রতকর এক অস্বস্তিতে তার মুখ কুঁকড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে তার প্রায় নগ্ন গায়ে জ্যাকেটটা পরে নিল।

তার গায়ের গোলাপি সর্টটা টুকরো টুকরো অবস্থায় মেঝেতে পড়ে ছিল।

আহমদ মুসা বাম হাতের রিভলভারটা পকেটে পুরে ডান হাতের রিভলভার বাগিয়ে ধরে ঘর থেকে বেরুবার জন্যে পা বাড়িয়ে বলল, 'এসো সানেম।'

সালিহা সানেম আহমদ মুসার পেছনে পেছনে চলতে লাগল।

আহমদ মুসা ওপরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে উঠে এল।

রিসেপশন কাউন্টারেই পেল বিপুল বপু লোকটাকে। আহমদ মুসা এগোলো তার দিকে।

বিপুল বপু লোকটি আহমদ মুসার হাতে রিভলভার আর মেয়েটাকে বেঢপ জ্যাকেট পরা বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখে ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে উঠে দাঁড়াল।

‘আপনাদের আন্ডারগ্রাউন্ডটা ক্রিমিনালদের আড্ডাখানা, তাই না? ক্রিমিনালদের সাথে তাহলে ক্রিমিনালদের যোগ আছে? এখানকার থানার ফোন নম্বর দিন।’ ধমকের সুরে বলল আহমদ মুসা।

লোকটি পুলিশের কথা শুনে আর্তনাদ করে উঠল। বলল, ‘স্যার, বিশ্বাস করুন, আমরা প্রাণের ভয়ে ওদের কথা শুনতে বাধ্য হই। আমরা ক্রিমিনাল নই। আমরা ব্যবসায়ী।’

‘পুলিশের টেলিফোন নাম্বার দিন, তাদের কাছেই আপনার এ কথাগুলো বলবেন।’ আহমদ মুসা বলল।

বিপুল বপু লোকটি আহমদ মুসার সামনে এসে হাত জোড় করে বলল, ‘স্যার, পুলিশকে ডাকবেন না দয়া করে। আমাদের ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে।’

‘আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরে ছয়-সাতটা লাশ পড়ে আছে। পুলিশ না এলে ওগুলোর কী হবে?’

‘ছয়-সাতটা লাশ?’ উচ্চারণ করল বিপুল বপু লোকটি। তার দুই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে।

তারপর ‘ও গড!’ বলে বসে পড়ল সে।

‘পুলিশের নাম্বার দিলেন না? আমি থাকা অবস্থায় পুলিশ এলে আপনাদেরই ভালো হতো?’ বলল আহমদ মুসা।

তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়াল বিপুল বপু লোকটি। বলল, ‘স্যার, দিচ্ছি টেলিফোন।’

বলে সে ছুটল রিসেপশন টেবিলে। ইনডেক্স দেখে নাম্বার বের করে নিজেই ডায়াল করল। বলল, ‘স্যার, রিং হচ্ছে। টেলিফোন নিন আপনি।’

‘তুমিই জানাও পুলিশকে। আসতে বল পুলিশকে তাড়াতাড়ি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ স্যার। সেই ভালো। আমি বলছি পুলিশকে।’ বলল বিপুল বপু লোকটি।

সাত-আট মিনাটের মধ্যেই পুলিশ চলে এল। একজন পুলিশ অফিসার পাঁচ-ছয় জন পুলিশ নিয়ে রিসেপশন লিউঞ্জে প্রবেশ করল।

‘কি মি. নাদির। কী ঘটিয়েছেন আপনি? কোথায় খুন? কোথায় লাশ?’ লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে পুলিম অফিসারটি বিপুল বপু লোকটিকে লক্ষ্য করে বলল।

তড়িঘড়ি ছুটে এল নাদির নামের বিপুল বপু লোকটি পুলিশের কছে। বলল, ‘স্যার আমি ঘটাইনি। ওরা সাক্ষী।’ আহমদ মুসাদের দেখিয়ে বলল নাদির সামের বিপুল বপু লোকটি।

আহমদ মুসা ও সালিহা সানেম তখন বসে রিসেপশনের সামনের দু’টি সোফায়। পুলিশ অফিসার তাকাল তাদের দিকে।

‘খুনের সময় আপনারা ছিলেন?’ জিজ্ঞেস করল পুলিশ অফিসার।

‘ছিলাম শুধু তাই নয়, যাদের লাশ পড়ে আছে, তাদের আমিই খুন করেছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনি? তাহলে পালাননি কেন?’

‘পালাব কেন? লাশ আপনাদের হাতে তুলে দেবার জন্যে বসে আছি।’ আহমদ মুসা বলল।

পুলিশ অফিসার একবার দৃষ্টি তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘আপনি খুন করেছেন? কেন?’

আহমদ মুসা তাকাল বিপুল বপু মি. নাদিরের দিকে। বলল, ‘বলুন মি. নাদির, পুলিশ অফিসারকে সব খুলে বলুন।’

বিপুল বপু পুলিম অফিসারকে বলল কিভাবে সাত আটজন লোক ক্রন্দনরত সালিহা সানেমকে হোটেলে নিয়ে এল, কিভাবে অস্ত্রের মুখে তারা বাধ্য করল বেজমেন্টের রুম তাদের ছেড়ে দিতে, কিভাবে আহমদ মুসা অস্ত্রধারীদের লোক পরিচয় দিয়ে বেজমেন্টে চলে গেল। শেষে সে বলল, ‘এই মাত্র বেজমেন্ট

রুম থেকে এসে ইনি আমাকে বললেন, ঐ সাত-আটজন অস্ত্রধারী নিহত হয়েছে, পুলিশে খবর দাও। আমি পুলিশকে খবর দিয়েছি স্যার। ওদের সাত-আটজন নিহত হওয়ার কথা শুনেছি, এখনও দেখিনি। আমরা পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছি।'

পুলিশ অফিসার ঘুরল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'চলুন আমাদের সাথে। লাশগুলো আগে দেখব।'

'আমরা এখানে বসে আছি। মি. নাদিরকে নিয়ে আপনারা দেখে আসুন।' আহমদ মুসা বলল ঠান্ডা কণ্ঠে।

পুলিশ অফিসার ইতস্তত করছিল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'পালানোর ইচ্ছা থাকলে আগেই পালাতাম। এখনো পালাতে পারি। আপনারা কয়েকজন আমাদের আটকাতে পারবেন না।'

পুলিশ অফিসার মুহূর্ত কয় আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ঠিক আছে, আপনারা বসুন। আমরা আসছি। নিয়ম অনুসারে একজন পুলিশ এখানে থাকবে।'

'নিয়ম তো আপনাদের পালন করতেই হবে।' বলে হাসল আহমদ মুসা।

একজন ছাড়া পুলিশ অফিসার অন্য পুলিশ সদস্য ও মি. নাদিরকে নিয়ে বেজমেন্টে নেমে গেল। ফিরে এল মিনিট দশেক পর।

পুলিশ অফিসার এলে আহমদ মুসা বলল, 'ভিকটিম এই মেয়ের জবানবন্দী নিয়ে নিন। আমরা চলে যাবো।'

'কিন্তু আপনাদের যে থানায় যেতে হবে।' পুলিশ অফিসার বলল।

'থানায় যাবার দরকার নেই। আপনি মেয়েটার জবানবন্দী নেবেন। আপনারা মামলা দায়ের করবেন। আপনারা ডাকলে মেয়েটি সাক্ষ্য দেবার জন্যে আসতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু নিয়ম হলো...।' কথা বলতে শুরু করেছিল পুলিশ অফিসার। আহমদ মুসা পুলিশ অফিসারকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এটাও নিয়ম।'

পুলিশ অফিসারের মুখে অসন্তোষ ফুটে উঠল।

বলল, 'আমরা যে নিয়মের কথা বলব, সেটাই মানতে হবে।'

আহমদ মুসা সালিহা সানেমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার আইডি কার্ড দাও।'

সালিহা সানেম তার আইডি কার্ড বের করে আহমদ মুসার হাতে দিল।

আহমদ মুসাও নিজের আইডি কার্ড বের করে দু'টি আইডি কার্ড পুলিশ অফিসারের সামনে তুলে ধরে বলল, 'আপনি ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার লিখে নিন। দরকার হলে গিয়ে আমাদের এ্যারেস্ট করে নিয়ে আসবেন। এখন আমাদের হাতে সময় নেই; আমরা চললাম।'

পুলিশ অফিসার দু'টি আইডি কার্ডের দিকে নজর বুলিয়েই চমকে উঠল। সংগে সংগে উঠে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসাকে স্যালুট করল। বলল, 'স্যার, মাফ করুন। আপনাদের পরিচয় জানলে এসব কথা বলতাম না। স্যার, আমি ম্যাডামের জবানবন্দী লিখে নিচ্ছি, একটু সময় দিন স্যার।'

সালিহা সানেমের আইডি কার্ডে তার পরিচয় দেয়া ছিল 'আংগোরা মিলিটারি স্টাফ কলেজের ট্রেইনি, জেনারেল মেডিন মেসুদের মেয়ে।' আর আহমদ মুসার আইডি কার্ডে পরিচয় লেখা ছিল, 'ভিভিআইপি সিকিউরিটি পারসোনেল।' তার কার্ডে ইনস্ট্রাকশন ছিল, কার্ড হোল্ডার সব জায়গায় অ্যাকসেস পাবেন এবং যে সহযোগিতা তিনি চাইবেন, তা তাকে দিতে হবে।' কার্ডে তুরস্কের পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন এবং তুরস্কের অভ্যন্তরীণ সিকিউরিটি প্রধান জেনারেল মোস্তফা কামালের দস্তখত ছিল।

'ঠিক আছে, ওর জবানবন্দী লিখে নিন। আমিও আমার ছোট্ট একটা মন্তব্য লিখে দেব।' বলল আহমদ মুসা পুলিশ অফিসারের কথার জবাবে।

'ধন্যবাদ স্যার!' বলে পুলিশ অফিসার নিজেই লিখতে বসে গেল।

ড্রইং রুমের দরজা খুলে যেতেই আহমদ মুসা দেখতে পেল সালিহা সানেমকে। সালিহা সানেমই প্রথম সালাম দিল আহমদ মুসাকে।

সালামের জবাব দিয়ে আহমদ মুসা ভেতরে দিল আহমদ মুসাকে।

সালামের জবাব দিয়ে আহমদ ভেতরে প্রবেশ করল।

সালিহা সানেম সোফা দেখিয়ে বলল, ‘বসুন স্যার। আব্বা হঠাৎ টেলিফোন পেয়ে হেড কোয়ার্টারে গেছেন। এখনি এসে যাবেন। আমাকে এ্যাটেন্ড করতে বলেছেন আপনাকে।’

‘ধন্যবাদ।’ বলল আহমদ মুসা।

সালিহা সানেম আহমদ মুসার সামনে এক সোফায় বসল।

সালিহা সানেমের পোষাক দেখে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। ফুলহাতা কামিজ পরেছে। একটা ওড়না মাথার উপর দিয়ে গলা পেঁচিয়ে গায়ের উপর নেমে এসেছে। পরনে ঢিলা সালওয়ার। মুখে বাহুল্য মেকআপ নেই। যেটুকু আছে সেটা খুবই স্বাভাবিক। মুখে গাম্ভীর্য।

গতকালের চেয়ে তার আজকের এই রূপ কত ভিন্ন। গতকাল পরনে ছিল টাইট প্যান্ট। বোতাম খোলা সার্ট। চোখে-মুখে উপচে পড়া চপলতা।

বসেই সালিহা সানেম বলল, ‘স্যার, আব্বা আপনার ভক্ত হয়ে গেছেন। গতকাল থেকে কতবার যে আপনার কথা তিনি বলেছেন! যতবার বলেছেন, ততবারই আব্বার কণ্ঠকে কান্নায় ভারি দেখেছি। আব্বাকে এমন ভেঙে পড়া অবস্থায় কখনও দেখিনি। জানেন, আজ ভোরে আমি আব্বাকে কুরআন শরীফ পড়তে দেখেছি। আব্বা যে কুরআন পড়তে জানেন, সেটাই আমি জানতাম না।’

‘সালিহা সানেম, এটা আমার প্রতি ভক্তির প্রকাশ নয়। আপনার প্রতি তার সীমাহীন ভালোবাসা এটা। আপনি তার একমাত্র সন্তান। আপনার বিপদে পড়া তার সমগ্র সত্তাকেই নাড়া দিয়েছে। কুরআন যে তিনি পড়েছেন, সেটা আপনার বিপদ মুক্তির জন্যে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা থেকে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু তিনি আপনাকে এ্যাঞ্জেল, মানে আল্লাহর ফেরেশতা বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, ‘আমি সৈনিক হিসেবে ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত। কিন্তু জনাব আবু আহমদ যে পরিস্থিতিতে যে কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন এবং যে ঝুঁকি নিয়েছেন, তা আমি পারতাম না।’’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এমন তিনি বলতেই পারেন। আপনার মুক্ত হওয়া তাকে সীমাহীন আনন্দ দিয়েছে। আর বেশি আনন্দিত হলে মানুষ কথা বেশি বলেন এবং বিশেষণও বেশি ব্যবহার করেন।’

‘আপনিও বেশি বলছেন স্যার, যাতে কোন প্রশংসা আপনার উপর আরোপ না হয়।’ বলল সালিহা সানেম।

গম্ভীর হলো আহমদ মুসা। বলল, ‘প্রশংসা এভাবে অপাত্রে আরোপ করা হবে কেন? আমি যে কৌশল, বুদ্ধি, সাহস ও শক্তি দেখিয়েছি, তার কোনটা আমি সৃষ্টি করেছি বা কোনটার আমি মালিক? একটারও নয়। আমি যা পেয়েছি, তাতে আমিও বিস্মিত হয়েছি, কৃতজ্ঞ হয়েছি আল্লাহর প্রতি যে, তিনি এই শক্তি, সাহস, কৌশল আয় বুদ্ধি আমাকে দিয়েছেন।’

আহমদ মুসার কথা শেষ হলেও সালিহা সানেম কিছু বলল না। গাম্ভীর্যের একটা ছাপ নামল সালিহা সানেমের চোখে-মুখে। সেই সাথে মাথাটা তার নিচু হলো।

মুহূর্ত কয় পর সে মাথা তুললো। বলল আস্তে আস্তে, ‘স্যার, গতকাল প্লেনে আমি বলেছিলাম, আমি আপনার কথা বুঝলাম তবে মানতে পারলাম না। মেনে নেয়ার জন্যে আমাকে আরও ভাবতে হবে। গতকাল ঐ ঘটনার সময় আমার মনে সেই ভাবনা এসেছিল। আমি গতকাল সারারাত এ নিয়ে ভেবেছি স্যার, ওরা আমার উপর যে আক্রমণ করেছিল, তাতে ওরা দোষী। কিন্তু ওদের চেয়ে আমি বেশি অপরাধী। আমি গত কয়েকদিন এস্কান্দারুন সী বিচে এবং এস্কান্দারুনের নাইট ক্লাবে যে পোষাক পরে যেভাবে ওদের সাথে মানে সবার সাথে নেচেছি, সেটা তাদেরকে আমার প্রতি প্রলুব্ধ করা ও আমন্ত্রণ জানানোর মতোই। তারা যখন প্রলুব্ধ হয়ে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছে নগ্ন দাবী নিয়ে তখন তাদেরকে আমি অপমান করেছি। সে অপমানের শোধ তাদের নেবারই কথা। তার চেয়ে বেশি কিছু তো করেনি। আমার অপরাধই তাদের অপরাধী বানিয়েছে। আমি...’

কথা শেষ করতে পারলো না সালিহা সানেম। কান্নায় আটকে গেলে তার কথা। দু’হাতে মুখ ঢাকল সে।

‘ধন্যবাদ সালিহা সানেম, তোমার উপলব্ধির জন্যে।’ আহমদ মুসা বলল।

'উপলব্ধি এল অনেক দেরিতে। অনেক পাপ করেছি আমি। আল্লাহর কাছে তো আমি দাঁড়াতে পারবো না। কী বলব আল্লাহকে আমি! আজ ফজরে আমি চেষ্টা করেও নামাযে দাঁড়াতে পারিনি।' বলল আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সালিহা সানেম।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তুমি কুরআন শরীফ পড়া জান না?'

'না, জানি না স্যার। ছোট বেলায় দাদার কাছে কিছু সূরা ও দোয়া শিখেছিলাম। তিনি নামাযও শিখিয়েছিলেন। এটুকুই আমার সম্বল।'

'কুরআন পড়নি সে জন্যেই হতাশ হচ্ছ এবং আল্লাহর কাছে দাঁড়াবে কিভাবে সেটা ভাবছ। ভাবনার কিছু নেই সানেম। আল্লাহ রহমান, রহীম। তিনি গফুর। তিনি তাঁর বান্দাহদের মাফ করার জন্যে সর্বক্ষণ তৈরি আছেন। যতই গুনাহ নিয়ে বান্দার তাঁর ক্ষমার জন্যে প্রার্থনা করুক, তিনি মাফ করেন। কুরআন শরীফে তিনি বলেছেন, 'বল (হে রসূল), হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ (অন্যায়, অবিচার, অনাচার, গুনাহের মাধ্যমে), আল্লাহর ক্ষমা সম্পর্কে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সব অপরাধ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে এস এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর সেই শাস্তি আসার আগে যখন তিনি আর ক্ষমা করবেন না।' বলল আহমদ মুসা।

একটু নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সালিহা সানেম আহমদ মুসার দিকে। তার দু'চোখ অশ্রুসিক্ত, কিন্তু তাতে আশার ঔজ্জ্বল্য। বলল, 'আমার জন্যে তো সেই শাস্তির সময় আসেনি, যখন আর তিনি ক্ষমা করবেন না?'

'অবশ্যই না। গতকাল তো তিনি তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এটা তো তোমার প্রতি আল্লাহর দয়া ও করুণা।' আহমদ মুসা বলল।

সালিহা সানেমের চোখ দু'টি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আল্লাহর হাজার শুকরিয়া...'

কথা শেষ করতে পারল না সালিহা সানেম। আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। অশ্রুসিক্ত চোখ তার অশ্রুতে আবার ভরে গেল।

ড্রইংরুমে প্রবেশ করল এক পরিচারিকা। বলল সালিহা সানেমকে, 'ছোট ম্যাডাম, সাহেব এসেছেন। আসছেন তিনি।'

চলে গেল পরিচারিকা। সালিহা সানেম তাড়াতাড়ি চোখ মুছল।

ঘরে ঢুকল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

জেনারেলের পোষাক তার পরনে। আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল তার সাথে হ্যান্ডশেক করার জন্যে। কিন্তু জেনারেল মেডিন মেসুদ হ্যান্ডশেক নয়, জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'আপনি আত্মীয়ের চেয়ে বড় আত্মীয় আমার। আপনাকে স্বাগত।'

সোফায় বসতে বসতে জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল, 'দুঃখিত আমি, মি. আবু আহমদ। আমি সময় দিয়েও থাকতে পারিনি। অফিসে জরুরি কাজ পড়েছিল।'

বলেই তাকাল মেয়ে সালিহা সানেমের দিকে। বলল, 'ধন্যবাদ মা, তুমি মেহমানকে এ্যাটেন্ড করেছ। চা-টা দিয়েছ মেহমানকে?'

'জ্বী, আমি নিষেধ করেছি। আমি আপনার অপেক্ষা করছি।' আহমদ মুসা বলল।

উঠে দাঁড়াল সালিহা সানেম। বলল, 'বাবা তোমরা কথা বল। আমি ওদিকে দেখছি।' ড্রইং থেকে বেরিয়ে গেল সালিহা সানেম।

'ধন্যবাদ স্যার। আমাকে সময় দেবার জন্যে।' বলল আহমদ মুসা।

'মি. আবু আহমদ এই সৌজন্যের দরকার নেই। বলেছি, আপনি আমার আত্মীয় হয়ে গেছেন। আপনি আমার পরিবারের একজন।' জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

'ধন্যবাদ আপনার এই শুভেচ্ছার জন্যে।' বলল আহমদ মুসা।

'নিশ্চয় আপনার কিছু কথা আছে। বলুন মি. আবু আহমদ।' জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা কিছু বলল না। ভাবল, সরাসরি কথাটা পাড়বে, না কৌশলের আশ্রয় নিয়ে সবকিছু জানার চেষ্টা করবে। আহমদ মুসার মন বলল, জেনারেলের মন যে অবস্থায় আছে, তাতে সরাসরি কথায় আসা যায়। সত্যের একটা শক্তি আছে।

এসব ভেবে আহমদ মুসা বলল, 'স্যার, কিছু জানার আগে আমার সম্পর্কে বলতে চাই। আমি পুলিশের লোক নই, আমি সেনাবাহিনীর লোক নই, কোন গোয়েন্দা বিভাগের লোকও নই। আমি শখের গোয়েন্দাও নই। আমি একজন স্বাধীন মানুষ। তবে নিজ ইচ্ছায় অথবা কোন আহবানে সাড়া দিয়ে কাউকে বা কোন দেশকে সাহায্য করতে আমি ভালোবাসি। এ রকম একটা কাজ নিয়ে আমার এখানে আসা।'

'সত্য ও সুন্দর পরিচয়ের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। বলুন কী কাজে এসেছেন? আমি কী সাহায্য করতে পারি?' বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

'আপনার সম্পর্কে কিছু কথা জানতে চাই।' বলল আহমদ মুসা।

'বলুন কী কথা?' জিজ্ঞাসা জেনারেল মেডিন মেসুদের।

'এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে তুরস্কের শত্রু একটা সন্ত্রাসী সংগঠনের ট্র্যাপে পড়েছেন আপনি।' ধীর, শান্ত, শক্ত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

কথাটা শুনে চমকে উঠল না জেনারেল মেডিন মেসুদ। ধীরে ধীরে চোখ তুলে একবার তাকাল আহমদ মুসার দিকে। দেখল তার মুখভাবে তেমন কোন পরিবর্তন নেই। আবার মুখ নিচু করল মেডিন মেসুদ।

বেশ সময় নিল সে কথা বলতে। একসময় মুখ তুলে সে বলল, 'আমার উত্তর 'না' হলে আপনার কাজ কি হবে, আর 'হ্যাঁ' হলে আপনি কী করবেন?'

'উত্তর 'না' হলে আমাকে আরও অনুসন্ধান করতে হবে। আর 'হ্যাঁ' হলে আমি পরবর্তী কাজে হাত দেবার চেষ্টা করবো।' আহমদ মুসা বলল।

'আমার কথা জানার আগে আপনি কি বলবেন, আপনি কতটা জানতে পেরেছেন?' জিজ্ঞাসা জেনারেল মেডিন মেসুদের।

'মি. জেনারেল স্যার, মিসেস অ্যানোস আব্দুল্লাহ গাজেনের ডায়েরি থেকে আমি সবকিছুই জানতে পেরেছি। ডায়েরিতে আপনার নাম ছিল না। সে নামও যোগাড় হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে তো আপনার সবকিছুই জানা হয়ে গেছে। আর কী জানতে চান?' বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

‘স্যার, দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে আপনার সাহায্য চাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সেটা কী?’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

‘উল্কি চিহ্নধারী, যারা মিসেস অ্যানোস আব্দুল্লাহ গাজেনকে তাদের পক্ষে কাজ করতে বাধ্য করেছিল, যারা আপনাকে ট্র্যাপে ফেলেছিল, যারা এখন মাউন্ট আরারাত অঞ্চলে, বলতে গেলে গোটা পূর্ব আনাতোলিয়া জুড়ে এক শ্রেণীর লোককে উচ্ছেদ করে, অস্থানীয় এক শ্রেণীর লোককে বসাচ্ছে, তারা কারা? এটাই আমার প্রথম জানার বিষয়।’ আহমদ মুসা বলল।

ভাবছিল জেনারেল মেডিন মেসুদ। তার কপালে কয়েকটা ভাঁজের সৃষ্টি হয়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। বলল, ‘মানবিক দুর্বলতার কারণেই আমি ওদের ট্র্যাপে পড়ি। আমি মিসেস অ্যানোস আব্দুল্লাহর অসহায়ত্ব দেখে সব বুঝেছিলাম। আমি তাকেও বাঁচাতে পারিনি, আমিও বাঁচতে পারিনি। চাকুরীকে আমি ভয় করি না, শাস্তিকেও নয়। কিন্তু ভয় করেছি আমার পরিবারের বিপর্যয়কে। আমি ওদের বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশনে যেতে পারিনি এ কারণেই। ওরা আমাকে ওদের সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রেখেছে। আমার অফিসে, আমার চার পাশেও অনেক দালাল সৃষ্টি করেছে। আমি ভয় করছি, আপনি এখানে এসেছেন, এটাও ওদের নজরে পড়বে।’ থামল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

ভ্রু কুচকে গেল আহমদ মুসার। বলল, ‘আমি এখানে এটাও কি ওদের নজরদারিতে পড়বে? এতটাই ক্লোজভাবে ওরা ওয়াচ করছে আপনাকে?’

‘শুধু আমাকে নয়, যাদেরকে ওরা ব্যবহার করে প্রত্যেককেই ওয়াচে রাখে। অতি সম্প্রতি আমার প্রতি ওয়াচ তাদের বেড়েছে। আমি তাদের অনেক কিছু জানি বলেই হয়তো অথবা ওরা বড় কিছু করতে যাচ্ছে। সে কারণেই তাদের এই বাড়তি সতর্কতা।’

একটু থামল জেনারেল মেডিন মেসুদ। টিপয়ে রাখা গ্লাসের পানি থেকে এক ঢোক পানি গিলে বলল, ‘আপনাকে কি ওরা চেনে?’

‘চেনাই স্বাভাবিক। অনেক কয়টা এনকাউন্টার ওদের সাথে আমার হয়েছে। তবে কতটুকু জানে, সবাই চেনে কিনা, তা আমি জানি না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে আপনার পরিচয় ওদের সবার কাছে আছে অবশ্যই। এটাই ওদের নিয়ম।’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

‘তাহলে আমি এখানে এসেছি তা ওদের নজরে পড়েছে বলছেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আমার তাই মনে হয়।’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

‘ঠিক আছে। এতোটা আমি ভাবিনি। সাবধান হতে হবে। এবার প্লিজ বলুন আমি যা জানতে চেয়েছি।’ বলল আহমদ মুসা।

মুহূর্তের জন্য চোখ বুজল জেনারেল মেসুদ।

তারপর সোজা হয়ে সোফায় বসল। বলল, ‘ওরা ওদের পরিচয় সম্পর্কে কোন সময়ই কিছু বলেনি। তবে আব্দুল্লাহ গাজেনের কাছ থেকে আমি জেনেছি, এখন ওরা দুই সংগঠন এক সাথে কাজ করছে। একটা হলো ‘সোহা’, মানে Son of Holy Ararat (SOHA), আর একটা ‘Lover of Holy Ararat’, সংক্ষেপে, ‘হোলি আর্ক গ্রুপ’ বলে এরা নিজেদের পরিচয় দেয়। এদের মধ্যে ‘সোহা’ সংগঠনটি কোন একটা রাজনৈতিক লক্ষ্যে কাজ করছে। আর ‘হোলি আরারাত’ বা ‘আর্ক’ গ্রুপটা ক্রিমিনাল সংগঠন। শুনেছি নুহ (আঃ)- এর নৌকার গুপ্তধন উদ্ধারের জন্যে এরা কাজ করছে। এই দুই সংগঠন কেন একত্রিত হলো, এটা অজানা রহস্য। ‘সোহা’ কী রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কাজ করছে, এটাও আমার কাছে স্পষ্ট নয়।’

‘পূর্ব আনাতোলিয়ার কয়েকটি প্রদেশে বিশেষ করে মাউন্ট আরারাত অঞ্চলে মাদক ব্যবসার ফাঁদ পেতে ওরা শত-শত সৎ ও দেশপ্রেমিক মানুষকে জেলে পুরেছে, বহু পরিবারকে তারা বিরান করেছে এবং নতুন বসতি নিয়ে আসছে তারা এই অঞ্চলে। এ সম্পর্কে, এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনি কী জানেন?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। ভ্যান অঞ্চলে আমি বেশ কিছু দিন যাই নি।’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

‘ওদের সাথে সর্বশেষ যোগাযোগ আপনার কবে হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে জবাব দিল না জেনারেল মেডিন মেসুদ। নতুন একটা ভাবনার রেখা তার চোখে-মুখে। বলল একটু সময় নিয়ে, ‘সাত দিন আগে ওরা এসেছিল।’

‘কোথায় এসেছিল? বাসায় না অফিসে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওরা অফিসে যায় না। বাসায় এসেছিল।’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

‘এই সময় তো ওদের ক্রাইসিস ঐ অঞ্চলে। সে সব কোন বিষয় নিয়ে কি তারা এসেছিল?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘ওরা এসেছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ দাবী নিয়ে।’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

‘কী সেটা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘তারা ইজদির, আগ্রি, ভ্যান, কারস প্রভৃতি প্রদেশে মোতায়েন করা সেনা অফিসারদের একটা তালিকা নিয়ে এসেছিল। এই মুহূর্তে ওদের ট্রন্সফার চেয়েছিল এই প্রদেশগুলোএ বাইরে কোথাও। সেই সাথে তারা এসেছিল সেনা অফিসারদের আরেকটি তালিকা। তাদের দাবী ছিল ওদের ট্রান্সফার করার পর ঐ শূন্য স্থানগুলো তাদের মনোনীত সেনা অফিসারদের দ্বারা পূরণ করতে।’ ভ্রূ কুচকে গেল আহমদ মুসার।

‘কেন তারা চেয়েছে এটা? কিছু বলেছে তারা?’

‘না বলেনি।’ জবাব জেনারেল মেডিন মেসুদের।

‘বদলি এবং নতুন নিয়োগগুলো কি হয়ে গেছে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘না, আমি সব ট্রান্সফারে রাজী হইনি। তাদের প্রচন্ড চাপ ও ভয় দেখানো সত্বেও আমি ইজদির প্রদেশ সব এবং আগ্রি ও কারস প্রদেশের দু’একটা ট্রান্সফারে রাজী হয়েছি।’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

‘তাহলে ওদের দেয়া তালিকা অনুসারে ইজদির প্রদেশের সব ট্রান্সফার হয়ে গেছে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘না, তারা কোন টাইম লিমিট দেয়নি। কিন্তু ‘অবিলম্বে’ করতে হবে এই দাবী ছিল।’

আহমদ মুসার কপালের ভাঁজ আরও গভীর হলো। ভাবছিল আহমদ মুসা। তাদের এই ট্রান্সফার চাওয়া এবং তাদের পছন্দমত লোক বসানোর অর্থ হলো সেনা বিরোধিতা পরিহার করা অথবা সেনা সহায়তা লাভ করা। কিন্তু কেন? তারা পুলিশের ক্ষেত্রে এমন ধরনের কিছু করেনি তা নিশ্চিত। কিন্তু কেন করেনি? হঠাৎ আহমদ মুসার অবচেতন মনের কোন অতল থেকে একটা প্রবল জিজ্ঞাসা ভেনে এলো। তাহলে কি বড় ধরনের এমন কিছু করতে চাচ্ছে যাতে সেনা সহযোগিতা অপরিহার্য? সেটা বিদ্রোহ ধরনের কোন কিছু যেখানে পুলিশের তেমন কিছু ভূমিকা পালনের নেই? চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল আহমদ মুসা।

জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল, ‘কী ভাবছেন মি. আবু আহমদ?’

‘ভাবছি, ওরা অপছন্দের সেনা অফিসারদের ট্রান্সফার ও পছন্দের সেনা অফিসারদের সেখানে এনে কী করতে চায়, কী তাদের টার্গেট, এটাই ভাবছিলাম।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এলাকায় কিছু কাজ তারা বাগিয়ে নিতে চায়, এটাই আমি মনে করেছিলাম।’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

‘সেটাই ভাবা যেত যদি ট্রান্সফার ও রিপ্লেসমেন্টের ঘটনা এক, দুই বা কিছু জায়গায় হতো বিচ্ছিন্নভাবে। কিন্তু তা হয়নি। তারা দেশের একটা অঞ্চলের চার-পাঁচটি প্রদেশ থেকে সরিয়ে দেশপ্রমিক সেনা অফিসারদের একখানে আনতে চায়, তাদের আজ্ঞাবহদের এলাকায়। এ ধরনের আয়োজন কিছু কাজ বাগিয়ে নেয়ার জন্যে হতে পারে না। আমার ধারণা, এর সাথে রাজনৈতিক বা ভূখন্ডগত স্বার্থ জড়িত থাকতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

চমকে উঠল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

তার চোখের দৃষ্টিও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বলল, ‘মি. আবু আহমদ, আপনি সাংঘাতিক বিষয়ের দিকে ইংগিত করেছেন। তারা যে দাবী করেছে, একটা প্রদেশে

তারা সে দাবী আদায় করে নিয়েছে। তার লক্ষ্য যে, আপনি যা বলেছেন, ঐ ধরনের কিছু হতে পারে তা আমি ভাবতেও পারিনি। আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু সেটা কী? তারা তো কোন রাজনৈতিক দল নয়। কোন রাজনৈতিক দলের সাথে তাদের সম্পর্ক আছে বলেও জানি না। আর ভূখন্ডগত লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারটাতো আরও বড়।' জেনারেল মেডিন মেসুদের কণ্ঠে চিন্তার সুর। মুখে তার উদ্বেগের চিহ্ন।

'কিন্তু এমন হতে পারে আমরা হয়তো যা চিন্তা করতে পারছি না, এমন কিছু তো থাকতে পরে, ঘটতেও পারে। মাদক ব্যবসায়ের ফাঁদে ফেলে যাদের জেলে পাঠানো হচ্ছে, যাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে এবং যাদের সেখানে বসানো হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তারা দুই শ্রেণীর মানুষ। 'সোহা' ও 'হোলি আর্ক গ্রুপ' সংগঠনগুলোর লোকজন এবং যাদের মাউন্ট আরারাত অঞ্চলে বসানো হচ্ছে, তারা দেখা যাচ্ছে আর্মেনীয় অরিজিন। তারপর তারা মাউন্ট আরারাতের উল্কি পরে। কিন্তু কেন? এই 'কেন'-এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের যেতে হবে সীমান্তের ওপারে আর্মেনিয়ায়। আর্মেনীয়দের ধর্মীয় জীবন শুধু মাউন্ট আরারাত কেন্দ্রিক নয়, মাউন্ট আরারাত কেন্দ্রিক তাদের একটা রাজনৈতিক দর্শনও আছে। আর্মেনীয়রা বলে প্লাবন সরে গেলে হযরত নূহ (আঃ)- এর কিস্তি যখন মাউন্ট আরাতের উপর এসে দাঁড়ালো, তখন প্লাবন থেকে জেগে ওঠা প্রথম ভূখণ্ড হিসাবে আর্মেনিয়ার রাজধানী 'ইয়েরেভেন'কে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। এই দেখতে পাওয়া থেকেই হযরত নূহ (আঃ)-এর নাম দিয়েছেন 'ইয়েরেভেন'। 'ইয়েরেভেন' অর্থ 'দেখা গেছে'। আর্মেনীয়রা মনে করে থাকে, হযরত নূহ (আঃ) নিজেই মাউন্ট আরারাত ও আর্মেনিয়াকে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ করে গেছেন। এ ছাড়া তারা বলে মাউন্ট আরারাত সন্নিহিত গোটা অঞ্চল নিয়ে ছিল আর্মেনীয়দের 'ওরারতু' সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের নাম থেকে মাউন্ট আরারাতের নামকরণ করা হয়। সুতরাং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়েই মাউন্ট আরারাত সন্নিহিত গোটা অঞ্চল আর্মেনীয়দের। তারা নিজেদের সেই 'ওরারতু' সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনে করে। কে জানে আপনার কথিত 'সোহা' ও 'হোলি আর্ক গ্রুপ' কোন লক্ষ্যে কাজ করছে। তবে আমি এটুকু জানি উল্কিওয়ালারা আর্মেনিয়ার অতিপ্রাচীন উগ্র জাতীয়তাবাদী একটা গ্রুপ। তারা গ্রেটার আর্মেনিয়ার জন্যে কাজ করে আসছিল।

আমি জানি না, 'সোহা' ও 'হোলি আর্ক গ্রুপ' এর উল্কিওয়ালারা সেই উল্কিওয়ালাদের উত্তরসূরী কিনা!' দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল আহমদ মুসা।

জেনারেল মেডিন মেসুদ স্তম্ভিত চোখে চেয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। বলল, মি. আবু আহমদ, আপনি অদ্ভুত এক ইকুয়েশন করেছেন। যা মিলে গেছে উদ্ভুত পরিস্থিতির সাথে। আমি বিস্মিত হয়েছি। আপনি তুরস্কের সাথে আর্মেনিয়ার সংঘাতের অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করেছেন। প্রফেশনাল প্রয়োজনেই সামরিক একাডেমিতে আমাকে দেশের ইতিহাস ও প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্কের ইতিহাস পড়তে হয়েছে। কিন্তু ইকুয়েশনটা এভাবে আমাদের সামনে আসেনি। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। মাউন্ট আরারাত ও আর্মেনিয়া সম্পর্কে যা বলেছেন তাতো সত্যই। ওরারতু সাম্রাজ্য সম্পর্কে যা বলেছেন তা যে সত্য তার প্রমাণ আমাদের সামনেই রয়েছে। 'হোলি আর্ক গ্রুপ'- এর তুরস্কের চীফ যিনি তার নাম 'ওরান্ত ওরারতু'। অর্থাৎ, 'ওরারতু সাম্রাজ্য তারা ফিরিয়ে আনতে চায়'- আপনার এ কথা সত্য।' বলে একটু থামল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। সে মুখে অপরাধবোধের একটা চিহ্ন। বলল ধীর কণ্ঠে, 'আমি জানি না তারা দেশের কী সর্বনাশ করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। আমি তাদের সহযোগিতা করেছি, এখনও করছি। এখন বলুন আমি কী করতে পারি?'

'জেনারেল মেডিন মেসুদ, শুধু আপনি কেন, এমন শত শত মানুষকে বিভিন্নভাবে ট্রাপে ফেলে ওরা ব্ল্যাকমেইলিং করছে। ওদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে ওদের শাস্তি দেয়ার মাধ্যমেই শুধু ওদের এই কালো থাবা থেকে দেশের মানুষকে বাঁচানো সম্ভব। আপনি সাহায্য করেছেন। ওদের পরিচয় আপনার মাধ্যমেই জানতে পারলাম। এখন ওদের কোন ঠিকানা অথবা ওদের কোন কনট্যাক্ট সূত্র আমাদের পাওয়া দরকার যাতে বড় কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই ওদের পাকড়াও করা যায়।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি ওদের কোন ঠিকানা কোন দিন পাইনি। টেলিফোন নাম্বারও না। তবে অ্যানোস আব্দুল্লাহ্ গাজেন কি এক প্রেক্ষাপটে আমাকে ওদের একটা কনট্যাক্ট পয়েন্ট দিয়েছিলেন। আমি কোন দিন সেটা খতিয়ে দেখতে চেষ্টা করিনি। সেটা হলো...।'

কথা শেষ করতে পারলো না জেনারেল মেডিন মেসুদ।

‘বাবা, তোমরা সাবধান! সাবধান! ওরা প্রহরীদের মেরে ফে...।’ চিৎকার করে কথাগুলো বলতে বলতে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল সালিহা সানেম।

কিন্তু সে কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই প্রচণ্ড শব্দে খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে ঘরে প্রবেশ করল জনা পাঁচেক লোক। ওদের হাতে উদ্যত রিভলভার।

ওদের রিভলভার তাক করেছে জেনারেল মেডিন মেসুদ ও আহমদ মুসা দু’জনকেই।

আহমদ মুসা ও জেনারেল মেডিন মেসুদ দু’জনেই উঠে দাঁড়িয়েছিল।

ঘটনাটা তাদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই আকস্মিক।

আহমদ মুসার হাত দু’টি মাথা পর্যন্ত উঠেছিল। ওরা হাত তুলতে নির্দেশ দেয়নি তখনও। মনে হবে যেন আহমদ মুসা ভয়েই আগাম হাত তুলে ফেলেছে। আসল ব্যাপার হলো, আহমদ মুসার সাথের একমাত্র রিভলভারটা রয়েছে মাথার পছনে জ্যাকেটের গোপন পকেটে আটকানো। আরও একটা রিভলভার পকেটে ছিল। সেটা সিকিউরিটির লোকজন গেটেই রেখে দিয়েছে।

ড্রইংয়ে ঢুকেই ওদের একজন চিৎকার করে জেনারেল মেডিন মেসুদকে লক্ষ্য করে বলল, ‘বিশ্বাসঘাতক, আমাদের সাথেও গাদ্দারী করলি? আমাদের শত্রু এক শয়তানকে আমাদের সব কথা বলে দিলি? এতক্ষণ তোর লাশ ফেলে দিতাম। কিন্তু সময় নিলাম এই কথা বলার জন্যে যে, তুই আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলি, কিন্তু তাতে লাভ হলো না। কারণ যে শয়তানকে সব কথা বলেছিস, তাকেও তোর সাথেই যেতে হবে পরপারে।’

বলে হো হো করে হেসে উঠল লোকটি। বলল, ‘মনে করেছিলি চারদেয়ালের ভেতর ষড়যন্ত্র করবি, কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু জানিস না তোকেও আমরা সার্বক্ষণিক পাহারায় রেখেছি। তোর বাড়ির ড্রইংরুমসহ কয়েকটি স্থানে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাসহ ট্রান্সমিটার পতা রয়েছে। তোর সব কথা সব দৃশ্যই আমাদের কাছে পৌঁছে যায়।’ একটু থামল লোকটি।

তাকাল সে ড্রইং রুমের ভেতরের দরজায় দাঁড়ানো সালিহা সানেমের দিকে। বলল, 'ভালোই হলো জেনারেল। তোর প্রাণ-ভোমরা অতিব আদরের একমাত্র সন্তানও হাজির। সেই প্রাণ-ভোমরা চোখের সামনে গুলি খেয়ে ঢলে পড়তে দেখলে তোর কেমন লাগবে?' বলেই রিভলভারের নল সে সালিহা সানেমের দিকে ঘুরিয়ে নিল।

'নিরস্ত্র একজন মহিলাকে মারতে আপনাদের লজ্জা হচ্ছে না।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে শয়তান তোকে দিয়েই শুরু করি।' বলে রিভলভারের নল সে ঘুরিয়ে নিচ্ছিল।

আহমদ মুসার মাথা পর্যন্ত তোলা হাত দু'টো মাথার পেছন পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। লোকটির কথার রেশ বাতাসে মেলাবার আগেই তার ডান হাত মাথার পেছন থেকে রিভলভার টেনে নিয়েই হাতটা সামনে এনেই গুলি করল লোকটির ঠিক কপাল লক্ষ্য করে।

গুলি করেই আহমদ মুসা বাঁ দিকে মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু তার চোখ এবং রিভলভার ধরা হাতটা লক্ষ্য থেকে সরে আসেনি।

অন্য চারজন ইতিমধ্যে আহমদ মুসাকে টার্গেট করে ফেলেছিল। গুলি তারা করল। কিন্তু ততক্ষণে আহমদ মুসার দেহটা মাটিতে গিয়ে পড়েছে। চারটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পেছনের দেয়ালে গিয়ে আঘাত করল।

আহমদ মুসা মাটিতে পড়েই রিভলভারের ট্রিগার চেপে ধরেছিল। স্বয়ংক্রিয় রিভলভার থেকে একের পর এক বেরুতে লাগল গুলি। আহমদ মুসা শুধু তার রিভলভারের নলটাকে অবশিষ্ট চারজনের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল। ওদিকে ওরা চারজন প্রথম গুলি করার পর দ্বিতীয় গুলির জন্যে রিভলভারের নল ঘুরিয়ে নিচ্ছিল নতুন টার্গেটের দিকে। কিন্তু দ্বিতীয় গুলি করার পজিশনে পৌঁছার আগেই আহমদ মুসার স্বয়ংক্রিয় রিভলভারের চারটি গুলি ওদের চারজনকে শিকার করে ফেলল।

ড্রইংরুমের ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা সালিহা সানেম যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল।

আর বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল জেনারেল মেডিন মেসুদ। তার পরনে জেনারেলের ইউনিফর্ম। কিন্তু সে সশস্ত্র ছিল না। আহমদ মুসার সাথে আলোচনায় বসার আগেই রিভলভার রেখে এসেছিল।

গুলি খেয়ে শেষ চারজনকে পড়ে যেতে দেখল জেনারেল মেডিন মেসুদ। তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসাএ হাতে রিভলভার। তখনও মেঝে থেকে ওঠেনি সে।

জেনারেল মেডিন মেসুদ ছুটে গেল আহমদ মুসার কাছে। বলল, 'আমি ঠিক আছেন তো মি. আবু আহমদ?'

'আল হামদুলিল্লাহ। আমি ঠিক আছি জেনারেল।'

জেনারেল মেডিন মেসুদ জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'ধন্যবাদ আবু আহমদ। গতকাল আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছেন। আজ আবার আমাদের দুজনকেই বাঁচালেন। আল্লাহ্'র হাজার শোকর।'

জেনারেল মেডিন মেসুদ আহমদ মুসাকে টেনে এনে বসাল সোফায়।

এই সময় সিকিউরিটির লোকেরা দৌড়ে এসে ঘরে ঢকল। একজন অফিসার পাঁচটি লাশের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'স্যার, আপনারা ভলো আছেন তো? স্যার, গেটের তিন জন সিকিউরিটিকে মারতে ওরা সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার ব্যবহার করেছে। রাস্তায় গাড়িতে থাকা আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি।'

'হ্যাঁ, আমরা ভালো আছি। এই ভালো থাকার কৃতিত্ব তাঁর। মি. আবু আহমদের কাছে রিভলভার না থাকলে এবং তিনি বিস্ময়কর ধরনের ক্ষীপ্র না হলে ওদের বদলে আমাদের লাশই পড়ে থাকতো।' বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

'স্যরি, ইট ইজ এ গ্রেট ল্যাপস অন আওয়ার পার্ট, স্যার।' সেই অফিসারটি বলল।

'ল্যাপস কিছু হয়নি তোমাদের। বল, ওরা সফল হয়েছিল।' বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ। সে একটু থেমেই আবার বলল, 'লাশগুলোর ব্যবস্থা কর অফিসার।'

‘স্যার, পুলিশকে ইনফর্ম করেছি। ওরা আসছে। স্যার, আপনারা একটু ওদিকে বসুন। আমরা এদিকটা দেখছি।’ অফিসারটি বলল।

‘ওকে নিয়ে তুমি এসো বাবা ভেতরের লাউঞ্জে। আমি দেখছি ওদিকে।’ বলেই সালিহা সানেম ভেতরে ঢুকে গেল।

‘চলুন মি. আবু আহমদ। আমরা ওদিকে বসি।’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘মি. জেনারেল, ওদের বলুন ওরা লাশগুলোকে ভালোভাবে যেন সার্চ করে। ওদের পরিচয়, ঠিকানা আমাদের দরকার।’

জেনারেল তাকাল অফিসারের দিকে। অফিসার স্যালুট দিয়ে বলল, ‘আমরা সবকিছু ভালোভাবে দেখব স্যার।’

‘আচ্ছা মি. আবু আব্দুল্লাহ, আপনার কাছে তো রিভলভার থাকার কথা নয়। ওটা তো সিকিউরিটিরা গেটেই রেখে দেয়ার কথা।’ চলতে চলতে বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

‘আমার পকেটের রিভলভারটা ওদের দিয়েছিলাম। কিন্তু লুকানো দ্বিতীয় রিভলভার আমি দেইনি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘গোপন করলেন কেন? আপনি কি জানতেন এ ধরনের ঘটনা ঘটবে?’ বলল সালিহা সানেম।

‘জানার কথা অবশ্যই নয়। আমি আমার অভ্যাস বশতই আমার গোপন অস্ত্রটি আমার কাছে রেখেছিলাম।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ। মি. আবু আব্দুল্লাহ। আপনার এই অভ্যেস আজ আমাদের বাঁচিয়েছে।’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

‘আচ্ছা ধরুন স্যার, যদি আপনার কাছে রিভলভার না থাকতো, তাহলে কী করতেন আজ?’ জিজ্ঞাসা সালিহা সানেমের।

‘কী করতাম ঘটনা ঘটার পর বলা মুষ্কিল। তবে প্রথম সুযোগেই ওদের একজনের অস্ত্র দখল করার চেষ্টা করতাম। আল্লাহর সাহায্য চাইতাম...’

‘ধন্যবাদ মি. আবু আহমদ। সব বিষয়ই আল্লাহ্ আপনাকে অকৃপণ হাতে দিয়েছেন। তাঁর হাজার শোকর।’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

আহমদ মুসা কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই সালিহা সানেম বলল, ‘আমরা এসে গেছি। আসুন, বসেই আমরা কথা বলি।’

সবাই এগোলো বসার জন্যে সোফার দিকে।

৩

আংকারা এয়ারপোর্ট।

ভি.ভি.আই.পি. পার্কিং-এ গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা।

একজন সামরিক অফিসার ছুটে এসে বলল, 'স্যার আসুন।'

আহমদ মুসাকে নিয়ে অফিসারটি লিফটে প্রবেশ করল।

লিফট তাদেরকে ভি.ভি.আই.পি. লাউঞ্জে নিয়ে এল।

অফিসারটি আহমদ মুসাকে একটা সোফায় বসিয়ে তার তিন-চার গজ পেছনে গিয়ে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই জেনারেল মেডিন মেসুদ সেখানে এল। সেনা অফিসারকে যেতে বলে আহমদ মুসার কাছে এল সে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে তার সাথে হ্যান্ডশেক করল। বলল, 'সালিহা সানেম আসেনি?'

ম্লান হাসল জেনারেল মেডিন মেসুদ। বলল, 'একদম ছেলে মানুষ। জেদ ধরে বসে আছে। আমাকে বলেছে, আমি স্যারকে বিদায় দিতে পারবো না। আমি যাব না এয়ারপোর্টে। এই জেদ থেকে তাকে নড়াতে পারিনি।'

বলে জেনারেল মেডিন মেসুদ পকেট থেকে একটা ফোল্ডার বের করে আহমদ মুসার হাতে দিয়ে বলল, 'এতে আপনার টিকেট ও বোর্ডিং কার্ড রয়েছে।'

'ধন্যবাদ!' বলে ফোল্ডারটি নিয়ে আহমদ মুসা হ্যান্ড ব্যাগের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার সাথে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের বৈঠক হয়েছে। সেখানে জেনারেল মোস্তফা এবং সেনাপ্রধানও ছিলেন। আপনার বিষয়টি নিয়েও আমি আলোচনা করেছি। আপনি পদত্যাগ করতে চান, সে কথাও আমি আলোচনা করেছি। তারা পদত্যাগের সাথে একমত হননি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, তার তত্বাবধানে সেনা, পুলিশ ও বাছাইকরা কিছু গোয়েন্দা অফিসারকে নিয়ে 'অ্যান্টি টেরোরিস্ট ব্যুরো' (ATB) নামে একটা 'অপারেশন সেল' হচ্ছে, সেখানেই

আপনাকে কো-ডাইরেক্টর হিসাবে নিতে চান। আমি এটাকে খুব ভালো মনে করেছি।'

'আমি পদত্যাগ অফার করেছি আমার বিবেকের তাড়নায়। তবে আমার জন্যে তাঁরা যা ভালো মনে করছেন, আপনি যা ভালো মনে করছেন, তার মধ্যেই আমার কল্যাণ আছে বলে আমি মনে করছি।' বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

'ধন্যবাদ জেনারেল। প্রধানমন্ত্রী শিঘ্রই আপনাকে ডাকবেন।' আহমদ মুসা বলল।

জেনারেল মেডিন মেসুদ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হলো না। সালিহা সানেম গট গট করে পা ফেলে সেখানে এসে হাজির হলো। তার পরনে তুর্কি সুলতান পরিবারের ঐতিহ্যিক পোষাক। মুখের একাংশে পাতলা একটা নেকাব।

খুশি হলো আহমদ মুসা। বলল, 'ধন্যবাদ সালিহা সানেম, তুমি এসেছ সেজন্য।'

সালিহা সানেম নিজেকে সোফার উপর ছুঁড়ে দেবার মত ধপ করে বসে বলল, 'ওয়েলকাম, স্যার। আমি এসেছি, কিন্তু বিদায় দেবার জন্যে নয়। একটা কথা বলার জন্যে এসেছি।'

'কী কথা?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আপনি কবে আসবেন, এ ওয়াদা নেবার জন্যে আমি এসেছি।' বলল সালিহা সানেম।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ভ্যান অঞ্চলে যে আমি আসব কখনও ভাবিনি, গতকাল আমি আংকারার আংগোরায় এসেছি, এটাও আমার ভাবনার অতীত ছিল। এভাবেই আবার একদিন হয়তো আংকারায় এসে পড়ব। ওয়াদা আমার নিও না বোন।'

বোন সম্বোধনে কেমন যেন ছায়া নেমে এসেই যেন আবার মিলিয়ে গেল।

একটু দেরি করল উত্তর দিতে। একটু ম্লান হাসি ফুটে উঠল মিস সালিহা সানেমের মুখে। বলল সে, 'বোন বললে তো আসা মাস্ট হয়ে গেল। তাহলে তো ওয়াদা করতেই হবে।'

‘ভাইয়ের বাড়িতে যাওয়াটাও বোনের জন্যে মাস্ট। আমি তোমাকে, জেনারেল সাহেব ও ম্যাডামকে মদীনায় আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এবারই হজ্জে আসুন। অথবা ওমরার জন্যেও আসতে পারেন। আমরা খুশি হবো।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ভাইয়া ঠিক বলেছেন বাবা। আমরা যাব। তুমি প্রোগ্রাম কর।’ সালিহা সানেম বলল।

‘আলহামদুলিল্লাহ্‌। ওর আমন্ত্রণ খুবই মূল্যবান মা। খুবই আনন্দের হবে আমাদের জন্যে। হজ্জের স্বপ্ন আমাদের মনে ছিল। সে স্বপ্ন উনি বাস্তবতায় নিয়ে এলেন। আমরা শীঘ্রই পারিবারিকভাবে বসে সিদ্ধান্ত নেব।’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

‘ওয়েলকাম জেনারেল। আমরা খুবই খুশি হবো। আমাকে প্লীজ আপনি জানাবেন।’ আহমদ মুসা বলল।

একটু থেমেই আবার মুখ খুলল আহমদ মুসা। বলল, ‘একটা বিষয় আমি ভেবেছিলাম, কিন্তু বলতে ভুলে গেছি।’

‘আমি কি সানেম মাকে একটু ঘুরে আসতে বলব?’ জিজ্ঞাসা জেনারেল মেডিন মেসুদের।

‘না, ও থাকলে ক্ষতি নেই। বিষয়টা তেমন কিছু নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। শুরু করল আবার, ‘আপনি কি ভেবেছেন আপনার বৈঠকখানায় আমাদের আলোচনা ওরা সংগে সংগেই জানতে পারে, যার ফলে সংগে সংগেই ওরা আক্রমণ করে আমাদের হত্যার জন্যে। কিভাবে এটা সম্ভব হয়েছে?’

জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল, ‘বাড়ির কেউ এটা ওদের জানিয়েছে বলে সন্দেহ করেন? কিন্তু...’

জেনারেল মেডিন মেসুদের কথার মাঝখানেই বলে উঠল আহমদ মুসা, ‘কিন্তু আপনার কথা ঠিকই, বড়ির কেউ সব কথা শোনেনি। শুনলেও একই সবকিছু শোনা ও বলা সম্ভব নয়।’

‘তাহলে?’ জিজ্ঞাসা জেনারেল মেডিন মেসুদের।

‘আমি মনে করি আপনার বাসায় ওরা সিসিটিভি ক্যামেরা ও ট্রান্সমিটার বসিয়ে রেখেছে। আপনাকে সবসময় ওরা ওয়াচে রেখেছে এবং আপনার সব কথা-বার্তাও মনিটর করছে।’

মুখ মলিন হয়ে গেল জেনারেল মেডিন মেসুদের। বিস্ময়ও নামল তার চোখে-মুখে। বলল, ‘আপনি ঠিকই বলেছেন, এটাই ঘটেছে। ধন্যবাদ আপনাকে। আমি আজই এসব খুঁজে বের করব। এখনি খবর দিচ্ছি সেনাবাহিনীর আলট্রা সেন্সর টিমকে।’

‘ওরা কারা বাবা? ওরা তোমাকে অনেক কথা বলেছে।’ বলল সালিহা সনেম।

বিব্রত জেনারেল মেডিন মেসুদ কিছু বলার আগেই আহমদ মুসা বলল, ‘ওরা দেশের শত্রু বোন।’

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল, ‘আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি মি. আবু আহমদ। মাউন্ট আরারাত অঞ্চলের যে সেনা অফিসারদের ট্রান্সফার করা হয়েছিল এবং তাদের জায়গায় যাদের রিপ্লেস করা হয়েছিল, সেই ট্রান্সফার ও রিপ্লেসমেন্ট বাতিল করার অর্ডার তৈরি করেছি। কালকেই এটা কার্যকরী হবে।’

‘না মি. জেনারেল এটা করবেন না। ওদেরকে আমরা ওদের মত করে চলতে দিতে চাই। ট্রান্সফার ও রিপ্লেসমেন্ট বাতিল করলে ওরা বুঝতে পারবে যে, ওদের ষড়যন্ত্র আমরা ধরতে পেরেছি। তাদের এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে এটা ওদের আমরা জানতে দিতে চাই না। আমরা দেখতে চাই, কী ষড়যন্ত্র ওরা করেছে। প্রধানমন্ত্রী, সেনাপ্রধান জেনারেল মোস্তফা সবাই আমার সাথে একমত। এটা আমাদের জন্যে একটা সুযোগ। এই সুযোগ আপনিই সৃষ্টি করে দিয়েছেন মি. জেনারেল।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই এয়ার লাইন্সের একজন অফিসার এসে জেনারেল মেডিন মেসুদকে বলল, ‘স্যার, বোর্ডিং শেষ। স্যারকে নিতে এসেছি।’

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘চলুন অফিসার।’

হ্যান্ডশেকের জন্য আহমদ মুসা হাত বাড়িয়ে দিল জেনারেল মেডিন মেসুদের দিকে।

'সময় খুব তাড়াতাড়িই চলে গেল। আমি কৃতজ্ঞ মি. আবু আহমদ। আপনার হতে আমার নতুন জন্ম হয়েছে।' হ্যান্ডশেক করতে করতে বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

'আমি কিছুই করিনি জেনারেল। যেটা ঘটেছে, সেটা আপনার তকদির। আল্লাহ্ মানুষের জন্যে খেদমত চান। আল্লাহ্ আপনার সহায় হোন।'

বলেই আহমদ মুসা তাকাল সালিহা সানেমের দিকে। হসল। বলল, 'এবার তুমি বিদায় না জানালেও আমি বিদায় নেব।'

'আমি বিদায় জানাব না। তবে বলব আসুন।' বলল সালিহা সানেম।

'এটা বিদায় জানাবারই ভাষা।' বলল আহমদ মুসা।

হাসল সালিহা সানেম। বলল, 'আমি পরাজয় স্বীকার করলাম। জানেন তো মেয়েদের মন নরম।'

'আল্লাহ্ নরম মন পছন্দ করেন। আল্লাহ্ হাফেজ বোন।'

বলে সকলের উদ্দেশ্যে সালাম দিয়ে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসার পেছনে চলল এয়ার লাইন্সের অফিসার। আহমদ মুসা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। এরপরও সেদিকে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে সালিহা সানেম।

জেনারেল মেডিন মেসুদ ধীরে ধীরে হাত রাখল মেয়ের কাঁধে। বলল, 'চল মা।'

চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকাল সালিহা সানেম। সেই সাথে চোখের অশ্রু মোছার চেষ্টা করল। বলল, 'বাবা, ওকে না দখলে আমাদের পৃথিবী দেখা অসম্পুর্ণ থেকে যেত। পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টাতো না। অর্থ ও এনজয়মেন্টের বাইরে আজকের মানুষ কিছুই ভাবে না। আমি ওকে বিদায় জানাব কি করে, উনি যে আমাকে নতুন জীবন দিয়ে গেলেন।' আবেগে জড়িয়ে গেল

শেষের কথাগুলো সালিহা সানেমের। নতুন করে সিক্ত হলো তার চোখ দু'টি অশ্রুতে।

'মা, আমিও জীবনে প্রথম বারের মত এমন মানুষের মুখোমুখি হলাম। তুমি সব কথা জান না মা। উনি ইচ্ছে করলে আমার জীবন ধ্বংস করে দিতে পারতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি আমাকে নতুন জীবন দিয়ে গেলেন। কুরআন শরীফে পড়েছি, আল্লাহ্ বান্দার জন্যে তার দয়াকে অবশ্যকর্তব্য করে নিয়েছেন। ইনি আল্লাহর সে ইচ্ছারই একজন সাক্ষাত দূত। অপরাধীরা এদের স্পর্শেই সোনার মানুষ হয়ে যান। আল্লাহ্ ওকে দীর্ঘজীবী করুন।' বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

'ওর পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানি না। কে উনি, ওর পরিচয় কী?' জিজ্ঞাসা সালিহা সানেমের।

'আমিও জানিনা মা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্টও ওকে সমীহ করেন, শ্রদ্ধা করেন। তার যে কোন কথাই মেনে নেন। বিস্ময়কর এই মানুষ। তার পরিচয় সম্পর্কে আমিও কিছুই জানি না।' বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

'এ কারণে আরও কষ্ট লাগছে বাবা।' বলল সালিহা সানেম।

'আমাদের এই কষ্টই ওদের জীবনের সার্থকতা মা। মানুষকে এভাবে জয় করতে পারার চেয়ে বড় সার্থকতা আর নেই মা।'

কথা শেষ করেই বলল, 'চল মা।' বাবা-মেয়ে দু'জনেই হাঁটা শুরু করল। আকাশে উড়ল আহমদ মুসার প্লেন।

'বাবা, এ প্লেন কি ইস্কান্দারুন হয়ে ভ্যান যাবে?' বলল সালিহা সানেম।

'না মা, ভ্যানের জন্যে এটা বিশেষ ফ্লাইট। মি. আবু আহমদের জন্যে এই ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভ্যানকে এটা জানিয়েও দেয়া হয়েছে মি. আবু আহমদ নামে একজন বিশেষ মেহমান যাচ্ছে এই ফ্লাইটে।'

'আলহমদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তার সম্মান বাড়িয়ে দিন।' বলল সালিহা সানেম। লিফট থেকে নেমে তারা গাড়ির দিকে এগোলো।

ইজদির-ভ্যান হাইওয়ে ধরে একটা ব্রান্ড নিউ মাইক্রো ছুটে যাচ্ছে ভ্যানের দিকে।

মাইক্রোটি সেনাবাহিনীর। গাড়ির নাম্বার বলছে মাইক্রোটি ইজদির সেনা-ডিভিশনের। নাম্বার জিরো থারটিন।

মাইক্রোতে আরোহী পাঁচজন। ড্রাইভিং আসনে একজন সেনা ড্রাইভার। মাঝের সীটে দু'জন, সাধারণ পোষাক পরা লোক।

আর একদম পেছনের সীটে দু'জন সামরিক অফিসার। চলছে গাড়ি। মাঝের সীটে সাধারণ পোষাক পরা দু'জন কথা বলছিল। দু'জনের একজনের পরনে কমপ্লিট স্যুট। অন্যজন প্যান্টের সাথে জ্যাকেট পরেছে।

স্যুট পরা লোকটি পেছন দিকে সামরিক অফিসারের পোষাক পরা দু'জনকে লক্ষ্য করে বলল, 'সাইমন, সোরেন শোন, এটা চূড়ান্ত একটা মিশন। এতে ব্যর্থ হওয়া যাবে না। তোমরা তাকে মারতে না পারলে, হয় সে মারবে তোমাদের, না হয় আমরা মারব তোমাদর। তোমাদের দু'জনের কোমরের বেল্টে বোমা পাতা আছে। তার রিমোট কন্ট্রোল আছে আমাদের হাতে। তোমরা তাকে মারতে ব্যর্থ হলেই তোমাদের দেহ উড়ে যাবে। আর যদি মারতে পার, তাহলে শুধু নতুন জীবন পাবে না, পাবে অঢেল টাকা, দুইজনে পাঁচ মিলিয়ন করে দশ মিলিয়ন ডলার।'

'স্যার। আমরা মারতে যাচ্ছি, মরতে নয়। এটা নিশ্চিত হলেই হয় যে, তিনি এই ফ্লাইটে আসছেন। ভ্যান এয়ারপোর্টে নামছেন, ভিভিআইপি কার পার্কিং-এ তিনি আসছেন গাড়িতে ওঠার জন্যে। তাহলে সে নির্ঘাত আমাদের হাতে মরবে যদি ভিভিআইপি কার পার্কিং-এ ঢোকার আমরা সুযোগ পাই।' বলল সেনা অফিসারের পোষাক পরা দু'জনের একজন।

সুটধারীই আবার কথা বলল, 'যা নিশ্চিত হতে চাইছো, তা সবই নিশ্চিত। মি. আবু আহমদ এই ফ্লাইটেই আসছেন। কারণ এ বিশেষ ফ্লাইটটি আবু আহমদের জন্যেই। এয়ারপোর্টের কী পয়েন্টে বসা আমাদের লোক আজ সকালেই এই নিশ্চিত খবরটা দিয়েছে। ক'মিনিট আগেও জানিয়েছে বিশেষ প্লেনটি এখন মধ্য পথে। আর ভিভিআইপি লাউঞ্জ থেকে তারা যে এক্সিট প্ল্যান করেছে এয়ারপোর্টের

সিকিউরিটির লোকরা, সেটাও আমাদের সেই লোকই যোগাড় করে দিয়েছে। তাকে স্বাগত জানানোর জন্যে ভিভিআইপি লাউঞ্জে তার সাথে মিলিত হবেন ভ্যানের পুলিশ প্রধান মাহির হারুন, ড. আজদা, ড. সাহাব নূরী, সাবিহা সাবিত। তাকে নিয়ে নাম্বার ওয়ান ভিভিআইপি কার পার্কিং-এ আসবে। এক নাম্বার ট্রাকে প্রস্তুত আছে তার জন্য গাড়ি। লিফট থেকে তারা বের হয়ে গাড়ির দিকে এগোবে গাড়িতে ওঠার জন্যে।

এই এক্সিট প্ল্যানটা নিশ্চিত। আর তোমাদের এয়ারপোর্টে ঢুকতে কোন অসুবিধা হবে না। ইজদির পদেশের সেনা ডিভিশনের একজন জেনারেল কমান্ডিং অফিসারের চিঠি তোমাদের কাছে থাকবে। চিঠিতে লেখা আছে তিনি তার একজন আতশয়াকে রিসিভ করার জন্যে তোমাদের পাঠিয়েছেন। একজন ভিভিআইপি প্যাসেঞ্জারের নামও যোগাড় করা হয়েছে প্লেনের যাত্রী লিস্ট থেকে। ঐ যাত্রীকে যারা রিসিভ করতে যাবেন, এয়ারপোর্টে ঢোকার মুখে তাদের গাড়ি আটকাবার ভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং ভিভিআইপি কার পার্কিং-এ ঢুকতে পারার ব্যাপারটাও নিশ্চিত।'

'তাহলে স্যার, আবু আহমদের মৃত্যুর ব্যাপারটাও নিশ্চিত।' বলল পেছন থেকে সামরিক অফিসারের পোষাক পা দ্বিতীয় লোকটি।

'ধন্যবাদ, এই রকম ডিটারমিনেশনই তো চাই। তবে আবার সাবধান করে দিচ্ছি, আবু আহমদের রিভলভার অসম্ভব ক্ষীপ্র। তোমরা যদি আগে তার চোখে পড়ো, তাহলে তোমরা কিছুই করতে পারবে না তাকে।' বলল স্যুট পরা লোকটিই আবার।

'ধন্যবাদ স্যার। অবশ্যই আমরা সাবধান থাকবো। তবে জেনে রাখবেন স্যার, স্নেক গ্রুপের আমরা যারা, তাদের গুলি কখনো মিস হয় না।' সেনা অফিসারের পোষাক পরা অন্যজন বলল।

'ধন্যবাদ!' বলল মাঝের আসনের স্যুট পরা সেই লোকটি। সীটে এবার সোজা হয়ে বসল মাঝের আসনের লোকটি।

ছুটে চলেছে গাড়ি। নিরবতা কয়েক মুহূর্তের।

নিরবতা ভাঙল মাঝের আসনের লোকটি। বলল একটু ছোট স্বরে, 'আমি বুঝতে পারছি না আংকারায় আমাদের পাঁচজন লোক জেনারেল মেডিন মেসুদের বাড়িতে ঐভারে বেঘোরে মারা পড়ল কী করে? জেনারেল মেসুদ কি আমাদের হাতের বাইরে চলে গেল?'

'সর্বনাশের হোতা এখানেও সেই আবু আহমদ নামের শয়তান লোকটা। আমাদের লোক যারা জেনারেলের উপর চোখ রাখছিল, তারা গত পরশু আমাদের জানায়, আবু আহমদকে জেনারেলের মেয়ের সাথে জেনারেলের বাড়িতে ঢুকতে দেখা গেছে। আমরা তখনই বিপদের গন্ধ পাই এবং ঘটনা মনিটর করতে বলি। পরে রাতেই তারা আবার যোগাযোগ করে। তারা জানায় যে, আবু আহমদ জেনারেলের মেয়েকে গুন্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করে তাকে পৌঁছে দেবার জন্যেই জেনারেলের বাড়িতে এসেছে। জেনারেলের মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। জেনারেলের সাথে আবু আহমদের যে কথা-বর্তা হয়েছিল তার বিষয়বস্তু ছিল গুন্ডাদের হাত থেকে তার মেয়েকে উদ্ধার সম্পর্কে। এথেকে প্রাথমিক আশংকা আমাদের কেটে যায়। আরপর কি হলো আর জানা যায়নি। কিন্তু হঠাৎই গতকাল বেলা ১২ টার দিকে খবর আসে, আমাদের পাঁচজন লোক জেনারেলের বাসভবনে নিহত হয়েছে। তাঁরা জানায়, আমাদের আংগোরা ঘাঁটি প্রধানের নেতৃত্বে ঘাঁটির চারজন লোক তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে যায় সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে। তাদের নিহত হবার খবর আসে বেলা ১২ টায়। পরে রহস্য পরিষ্কার হয়ে যায়। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ও ট্রান্সমিটার মনিটর থেকে জানা গেছে সব ব্যাপার। জেনারেলের সাথে আমাদের গোপন সম্পর্কের বিষয়টি আবু আহমদ জানতে পেরেছিল আগেই। আবু আহমদের সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদে জেনারেল সব কিছু স্বীকার করে বসে। এটুকুই শুধু জানা গেছে। তবে সিসিটিভিতে দেখা গেছে, আমাদের লোকদের আবু আহমদ কিভাবে খুন করেছে। সম্ভবতঃ জেনারেল আবু আহমদের জিজ্ঞাসাবাদে সব ফাঁস করে দিলে আমাদের লোকরা জেনারেল ও আবু আহমদকে হত্যার জন্যেই ওখানে তাড়াহুড়া করে ছুটে যায়। সিসিটিভি'র রিপোর্টে দেখা গেছে, আমাদের লোকরা আবু আহমদ, জেনারেল ও ওখানে উপস্থিত সবাইকেই টার্গেট করেছিল।' দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল স্যুট পরা লোকটি।

‘তাহলে জেনারেল বিশ্বাসঘাতকতা করেছেই দেখা যাচ্ছে।’ বলল জ্যাকেট পরা লোকটি।

‘আবু আহমদের কাছে ধরা পড়ার পর সে গড় গড় করে সব বলে দিয়েছে।’ স্যুট পরা লোকটি বলল।

‘আবু আহমদকে জেনারেলের ওখানেই মারতে পারলে ভালো হতো। আমাদের লোকরা সে চেষ্টাই করেছিল। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আবু আহমদ নিশ্চয় ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছে সব কিছু এবং তা সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে। এখন তাকে মেরে সেই ফলতো আমরা পাবো না।’ বলল জ্যাকেটওয়ালা।

‘আবু আহমদ দুনিয়ায় না থাকলে সরকার সবকিছু জানলেও আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। সরকার আমাদের কিনে ফেলা ও দুর্নীতিবাজ সেনা, পুলিশ ও গোয়েন্দাদের দিয়ে আমাদের আট-ঘাট বাধা পরিকল্পনাকে বাধা দিতে পারবে না। শুধু চাই আমরা এখন আবু আহমদের মৃত্যু।’ স্যুট পরা লোকটি বলল।

এয়ারপোর্টের প্রবেশ পথে এসে পড়েছে গাড়ি।

‘গেটের বাইরে পুলিশের যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে গাড়ি দাঁড় করাও।’ নির্দেশ দিল স্যুটধারী লোকটি।

পুলিশের গাড়ির পাশে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। সেনা অফিসারের পোষাক পরা দু’জন গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। সেনা অফিসারের পোষাক পরা দু’জন পেছনের সীট থেকে মাঝের সীটে এসে বসল। স্যুট পরা লোকটি গাড়ির জানালার কাছে মুখ নিয়ে বলল, ‘তোমরা যাও। ভিভিআইপি কার পার্কিং-এ তোমারা ঢুকে যাওয়ার পর আমরা ঢুকব। ভিভিআইপি কার পার্কিং-এর সর্বশেষ প্যাসেজে দাঁড়িয়ে থাকবে এই পুলিশের গাড়ি। এই গাড়িতে আমরা থাকব। মনে থাকে যেন দু’জনে দু’টি গুলি এক সাথেই করবে। টার্গেট গুলিবিদ্ধ হয়েছে নিশ্চিত হয়ে তোমরা দ্রুত গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে আসবে। আমাদের পুলিশের গাড়ি তোমাদের ফলো করবে। তোমাদের কোন ভয় নেই। যাও তোমরা।’

গাড়িটা স্টার্ট নিয়ে চলল এয়ারপোর্টে প্রবেশের জন্যে।

স্যুট ও জ্যাকেটধারী পুলিশের গাড়ির কাছে যেতেই সামনের ও পেছনের দুই দরজা এক সাথে খুলে গেল।

গাড়িটার ড্রাইভিং সীটে ছেটে ছিল একজন পুলিশ। পেছনের সীটে ডিডিপি(ডেপুটি ডাইরেকটর অব পুলিশ) র‍্যাংকের একজন পুলিশ অফিসার। কিন্তু দু'জনের কাছেই ইজদির প্রদেশের ডিডিপি ও সাব ইন্সপেক্টর অব পুলিশের আইডি কার্ড আছে। কার্ডে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্বাক্ষর। সেই সাথে তাদের কাছে ইজদির প্রশাসন-কতৃপক্ষের চিঠি। তারা এসেছে একজন ভিভিআইপি প্যাসেঞ্জারকে রিসিভ করে ইজদির নিয়ে যাবার জন্যে।

স্যুট পরা লোকটি বসল ডিডিপি'র পাশে। আর জ্যাকেট পরা লোকটি বসল ড্রাইভিং সীটে বসা ইন্সপেক্টরের পাশে।

বসেই স্যুট পরা লোকটি পকেট থেকে দু'টি আইডি কার্ড বের করে ডিডিপি-কে দেখিয়ে বলল, 'এই দেখুন আইডি কার্ড। আমরা দু'জন বোনাফাইড গোয়েন্দা অফিসার।' হেসে উঠল দু'জনই হো হো করে।

গাড়ি ভিভিআইপি লাউঞ্জে রেখে লিফট দিয়ে উঠে ভিভিআইপি লাউঞ্জে ঢুকল ড. আজদা, ড. সাহাব নূরী ও সাবিহা সাবিত। তারা দেখল, ভ্যান পুলিশের ডিজিপি মাহির হারুন আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত।

ড. আজদাদের দেখেই ডিজিপি মাহির হারুন বলল, 'আমি আপনাদের কথাই ভাবছিলাম। আপনারা দেরি করছেন কেন?'

'ধন্যবাদ স্যার। প্লেন সিডিউল সময়ে আসলেও পনের-বিশ মিনিট সময় আছে প্লেন ল্যান্ড করতে।' বলল ড. আজদা।

'আপনি বলছেন আরও পনের বিশ মিনিট দেরি আছে। কিন্তু আরও বিশ মিনিট আগে আংকারা থেকে পুলিশ প্রধান এরকেন আমাদের তাড়া দিয়েছেন যাতে তাড়াতাড়ি আমি এয়ারপোর্টে এসে আবু আহমদের সিকিউরিটির বিষয়টা দেখি।' ডিজিপি মাহির হারুন বলল।

'মি. আবু আহমদের নিরাপত্তা নিয়ে ওরা এত উদ্বিগ্ন?' বলর ড. আজদা।

'কারণ মি. আবু আহমদকে আমরা চিনি না, তারা চেনেন। এসব বিষয় নিয়ে আজ সকালেই প্রসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, সেনা প্রধান ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রধানের সাথে সম্মিলিত মিটিং করেছেন দীর্ঘক্ষণ ধরে। সেখান থেকেই তিনি সোজা এসেছেন আংকারা এয়ারপোর্টে।' ডিজিপি মাহির হারুন বলল।

'আসলে উনি কে স্যার? রাষ্ট্রের শীর্ষ ব্যক্তিরা যার সাথে দীর্ঘক্ষণ বসে মিটিং করেন, তিনি অতি অসাধারণ। কে তিনি?' জিজ্ঞাসা সাবিহা সাবিতের। বিস্ময় তার চোখে।

'আমি জানি না সাবিহা সাবিত। আমি বিস্মিত উপরের যারা জানেন, তারা কেউ মুখ খুলেন না। কয়েকদিন আগে আমি আংকারা গেলে পুলিশ প্রধান মি. এরকেনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন মি. আবু আহমদ আসলে কে? তিনি বলেছিলেন যে এ প্রশ্ন তারও। কিন্তু প্রশ্নটা তিনি অন্য কাউকে করতে সাহস পাননি। তিনি বলছেন, প্রসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও জেনারেল মোস্তফা ছাড়া আর কেউ তার পরিচয় জানেন না।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

মুখ হা হয়ে গেল ড. আজদা, ড. সাহাব নুরী ও সাবিহা সাবিতের। সাবিহা সাবিতই বলল, 'এমন ব্যক্তিত্ব কে হতে পারেন স্যার, আমাদের দেশে কিংবা মুসলিম বিশ্বে?'

কিছু বলতে যাচ্ছিল ডিজিপি মাহির হারুন, এ সময় এয়ার লাইনসের প্রোটকল অফিসার এসে মাহির হারুনকে বলল, 'স্যার, প্লেন ল্যান্ড করেছে। মি. আবু আহমদই প্রথম নামবেন।'

সবার চোখ গেল কাঁচের দেয়ালের ভেতর দিয়ে বাইরে।

দুই তিন মিনিটের মধ্যেই এয়ার লাইন্সের সেই প্রোটোকল অফিসার আবু আহমদকে নিয়ে প্রবেশ করল ভিভিআইপি লাউঞ্জে।

বেশ দূরে থাকতেই আহমদ মূসা ডিজিপি মাহির হারুনসহ সকলের উদ্দেশ্যে সালাম দিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ মি. মাহির হারুন কষ্ট করে এসেছেন সেজন্য।'

সবাই সালাম নিল। সালাম নিয়ে ডিজিপি মাহির হারুন বলল, 'আমার কষ্টের কথা বললেন, ওদের কষ্টের কথা বললেন না। বৈষম্য করা হলো না?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ওরা আমার ভাই-বোন তো। ভাইয়ের জন্যে ওরা একটু কষ্ট করতেই পারে।'

'আমাকে ভাই বলা হোল না, এটাও তো একটা বৈষম্য।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন। তার মুখে হাসি।

'আপনি ভাই অবশ্যই। কিন্তু তার সাথে আপনি ভ্যানের পুলিশ প্রধানও। আপনার কাজ, সব সময় আইনের নিয়ন্ত্রণ। অতএব সে সময় খুবই মূল্যবান। সব নাগরিকের এই মূল্য সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ মি. আবু আহমদ। সত্যিকার বড় যারা, তারা সবাইকে বড় করে দেখে। পুলিশকে এই মর্যাদার আসন কেউ দেয় না।'

আহমদ মুসা ডিজিপি মাহির হারুনের সাথে হ্যান্ডশেক করার পর ড. সাহব নূরীর সাথে হ্যান্ডশেক করে সাবিহা সাবিতের সামনে গিয়ে বলল, 'ভাববেন না মি. মাহির হারুন সাবিহা সাবিতদের জেনারেশনকে দেখবেন ভিন্নভাবে। ওরা দেশ, জাতিকে বড় করবে, পুলিশকেও বড় করবে। কেমন, তাই না সাবিহা সাবিত?'

মুহূর্তের জন্যে কথায় ছেদ টেনেই আহমদ মুসা আবার বলল, 'কি খবর, সাবিহা সাবিত? তোমাদের থিসিসের একটা শক্ত অংশ নিয়ে বিপদে পড়েছিলে, সেটা কেটেছে?'

হাসল সাবিহা সাবিত। সেই সাথে বিস্মিত তার চোখ। বলল, 'ঐ ছোট ঘটনাও আপনার মনে আছে?'

'ওটা ছোট ঘটনা নয়। ড. আজদাকে জিজ্ঞেস করে দেখ। যারা ডক্টরেট করেছে তারা এটা জানে। তাই না ড. আজদা?' বলল ড. আজদার দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা। সবাই মিলে বসতে গেল।

বসতে গিয়ে আহমদ মুসা হাতের ব্যাগটা সোফায় রেখে বলল, 'আপনারা বসুন। আমি একটু ফ্রেশ হয়ে আসি। অজু বাকি আছে, প্লেনে অজুটা করতে পারিনি।'

আহমদ মুসা এগোলো টয়লেটের দিকে।

সবাই বসেছে।

ড. সাহাব নূরী বলল, ‘তার মানে মি. আবু আহমদ সব সময় অজুর সাথে থাকেন?’

হ্যাঁ মামা, এটা আমি খেয়াল করেছি। আমি দেখেছি, নামাযের সময় নয়, তবুও তিনি অজু করে এলেন। তার মানে অজু ভাঙলেই তিনি অজু করেন।’ ড. আজদা বলল।

‘আমি শুনেছি দরবেশ-বুজুর্গদের এ গুণ থাকে। খুবই ভালো ও মহৎ গুণ এটা। এ গুণও মি. আবু আহমদের আছে! এটা এটা বড় ব্যাপার। একজন লোক যখন সব সময় আল্লাহমূখী থাকতে চায়, তখন তার মধ্যে এ গুণের সৃষ্টি হয় শুনেছি।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

‘একটা ব্যাপার আপনারা লক্ষ্য করুন। কিছুক্ষণ আমরাই আলোচনা করলাম যে তিনি বড় একজন ব্যক্তিত্ব, যার পরিচয় তুরস্কের পুলিশ প্রধানকেও জানতে দেয়া হয়নি! প্রেসিডেন্ট আর প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যার পরিচয় সীমাবদ্ধ! সেই ব্যক্তিত্ব একমাত্র আমাদের মাঝে এলেন কিন্তু বুঝা গেল না যে তিনি এত বড় একজন ব্যক্তিত্ব! তিনিই প্রথম আমাদের সালাম দিয়েছেন। কথাও বলেছেন তিনি আমাদের সাথে। আমার থিসিসের মত ছোট ঘটনার খবরও তিনি নিয়েছেন। এ সবের মাধ্যমে তিনি আমাদের গুরুত্বকেই বড় করে তুলে ধরেছেন, নিজের বড় ব্যক্তিত্বের, তার নিজের মর্যাদার কথা এবং তা প্রদর্শন করার বিষয় তিনি বিন্দুমাত্রও ভাবেননি।’ সাবিহা সাবিত বলল।

‘এটা সত্যিকার বড়ত্বের প্রমাণ। সত্যিকার বড়দের কাছে একজন পথের মানুষও পর্বতের মত বড়। বড়রা কিন্তু নিজেকে সবার চেয়ে ছোট মনে করে। মি. আবু আহমদের মধ্যে এইমাত্র এই গুণেরই তো আমরা প্রকাশ দেখলাম।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

আহমদ মুসা ফ্রেশ হয়ে ফিরে এসেছে। গল্পগুজব চলছে।

এরই মধ্যে স্ন্যাক্স পরিবেশন করেছে লাউঞ্জের লোকরা।

সিকিউরিটির একজন লোক এসে বলল ডিজিপি মাহির হারুনকে, ‘স্যার, সব রেডি। মেহমানের গাড়ি পার হবার পর, অন্য যাত্রীরা তাদের গাড়িতে উঠবেন।’

‘ঠিক আছে, আমরা উঠছি।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

সবাই উঠে দাঁড়াল। চলল সবাই লিফটের দিকে।

লিফটে উঠে ডিজিপি মাহির হারুন বলল ড. আজদাকে, ‘আপনাদের ট্রাভেল প্ল্যানটা কী ড. আজদা?’

‘ধন্যবাদ। আমরা একপাই গাড়ি এনেছি সবাই আমরা এক সাথে যেতে চাই বলে। স্যার ও মামা বসবেন পেছনের সীটে। সাবিহা সাবিত গাড়ি ড্রাইভ করবে। আমি বসব তার পাশের সীটে।’

‘অল রাইট। আমার গাড়িটা থাকবে আপনাদের গাড়ির পেছনে। আপনাদের গাড়ি স্টার্ট নিয়ে এগোলে আমার গাড়ি স্টার্ট নেবে।’

লিফট থেকে ভিভিআইপি কার পার্কিং-এ এসে ডিজিপি মাহির হারুন আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করে তার গাড়ির দিকে এগোলো। আহমদ মুসাও এগোলো তার গাড়ির দিকে।

আহমদ মুসার ডান পাশে সাবিহা সাবিত। তবে সে ধাপ খানেক সামনে এগিয়েছে, ড্রাইভিং সীটে যাবে বলেই তার এই এগোনোটা।

গাড়ির কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে তারা।

আশ-পাশটা দেখতে গিয়ে হঠাৎ সাবিহা সাবিতের চোখ দু’টি দুই তিন সারি সামনের একটা গাড়ির জানালায় আটকে গেল। দেখল গাড়িটার দু’টি জানালা অর্থাৎ ড্রাইভিং সীট ও পেছনের সীটের জানালা দিয়ে রিভলভারের দুই নল তাক করেছে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে। রিভলভারের নলগুলো জানালার বাইরে বেরিয়ে আসেনি বলে সাধারণভাবে তা কারো নজরে পড়ার কথা নয়। বুঝতে পারল সাবিহা সাবিত কী ঘটতে যাচ্ছে।

কেঁপে উঠল তার গোটা অন্তরাত্মা। এখন তো চিৎকার করার সময় নেই, সাবধান করারও সময় নেই। পিছু হটে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়ার সময়ও নেই।

আর কিছু ভাবতে পারল না সাবিহা সাবিত। চোখের পলকে নিজের দেহটাকে সে সরিয়ে নিল আহমদ মুসার সামনে।

প্রায় একই সংগে দু’টি গুলি এসে বিদ্ধ হলো সাবিহা সাবিতের বাম বুকে। পড়ে যাচ্ছিল সাবিহা সাবিত পেছন দিকে।

আহমদ মুসার চোখে সবটা বিষয় ধরা পড়ে গেছে ততক্ষণে। জ্যাকেটের পকেট থেকে তার ডান হাতে উঠে এসেছে রিভলভার।

আহমদ মুসা বাঁ হাত দিয়ে সাবিহা সাবিতকে বুকে আঁকড়ে ধরে ডান হাত দিয়ে গুলি করল গাড়িটার সামনের টায়ারে।

গাড়িটা চলতে শুরু করেছিল। একটা বাঁক নিয়ে শব্দ করে গাড়িটা থেমে গেল। গাড়ি থেকে বের হয়ে দু'জন সেনা অফিসার ছুটে পালাচ্ছিল।

আহমদ মুসা গুলি করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই দু'সেনা অফিসারের দেহই বিস্ফোরিত হলো। দু'টি দেহই অগ্নি গোলক হয়ে কিছুটা উপরে উঠে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল।

ডিজিপি ছুটে আসছিল আহমদ মুসার গাড়ির দিকে। আহমদ মুসা তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মি. মাহির হারুন, আপনি ওদিকটা দেখুন ওদের আরেকটা গ্রুপ ভিভিআইপি কারপার্কেই আছে।'

'দেখছি আমি মি. আবু আহমদ।' বলে ডিজিপি মাহির হারুন সন্ত্রাসীদের গাড়ির দিকে ছুটল।

ড. সাহাব নূরী, আপনি ড্রাইভে বসুন। আর ড. আজদা আপনি দরজা খুলুন। একে হাসপাতালে নিতে হবে। দ্রুত কণ্ঠে আহমদ মুসা বলল ওদের লক্ষ্য করে।

গাড়ির দরজা খুলল ড. আজদা ছুটে এসে।

আহমদ মুসা সাবিহা সাবিতকে পাঁজকোলা করে নিয়ে গাড়িতে উঠল। সীটের উপর শুইয়ে দিতে গেল সাবিহা সাবিতকে।

'স্যার, আমাকে শক্ত করে ধরে রাখুন। ওরা আমাকে নিতে আসছে। আর একটু সময় চাই। একটা কথা বলতে চাই।' খুব কষ্টের সাথে বেরিয়ে আসা এই কয়েকটা কথা প্রথম শোনা গেল সাবিহা সাবিতের কণ্ঠ থেকে।

'ঠিক আছে আমি ধরে আছি তোমাকে। তোমার কিছু হবে না। আমরা নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে হাসপাতালে। কী বলবে বল তুমি।'

‘আমার চেয়ে সুখী মানুষ এই মুহূর্তে দুনিয়াতে আর কেউ নেই, স্যার। ওরা আপনাকে মারতে চেয়েছিল। আমি আপনাকে বাঁচাতে পেরেছি আল্লাহ্’র ইচ্ছায়।’ থেমে গেল সাবিহা সাবিতের কণ্ঠ।

চোখ দু’টি বুজে গেল তার।

‘তুমি এটা করতে গেলে কেন, সাবিহা? আমার তো দুনিয়াতে চাইবার কিছু নেই! কিন্তু তোমার তো জীবনের শুরু।’ আহমদ মুসা বলল।

‘দুনিয়াতে আপনার চাইবার কিছু নেই। কিন্তু দুনিয়ার প্রয়োজন আছে আপনাকে। আমার মত সাবিহা সাবিত শত আছে, আরও শত জন্মাবে। কিন্তু আপনার মত লোকদের আল্লাহ্ কদাচিৎ দুনিয়াতে পাঠান। আমি খুব খুশি। আমি আপনার বাহুর উপর মরতে পারছি। আমি...।’

‘তুমি এত কথা বলো না সাবিহা। আল্লাহ্ তোমাকে বাঁচাবেন। আমরা যাচ্ছি হাসপাতালে।’ বলল আহমদ মুসা।

দু’চোখ বুজে গিয়েছিল সাবিহা সাবিতের। খুলে গেল আবার। গভীর ক্লান্তি সে চোখে। যেন ঘুমে ছেয়ে আছে তার দুই চোখ। তার অস্ফুট কণ্ঠে আমি সেটা জানার জন্যে তো আর বেঁচে থাকবো না। বলবেন কি স্যার আপনার পরিচয়।’

আহমদ মুসার দু’চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল দু’ফোটা অশ্রু। বলল, ‘আমার পরিচয় না দেয়া আমার অহংকার নয়, সাবিহা; সেটা আমার প্রয়োজন। দুঃখিত আমি এর জন্যে। আমি তোমাদের এক ভাই- আহমদ মুসা।’

দু’চোখ বুজে গিয়েছিল সাবিহা সাবিতের। চমকে ওঠার মত প্রচণ্ড শক্তিতে তা যেন খুলে গেল। স্থির হলো আহমদ মুসার মুখের উপর। প্রাণ ভরে সমগ্র সত্তা দিয়ে যেন দেখছে আহমদ মুসাকে।

ওদিকে সিটের এক কোনে কোন রকমে বসে সাবিহা সাবিতের মাথায় হাত রেখে অঝোরে কাঁদছিল ড. আজদা। আহমদ মুসার কণ্ঠের শেষ উচ্চারণ শুনে সেও চমকে উঠে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। তার সে চোখেও বিস্ময়ের ঝড় উঠেছে।

আবার চোখ দু’টি বুজে গেল সাবিহা সাবিতের। কিন্তু তার ঠোঁটে অসীম এক প্রাপ্তি ও প্রসন্নতার হাসি। বলল অস্ফুট কণ্ঠে চোখ বুজে থেকেই,

‘আলহমদুলিল্লাহ্! আমার সৌভাগ্য। আল্লাহ্’র অসীম দয়া। আল্লাহ্’র কাছে নিয়ে যাবার মত সঞ্চয় আমার কিছুই ছিল না। কিন্তু এখন আল্লাহ্-কে বলতে পারবো, তার অতিপ্রিয় এক বান্দার পাশে আমি দাঁড়াতে পেরেছিলাম।’

চোখ দু’টি তার আবার খুললো। দৃষ্টি নিবদ্ধ আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘অনেক, অ-নে-ক বড় আপনি, পরকালেও কি পাশে থাকতে পা-রবো আপনার।’ তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে এবং তার কণ্ঠের শেষ শব্দের সাথে অবরুদ্ধ আবেগের একটা উচ্ছ্বাস যেন ভেঙে পড়ল। কেঁপে উঠল তার দেহটা। সেই সাথে তার মুখটা গড়িয়ে পড়ল এক পাশে। তার মুখে, দেহে নেমে এল প্রশান্তির এক নিখুঁত নিস্তব্ধতা।

সাবিহা সাবিতের মাথা জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল ড. আজদা।

আহমদ মুসার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, ‘ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’। কাঁপা, ভাঙা কণ্ঠ আহমদ মুসার।

গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিল ড. সাহাব নূরী।

তার চোখ দিয়েও অশ্রু গড়াচ্ছে।

‘ড. নূরী, আপনি ড. মাহজুন মাজহারকে টেলিফোন করুন। তাঁকে ঘটনা জানিয়ে হাসপাতালে আসতে বলুন। আর চলুন আপনি হাসপাতালে।’

আহমদ মুসাই সাবিহা সাবিতের দেহ যেভাবে ধরে বসেছিল, সেভাবেই তাকে গাড়ি থেকে বের করে এনে হাসপাতালের ট্রলিতে তুলে দিল।

পাশেই সাবিহা সাবিতের পিতা ড. মাহজুন মাজহার দাঁড়িয়েছিল। মেয়ের রক্ত ভেজা লাশ দেখেই তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল সে।

তার পাশে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

সান্তনা দেয়ার চেষ্টা করলো না আহমদ মুসা। কাঁদা উচিত। মিনিট খানেক অপেক্ষার পর হাসপাতালের লোকরাই বিনয়ের সাথে বলল, ‘স্যার, দয়া করে আমাদের কাজ করতে দিন,০ প্লীজ।’

ড. মাহজুন মাজহার মুখ তুলল। তাকাল ওদের দিকে। অশ্রু ধোয়া তার মুখ।

উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘চল বাবা, কোথায় যাবে।’

ট্রলি থেকে একটু সরে দাঁড়াতে গিয়ে দেখতে পেল আহমদ মুসাকে। সংগে সংগে জড়িয়ে ধরল তাকে। কেঁদে উঠল আবার।

'স্যরি, স্যার। আমাকে বাঁচাতে গিয়েই জীবন দিতে হয়েছে সাবিহা সাবিতকে। আমি স্যরি।' বলল আহমদ মুসা।

ড. মাহজুন মাজহার আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিয়ে তার দুই হাত আহমদ মুসার কাঁধে রেখে বলল, 'স্যরি কেন?' আমার মেয়ে কি যা করার নয় তাই করেছে, আমার মেয়ে কি অন্যায় কিছু করেছে? আমি কাঁদছি কি এই জন্যে যে আমার মেয়ে কেন জীবন দিতে গেল? না, তা নয় মি. আবু আহমদ। আমার এ কান্না গৌরবের। দেশের জন্যে বিনা দ্বিধায় জীবন দেয়ার মত সাহস আমার মেয়ে দেখাতে পেরেছে, এই দরনের মহৎ সিদ্ধান্ত সে নিতে পেরেছে, এই গৌরবেই আমি কাঁদছি। আলহামদুলিল্লাহ্! আমার মেয়ে ক'দিনেই আপনাকে চিনতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে যে, শত সাবিহা সাবিতের বিনিময়ে হলেও আপনাকে বাঁচানো দরকার। আমি...।'

আহমদ মুসা জড়িয়ে ধরল ড. মাহজুন মাজহারকে। বলল, 'স্যার, এভাবে বলবেন না। দুনিয়ার সব মানুষ সমান। আর কারও জন্যে পৃথিবীর কোন কাজ আল্লাহ্ আটকে রাখেন না। তিনিই সবকিছুর নিয়ামক ও নিয়ন্তা।'

ড. মাহজুন মাজহার বলল, 'তোমার কথাও ঠিক। কিন্তু আল্লাহ্ যেমন পাঁচ আঙুলকে সমান করে সৃষ্টি করেননি তেমনি দুনিয়ার সব মানুষ মেধা, যোগ্যতার দিক দিয়ে সমান নয়।'

কথা শেষ করে বলল, 'চল, আমরা ওদিকে যাই। ড. আজদা ও ড. সাহাব নূরী সাবিহা সাবিতের সাথে গেছে।'

দু'জনেই চলল হাসপাতালের ভেতরে।

এক ঘন্টা পরে ভ্যান-এর পুলিশ প্রধান ডিজিপি মাহির হারুন এল হাসপাতালে।

আহমদ মুসা তখন বসেছিল হাসপাতালের ভিআইপি রিসেপশন লাউঞ্জে। সেখানে বসেছিল, আহমদ মুসা, ড. আজদা, ড. সাহাব নূরী, ড. মাহজুন মাজহার একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর।

ডিজিপি মাহির হারুন লাউঞ্জে প্রবেশ করতেই পুলিশ ইনসপেক্টর উঠে দাঁড়াল।

'তুমি একটু ওদিকে বস ইনসপেক্টর।'

পুলিশ ইনসপেক্টর একটা স্যালুট দিয়ে বাইরে চলে গেল।

ডিজিপি মাহির হারুন বসেই বলল, 'স্যরি ড. মাহজুন মাজহার। সাবিহা সাবিত মেয়েটা অত্যন্ত ব্রাইট ছিল। সে আমাদের সবার আদরের। কেউই...।'

'মি. মাহির হারুন, সাবিহা সাবিত বড় ছিল বলেই অতো বড় সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে, বড় সাহস দেখাতে পেরেছে।' বলল ড. মাহজুন মাজহার। তার শেষের কথাগুলো কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ড. আজদা ড. মাহজুন মাজহারের পিঠে সান্তনার হাত রেখে বলল, 'আপনি ঠিক বলেছেন আংকল। বুকে দুই দুইটি গুলি খাবার পরও তার চোখে মুখে দুঃখ-বেদনার কোন চিহ্ন ছিল না। একটুও কাঁদেনি, আর্তনাদ করেনি সাবিহা। মৃত্যুকে আসন্ন জেনেও সে বলেছে, আমার চেয়ে সুখি মানুষ এই মুহূর্তে, স্যার, ওরা আপনাকে মারতে চেয়েছিল, আমি আপনাকে বাঁচাতে পেরেছি আল্লাহ্'র ইচ্ছায়। দুনিয়াতে আপনার চাইবার কিছুনেই হয়তো, কিন্তু দুনিয়ার প্রয়োজন আছে আপনাকে। শেষ মুহূ...।'

ড. আজদার কথার মাঝখানে আহমদ মুসা বলে উঠল, 'সাবিহা সাবিত ছিল এখানে আমাদের সবার ছোট, কিন্তু সবার চেয়ে বড় কাজ সে করেছে। আল্লাহ্ তার শাহাদাত কবুল করুন। তার জন্যে এখন দোয়াই হবে তাকে স্মরণ করার, শ্রদ্ধা জানানোর উপায়।'

'প্লিজ আপনারা এটাই করুন। একজন শহীদের পিতা হওয়ার এখন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া।' বলল ড. মাহজুন মাজহার।

সবাই বলে উঠল। আমিন। একটু নিরবতা।

'মাফ করবেন সকালে, আমি মি. আবু আহমদের সাথে একটু কথা বলতে চাই।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

'তাহলে আমরা সবাই বাইরে যাবার দরকার নেই। আমাকে একটু কথা বলার সুযোগ দিলেই হলো।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

‘কোন অসুবিধা নেই। আমরা বরং খুশিই হবো।’ বলল ড. আজদা।

‘মি. আবু আহমদ, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। ওদের আরেকটা গ্রুপ আরেকটা গাড়িতে ওখানে উপস্থিত ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, গুলি নিক্ষেপকারীরা ছিল সৈনিকের বেশে, অন্যদিকে আরেকটা গাড়িতে যারা ছিল, তারা ছিল পুলিশের গাড়িতে পুলিশের পোষাকে। পুলিশের গাড়ি হওয়ায় এবং গাড়িটাকে দ্রুত চলে যেতে দেখে আমি প্রথমটায় বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আমি ধারণা করেছিলাম. পুলিশ হয়তো সন্দেহজনক কাউকে তাড়া করছে। কিন্তু যখনই মনে পড়ল গুলি নিক্ষেপকারীরা ছিল সৈনিকের পোষাকে, তখনই বুঝতে পারি আমি বিভ্রান্ত হয়েছি। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল পুলিশের গাড়ি ভেবে গেটে কেউ তাদের আটকায়নি। শেষ পর্যন্ত গাড়িটার আর হদিস মেলেনি। গাড়ির নাম্বার পাওয়া গেছে, কিন্তু সেটা অবশ্যই ভুয়া নাম্বার হবে।’

একটু থামল ডিজিপি মাহির হারুন। মুহূর্ত কয় পরে আবার শুরু করল, ‘কিন্তু আমি বিস্মিত হচ্ছি, গুলি নিক্ষেপকারীদের মরতে হলো কেন? ধরা যাতে না পড়ে এ জন্যেই কি?’

‘ধরা যাতে না পড়ে এটা নিশ্চিত করার জন্যই তাদের দেহে আগে থেকে বোমা বাঁধা ছিল, এটাই হতে পারে। তবে সাধারণঃত এমনটা হয় না। নিজেদের কাউকে যখন কোন মিশনে পাঠানো হয়, তখন তার ধরা পড়া রোধ করার জন্যে তাকে হত্যা করা হবে এটা তাকে জানতে দেয়া হয় না। নিজেদের কাউকে যখন কোন মিশনে পাঠানো হয়, তখন তার ধরা পড়া রোধ করার জন্যে তাকে হত্যা করা হবে এট তাকে জানতে দেয়া হয় না। কারও গায়ে বোমা বেঁধে যখন কাউকে কোন মিশনে পাঠানো হয় তখন সেটা হয় বাধ্য করে কাজ করানোর ঘটনা। আমার মনে হয় আজকের ঘটনায় এমনটাই করা হয়েছে। আমার মনে হয়, এই বন্দুকবাজ দু’জনকে অঢেল টাকা দিয়ে বা অন্যকোনভাবে বাধ্য করে এই শর্ত দেয়া হয়েছে যে, মারতে না পারলে তাদের মরতে হবে। মারাটা যাতে নিশ্চিত হয়, সেজন্যেই এমনটা করা হয়েছে। না মারতে পারলে যেহেতু তাদেরই মরতে হবে, তাই মরার ব্যাপারে সামান্যতম গাফলতি হবে না।’ আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ মি. আবু আহমদ। আপনার চিন্তাটাই সঠিক। তাহলে ধরে নিতে হবে সেনা অফিসারের পোষাক পরা গুলি নিক্ষেপকারীরা এবং পুলিশের পোষাকে আসা যারা তাদের হত্যা করল, তারা এক গ্রুপের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হবার কথা ছিল।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

'হওয়াটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা গাড়িটা অক্ষত আছে? গাড়িতে কিছু পাওয়া যায়নি? গাড়ির কাগজ-পত্র থেকে কোন ক্লু পাওয়ার সুযোগ আছে কিনা?' আহমদ মুসা বলল।

'গাড়ির কাগজপত্র ও গাড়ির নাম্বার, চেসিস নাম্বার দেখে কিছু বের করা যায় কিনা তা পরে ভেবে দেখতে হবে। গাড়িতে অন্য কোন কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। সিগারেটের একটা প্যাকেট পাওয়া গেছে। প্যাকেটের গায়ে কিছু হিজিবিজি লিখা আছে। এগারো ডিজিটের একটা নাম্বারও আছে, কিন্তু টেলিফোন নাম্বার নয়।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

'সিগারেটের প্যাকেটটা কি আছে?' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ, আমরা নিয়ে এসেছি। আমার কাছেই আছে।' বলে ডিজিপি মাহির হারুন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে আহমদ মুসার হাতে দিল। আহমদ মুসা সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে একনজর উল্টে-পাল্টে দেখল।

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। ডিজিপি মাহির হারুন যাকে হিজিবিজি লেখা বলেছে, সেটা হিজিবিজি কিছু নয় কাঁপা হাতের হিব্রু ভাষায় লেখা। নাম্বারগুলোর দিকে চোখ নিবদ্ধ হলো আহমদ মুসার। এগারোটি ডিজিটের উপর একবার চোখ বুলিয়ে আহমদ মুসা ডিজিপি মাহির হারুনকে বলল, 'মি. মাহির হারুন, জার্মান মোবাইল কোম্পানি ডিটিএল-এর বেসিক নাম্বার কি?'

'জিরো থ্রি থ্রি সিক্স।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। বলল, 'বেসিক নাম্বারের চার ডিজিটের দুই জোড়ার পত্যেকটিকে উল্টিয়ে লিখেছে। জিরো থ্রি হয়েছে থ্রি জিরো এবং থ্রি সিক্স হয়েছে সিক্স থ্রি। তাহলে পরবর্তী জোড় সংখ্যাগুলোকেও নিশ্চয় এভাবে উল্টিয়ে লেখা হয়েছে। তবে সর্বশেষ বেজোড় ডিজিটটি ঠিক থাকার কথা।'

‘কি করে বুঝলেন? ওটা কি কোন টেলিফোন নাম্বার?’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

‘হ্যাঁ মি. মাহির হারুন। এটি ডিটিএল-এর মোবাইল নাম্বার বলেই মনে হয়। ডিটিএল-এর চারটি বেসিক ডিজিটের দুই জোড়ার প্রত্যেক জোড়ার দুই ডিজিটকে আগে পিছে লিখেছে। আমি মনে করি পরবর্তী জোড়াগুলোকেও এইভাবে আগে-পিছে করে লিখেছে। দেখুন, এইভাবে সাজালে ডিটিএল-এর একটা মোবাইল নাম্বার হয়ে যায়।

সিগারেটের খোলটা হাতে নিল ডিজিপি মাহির হারুন। একবার ভালো করে চোখ বুলিয়েই সে উচ্ছাসিত কণ্ঠে বলে উঠল, ধন্যবাদ আবু আহমদ। আপনি নির্ভুলভাবে ধাঁধাঁটাকে ভেঙেছেন। নিশ্চিতই কারো একটা মোবাইল নাম্বার হবে এটা। তাদের কারো কি?’

‘তাদের কারো হবার সম্ভাবনাই বেশি। মনে হয়, গাড়িতে বসেই কষ্ট করে টেলিফোন নাম্বারটা লিখেছে। দেখুন প্রত্যেকটি ডিজিটই কিছুটা আঁকাবাঁকা এবং মাঝের স্পেসগুলোর মধ্যে কোন ভারসাম্য নেই। তার মানে চলন্ত গাড়িতে বসেই নাম্বারটি লেখা হয়েছে। জরুরি বলেই কষ্ট করে এভাবে লেখা হয়েছে এবং আজ গাড়িতে বসেই এই নাম্বার লেখা হয়েছে।’ বলল আহমদ মুসা।

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ডিজিপি মাহির হারুনের। বলল, ‘আপনি রাইটলি আইডেনটিফাই করেছেন আবু আহমদ। টেলিফোন নাম্বারটি আমাদের কাজে আসতে পারে। অন্য হিজিবিজি লেখার কিছু বুঝলেন?’

‘অন্য হিজিবিজি লেখাটাও হিব্রু। চলন্ত গাড়িতে বসে লেখা হয়েছে বলেই একটু বেশি হিজিবিজি লাগছে। এই হিজিবিজি অক্ষারগুলো হচ্ছে একটা রাস্তার নাম এবং একটা লোকেশনের নাম্বার।’ থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা এই ঠিকানাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করল। এখানে এভাবে সবার সামনে এই ঠিকানা প্রকাশ করা ঠিক মনে করল না। তাছাড়া হাসপাতালের এই ভিআইপি লাউঞ্জ কতটা নিরাপদ, এখানে কোন ইলেকট্রনিক চোখ বা কান আছে কিনা কে জানে। সুতরাং ঠিকানার বিষয়টা চেপে যাওয়াই ঠিক মনে করল আহমদ মুসা। ডিজিপি মাহির হারুনের পরবর্তী জিজ্ঞাসার জবাবে বলল আহমদ

মুসা, ‘ওটা নিয়ে আর একটু ভাবতে হবে। সিগারেটের খোলটা আমার কাছেই থাক।’

‘ঠিক আছে মি. আবু আহমদ, ওটা আপনার কাছেই থাকা দরকার। তদন্ত পরিচালনার সব দায়িত্ব আপনার উপর দেয়া হয়েছে। তবে ওরা আপনাকে মারার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এ চেষ্টা তারা শুরু থেকেই করছে। গতকাল আংগোরায় আপনার উপর আক্রমণ হয়েছে। আজ এখানে আপনাকে হত্যার একটা ভয়ংকর পরিকল্পনা করেছিল। আমরা আপনার জন্যে উদ্বিগ্ন। এরপর থেকে আপনার নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। প্লিজ আপনাকে সাবধান হতে হবে। আমরা আপনাকে যে কোন সাহায্য করতে প্রস্তুত।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

‘ধন্যবাদ আপনাকে। সাবধান থাকা সব মানুষের মত আমারও খুব স্বাভাবিক একটা প্রবণতা। বাকি আল্লাহ্ ভরসা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আল্লাহ্ ভরসা। আমার মেয়ে যাদের ষড়যন্ত্রে নিহত হয়েছে, তাদের আমি শাস্তি চাই। প্রার্থনা করি, ওদের পাকড়াও করে মি. আবু আহমদ ওদের শাস্তি দিতে এবং ষড়যন্ত্র উচ্ছেদ করতে সমর্থ হোন।’ বলল ড. মাহজুন মাজহার।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বলে উঠল, ‘আমি একটু উঠতে চাই। ওদিকে কি হচ্ছে তা একটু দেখা দরকার।’

‘অবশ্যই, চলুন আমরাও যাব।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

সবাই উঠে দাঁড়াল।

৪

গাড়ি ছুটছে আহমদ মুসার। সূর্য উঠতে তখনও অনেক বাকি।

মাউন্ট আরারাতের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ইজদির প্রদেশের রাজধানী আর পাঁচ মিনিটের পথ।

তাহাজ্জুদ নামায শেষ করেই আহমদ মুসা ভ্যান থেকে গাড়িতে উঠেছে। ভোরের রাজপথ একদম ফাঁকা।

ঝড়ের বেগে ছুটতে পেরেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

রাজধানী ইজদির শহরের কাছাকাছি রাস্তার পাশের একটা মসজিদে ফজরের নামায পড়ে নিয়েছে আহমদ মুসা।

রাজধানী ইজদির শহরে প্রবেশ করল আহমদ মুসার গাড়ি।

ইজদির শহরে কয়েকবার এসেছে আহমদ মুসা।

আরিয়াস রোড আহমদ মুসার চেনা।

আরিয়াস রোডে প্রবেশ করল তার গাড়ি।

আহমদ মুসাকে যারা হত্যার চেষ্টা করেছিল, যারা হত্যা করেছে সাবিহা সাবিতকে তাদের গাড়িতে পাওয়া সিগারেটের প্যাকেটে এই রাস্তার নাম লেখা ছিল।

রাতের আঁধার নেই। কিন্তু আঁধারের রেশ তখনও আছে।

আহমদ মুসা গাড়ির গতি স্লো করে দিয়েছিল। রাস্তার পাশের বাড়ির নাম্বারগুলো দেখছিল সে।

ওয়ান থ্রি নাম্বার পেয়ে গেল আহমদ মুসা। আনন্দের প্রকাশ ঘটলো আহমদ মুসার চোখে-মুখে।

গাড়ি দাঁড় করাল সে।

কিন্তু গাড়ির জানালা নামিয়ে বাড়িটার দিকে চাইতেই আনন্দ উবে গেল আহমদ মুসার মন থেকে।

ওয়ান থ্রি ওয়ান বাড়িটা একটা দু'তলা মসজিদ। মসজিদের সাথে একটা মাদ্রাসার সাইনবোর্ড। মসজিদ ও মাদ্রাসার একপাশে পেল খোলা গ্রাউন্ড, অন্যপাশে সুন্দর একটা সবজি বাগান।

হতাশ হলো আহমদ মুসা। এ রকম স্থানে তাকে হত্যার চেষ্টাকারী উল্কিওয়ালারা কিংবা হিব্রু জানা তুর্কি, ইহুদি বা আর্মেনীয় ইহুদিরা কেউ থাকার কথা অবশ্যই নয়।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল সিগারেটের প্যাকেটে টেলিফোনের নাম্বার লিখতে গিয়ে লেখক প্রত্যেকটা দুই ডিজিটের প্যাকেটে টেলিফোনের নাম্বার লিখতে গিয়ে লেখক প্রত্যেকটা দুই ডিজিটের জোড়ার অংক যদি আগপিছ করে লিখতে পারে, তাহলে রাস্তার লোকেশন নাম্বার লেখার ক্ষেত্রেও সে এটাই করতে পারে।

খুশি হলো আহমদ মুসা। ওয়ান থ্রি ওয়ান মানে ১৩১-এর প্রথম জোড়ার অংক আগে-পিছে করে নিলে জোড়ার অংক '১৩'-এর বদলে '৩১' হয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে রাস্তার নাম্বার দাঁড়ায় থ্রি ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ ৩১১। আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো এই থ্রি ওয়ান ওয়ানই তার টার্গেট নাম্বার।

গাড়ি স্টার্ট দিল আহমদ মুসা। ছুটল গাড়ি।

অনেকটা সামনে হবে নাম্বারটি।

অনেকটা চলার পর রাস্তার পাশের বাড়ির নাম্বারের দিকে তাকাল আহমদ মুসা। প্রথমেই যে বাড়ির নাম্বারটি চোখে পড়ল তা হচ্ছে, থ্রি জিরো ওয়ান। আর একটু এগিয়েই পেয়ে গেল থ্রি ওয়ান ওয়ান।

দাঁড়িয়ে পড়ল আহমদ মুসার গাড়ি।

জানালার কাঁচের ভেতর দিয়েই তাকাল আহমদ মুসা বাড়িটার দিকে।

বাড়িটা ওল্ড প্যাটার্নের একটা গেটবক্স।

গেট থেকে ইটের একটা রাস্তা গিয়ে মিশেছে গাড়িবারান্দায়।

গাড়িবারান্দা থেকে তিন ধাপ উঠলেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটা ল্যান্ডিং বা বারান্দা।

বারান্দার মাঝ বরাবর বাড়ির ভেতরে ঢোকার একটা দরজা।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল। চারদিকটা নিরব। সূর্য তখনও ওঠেনি।

রাস্তায় গাড়ি চলা শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু কচিৎ দু'একটা চোখে পড়ছে।

জ্যাকেটের পকেটের রিভলভার এবং মাথার পেছনের রিভলভারের শরীরটা একবার স্পর্শ করে আহমদ মুসা উঠে গেল গেটে।

গেট লক করা। গেটম্যান নিশ্চয় ঘুমিয়ে আছে।

বাউন্ডরি ওয়াল খুব উঁচু নয়। ছয় ফুটের বেশি হবে না।

চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে আহমদ মুসা চোখের পলকে পাঁচিল চপকে ভেতরে ঢুকে গেল।

গেটবক্সে এসে আহমদ মুসা দেখল, গেটবক্সের দরজা খোলা। উঁকি মারল ভেতরে। দেখল গেটম্যান একটা চেয়ারে বসেই বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। পাশেই টেবিলের উপর তালা-চাবি।

আহমদ মুসা তালা-চাবি নিয়ে গেটবক্স লক করল। চাবিটা তালাতেই লাগানো অবস্থায় রেখে দিল। বাড়ির দিকে এগোলো আহমদ মুসা। গাড়িবারান্দা হয়ে উঠে গেল ল্যান্ডিং-এ।

দরজার সামনে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো আহমদ মুসা। তারপর ডান হাতের মধ্যমা দিয়ে জোরের সাথে তিনবার নক করল সে।

মিনিট খানেক পার হয়ে গেল। কোন সাড়া নেই।

আবার নক করল আহমদ মুসা আগের চেয়ে আরও উচ্চ শব্দে।

তিন পর্যায়ে নয় বার নক করার পর দরজা খুলে গেল।

দরজা ফাঁক হলে প্রথমেই দেখা গেল রিভলভারের নল।

দরজা আরও খুলে গেলে দেখা গেল রিভলভার হতে দাঁড়ানো লোকটিকে।

তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের একজন মাসলম্যান। মেদহীন ঋজু শরীর। হাফপ্যান্টের সাথে টি-শার্ট পরা। চোখের দৃষ্টি সাপের মত তীক্ষ্ণ। গোটা মুখ বিরক্তিতে ভরা। বলল তীব্র কণ্ঠে, 'কে তুমি? আমার গেটম্যান কোথায়?'

আহমদ মুসা বুঝল কেউ আসলে গেটম্যানই তাকে ডাকে। ডাকারও নিশ্চয় নিয়ম রয়েছে। ব্যতিক্রম ঘটেছে সে নিয়মের। সম্ভবতঃ এই কারণেই রিভলভার নিয়ে তার আগমন।

‘আমি একজন মানুষ। নাম বললে অবশ্যই চিনবেন না। আর আপনার গেটম্যান ঘুমুচ্ছে, তাকে তালাবন্ধ করে এসেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

লোকটির রিভলভারের নল একটু উপরে উঠে আহমদ মুসার মাথাকে টার্গেট করল। বলল সে কর্কশ কণ্ঠে, ‘যে অপরাধ করেছ তুমি, তাতে আমি এখনি তোমার মাথা উড়িয়ে দিতে পারি।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘গুলি আপনি এখন করবেন না। গুলি করার সময় আপনার পার হয়ে গেছে। শুরুতেই তা করেননি। আসলে আপনি আমাকে জানতে চান।’

আহমদ মুসার নির্মল হাসি, নির্ভয় চোখ-মুখ দেখে লোকটি বিস্মিতই হয়েছিল। আর যে ক্রিমিনাল চেহারা লোকটি দেখতে অভ্যস্ত, সে রকম চেহারা আহমদ মুসার নয়।

লোকটির দৃষ্টি একটু সহজ হলো। বলল, ‘আমার গেটম্যানকে বন্ধ করেছ কেন?’

‘আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই। আমি চাই আর কেউ তা না শুনুক। আর গেটম্যান তার ঘুমানোর শাস্তি পেয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

লোকটির চোখে কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা বিরক্তি। বলল, ‘মনে হচ্ছে, গেটম্যান যেন তোমার?’

‘গেটম্যান আমার বা আপনার এ প্রশ্ন নয়, গেটম্যান যারই হোক সে দায়িত্বে অবহেলা করবে কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

লোকটির রিভলভারের নল নিচে নেমে গেল। বলল, ‘কী বলতে চান বলুন।’

‘এভাবে দরজার দু’পাশে দু’জন দাঁড়িয়ে কোন কথা হয়?’ আহমদ মুসা বলল।

লোকটি তাকাল একবার আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘কালকে সবে এ বাড়িতে উঠেছি। এখনও কিছুই গোছগাছ করা হয়নি। আসুন ভেতরে।’ আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকল।

শোবার ঘরটাই শুধু শোবার মত করে গোছ-গাছ করা হয়েছে। একটা বেড, তার পাশে বসবার জন্যে রয়েছে একটা সোফা।

লোকটি আহমদ মুসাকে সোফায় বসতে বলে নিজে বেডের উপর বসল পা ঝুলিয়ে।

তার হাতে তখনও রিভলভার।

লোকটি বসেই বলল, 'আপনার তো সাংঘাতিক দুঃসাহস! চিন্তা-ভাবনা না করেই ঢুকে পড়েছেন! আমি যদি গুলি করে বসতাম!'

'পারতেন না আপনি গুলি করতে। তার আগেই আমার গুলি আপনার কণ্ঠনালির পাশ দিয়ে ঢুকে মাথার চাঁদি দিয়ে বের হয়ে যেত।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু আপনি তো রিভলভার বেরই করেননি।' বলল লোকটি। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

'রিভলভার ছিল আমার জ্যাকেটের পকেটে। আমার ডান হাতের তর্জনি ছিল রিভলভারের ট্রিগারে। আর রিভলভারের নল ছিল আপনার থুতনি ও গলার সন্ধিক্ষণে। টার্গেট ঠিক করেই রেখেছিলাম।' বলল আহমদ মুসা। এরপর জ্যাকেটের ডান পকেট থেকে রিভলভার সমেত ডান হাতটা বের করে দেখাল আহমদ মুসা।

'বুঝলাম।' বলল লোকটি।

থামল একটু। বলল আবার সে, 'হ্যাঁ বলুন, কী বলতে চান।'

'গতকাল ভ্যান এয়ারপোর্টের ভিভিআইপি কার পার্কিং-এ যারা দু'জন লোককে বোমার সাহায্যে উড়িয়ে দিয়েছে, তাদের সম্পর্কে জানতে চাই।' বলল আহমদ মুসা সরাসরি লোকটির চোখের উপর চোখ রেখে।

চমকে উঠল লোকটি। চমকানো অবস্থাকে সে গোপনও করল না।

চমকানো অবস্থা ছিল তার মুহূর্তের জন্য। তারপরই তার চোখে ফুটে উঠল আগুন। তবে ধীরে ধীরে নিভে গেল সে আগুন। বলল সে, 'এ প্রশ্ন আমাকে কেন করছেন?'

'যে দু'জন বোমা বিস্ফোরণে মারা গেছে, তাদেরই একজন আমাদের এটা জানিয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝলাম না আমি কথাটা!’ বলল লোকটা। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

‘তারা যে গাড়িতে যান, যে গাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাদের দেহ বিস্ফোরিত হয়, সে গাড়িতে পাওয়া একটা সিগারেটের প্যাকেট থেকে আপনার এই ঠিকানাটা পাওয়া গেছে। ঠিকানাটা গতকালই গাড়ি চলন্ত অবস্থাতেই লেখা হয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

সংগে সংগে জবাব দিল না লোকটা। তার স্থির দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। সে যেন আহমদ মুসার কথার সত্যাসত্য যাটাই করছে।

ইতিমধ্যে আহমদ মুসা পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটি বের করে লেখাটা লোকটার সামনে তুলে ধরল।

লেখাটার উপর একবার চোখ বুলিয়েই লোকটা বলল, ‘আপনি তো ঠিকানা ভুল করেছেন। যাবেন ‘১৩১’ নাম্বারে, এসেছেন ‘৩১১’ নাম্বার বাড়িতে।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘লেখক প্রকৃত নাম্বারের প্রথম ডিজিটাল জোড়াকে এখানে উল্টে লিখেছেন। ‘৩১’ কে ‘১৩’ বানানো হয়েছে।’

বিস্ময়ে ছেয়ে গেল লোকটার মুখ। বলল, ‘লেখক যেটা লিখেছেন, সেটাই ঠিক হবার কথা। আপনি কি করে বলতে পারেন, প্রথম ডিজিটাল জোড়া তিনি উল্টিয়ে লিখেছেন?’

একটু হেসে উঠেই আহমদ মুসা আবার সিগারেটের প্যাকেটের টেলিফোন নাম্বারটা তার সামনে তুলে ধরে বলল, ‘দেখুন, এখানে টেলিফোনের নাম্বারসহ মোট পাঁচটি জোড়ার প্রত্যেকটির দুইটি করে জোড়া আগে-পিছে করা হয়েছে। বাড়ির নাম্বারের ক্ষেত্রেও এটাই করা হয়েছে।’

বিস্ময়ে হা হয়ে গেল লোকটির মুখ।

‘অসম্ভব ব্যাপার, কি করে বুঝলেন বিষয়টি? এটা আমাদের নিজস্ব একটা রীতি। এ পর্যন্ত কেউ এ ধাঁধাঁ ভাঙতে পারেনি।’

‘এ বিষয়টা থাক। আমি ভাঙতে পেরেছি এটাই সত্য। এখন আপনি দয়া করে বলুন লোক দু’জনকে যারা খুন করেছে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, তারা কারা?’ আহমদ মুসা বলল।

‘কি করে বুঝলেন যে, তারা এবং আমরা এক? তাদের সন্ধান আমরা আপনাকে কি করে দেব?’ বলল লোকটি।

‘নিজেদের লোককে গায়ে বোমা বেঁধে দিয়ে রিমোট কন্ট্রোল নিজেদের হাতে রেখে কেউ কখনো মিশনে পাঠায় না। এটা বিশ্বাসঘাতকতা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কেন, আজকাল অনেক সুইসাইড স্কোয়াড পাঠানো হয় দেখা যাচ্ছে। তারা কি তাদের নিজেদের লোক নয়?’ বলল লোকটি।

‘সুইসাইড স্কোয়াডের লোকরা মটিভেটেড হওয়ার পর স্বেচ্ছায় সুইসাইড স্কোয়াডে যায় এবং এক বিশেষ মুহূর্তে স্বেচ্ছায় বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মৃত্যুবরণ করে। তাদের বোমার রিমোট কন্ট্রোল বাইরের কারও হাতে থাকে না। নিজের লোক বলেই বোমা ফাটানো, না ফাটানোর এখতিয়ার তাদের হাতেই রাখা হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

লোকটির চোখ-মুখে এবার প্রতিশোধের আগুন। বলল সে, ‘আপনি ঠিক বলেছেন, তারা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু বলুন তো আপনি কে? আপনি এসব কেন জানতে চাচ্ছেন?’

‘আমি যেই হই না কেন, আমি পুলিশের লোক নই। আমি গোয়েন্দা বিভাগ কিংবা সেনাবাহীনির লোকও নই। আমি মানুষকে সাহায্য করি। এটা আমার একটা ব্রত। তারা যেমন আপনাদের দু’জন লোককে হত্যা করছে, তেমনি তাদের কারণে আমার এক বোন গাতকাল মারা গেছে। আমি চাই তাদের শাস্তি হোক।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু তারা আমাদের শিকার। আমরাই তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করব। আপনার এ ব্যপারে মাথা না ঘামালেও চলবে।’ বলল লোকটি।

তাই যদি হতো, তাহলে কষ্ট করে আসতাম না। আপনারা ওদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করেছেন, এটা আমরা জানতে পারতাম। আর আপনাদের একার পক্ষে ওদের উৎখাত করা সম্ভব নয়। কয়েকজন লোক মারলে ওরা শেষ হয়ে যাবে না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু ওদের কোন সুনির্দিষ্ট ঠিকানা আমাদের জানা নেই। ওদের কয়েক ব্যক্তির সাথে মাত্র আমরা পরিচিত।’ লোকটি বলল।

‘ওদের সাথে দেখা সাক্ষাত, যোগাযোগ কিভাবে হতো?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওরা কোন সময় ওদের ঠিকানা নিয়ে যায়নি, কিংবা ঠিকানা দেয়নি। নানা জায়গায় ওদের সাথে দেখা হতো, বিশষ করে মাউন্ট আরারাতের দক্ষিণ-পশ্চিম ঢালের ট্যুরিস্ট ক্যাম্প নাম্বার ওয়ানে পর্যটনের যে রেস্টুরেন্ট রয়েছে, সেখানেই ওদের সাথে বেশি দেখা হতো।’ বলল লোকটি।

‘ওদের চিনতেন কিভাবে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘ওরা মোবাইলে যোগাযোগ করত।’ বলল লোকটি।

‘ওদের কোন মোবাইল নাম্বার আছে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওরাই মোবাইলে যোগাযোগ করত। তারা তাদের মোবাইল নাম্বার কখনও দেয় না। আমাদের একটা মোবাইল নাম্বার ওদের কাছে ছিল। ও নাম্বারেই ওরা যোগাযোগ করত। ওদের নাম্বার মোবাইল ডিসপ্লেতে থাকে না।’ বলল লোকটি। ‘ভীষণ চালাক ওরা। সব কাজে সব ব্যাপারেই নিজেদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রাখে ওরা। এ পর্যন্ত ওদের ঠিকানাই পাওয়া যায়নি, কোন নেতার পরিচয়ও জানা যায়নি। এইমাত্র আপনি বললেন, আপনারাও প্রতিশোধ নিতে চান কিন্তু দেখছি, আপনারাও ওদের সম্পর্কে কিছুই জানেন না।’

‘আজ জানি না, কাল জানতে পারব। অসম্ভব নয় জানা। ওদের তো লক্ষ্য মাউন্ট আরারাতের স্বর্ণভাণ্ডার লুট করা এবং পূর্ব আনাতোলিয়া অঞ্চলের প্রশাসনকে কব্জা করা। সুতরাং তারা কাজ করছে, ওদের খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।’ বলল লোকটি।

‘মাউন্ট আরারাতের স্বর্ণভাণ্ডার লুটের কথা বুঝলাম। ওদের বিশ্বাস হযরত নুহ (আঃ)-এর কিস্তিতে যে স্বর্ণভাণ্ডার উঠেছিল, তা এখন মাউন্ট আরারাতের একটা গুহায় লুকানো আছে। সেটা হাত করার গোপন তৎপরতা চলতেই পারে। কিন্তু পূর্ব আনাতোলিয়ার প্রশাসনকে তারা কব্জা করবে কেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘সেটা আমি জানি না স্যার। ওদের অস্ত্রপাতি, অর্থ ও যোগাযোগ দেখে মনে হয় দেশের বাইরের সাথেও ওদের যোগাযোগ আছে। অবশ্য এটা আমার ধারণা।’ লোকটি বলল।

‘আপনাদেরও যোগাযোগ বাইরের সাথে আছে। আপনাদের লোকরা হিব্রু ভাষা শিখল কি করে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, ‘আমাদের সংগঠনটা আন্তর্জাতিক। সেই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগুলো আমাদের শিখতে হয়। হিব্রু একটাআ গুরুত্বপূর্ণ ভাষা, অন্তঃত আন্ডার ওয়ার্ল্ডের জন্যে। তবে আমাদের সম্পর্ক টাকার সাথে। কোন দেশের রাজনীতির সাথে আমাদের কোন যোগ নেই।’

‘টাকার বিনিময়ে আমাদেরকেও সাহায্য করুন তাহলে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তী সাহায্য?’ জিজ্ঞাসা লোকটির।

‘ওরা পূর্ব আনাতোলিয়ার প্রশাসনকে কব্জায় আনতে চাচ্ছে কেন? তাদের লক্ষ্য কী? এসব তথ্য আমাদের সংগ্রহ করে দিন। শুধুই খুনের কাজ করেন, নাকি সব কিছু? কিন্তু সবখানেই তো রাজনীতি আছে। ওরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যেই আমাকে খুন করতে আপনাদের নিয়োগ করেছিল। আমি বেঁচে গেছি, কিন্তু আরেকটি মেয়ে জীবন দিয়েছে আমাকে বাঁচানোর জন্যে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমরা আগে জানলে আপনাকে খুন করার এই কাজটা অবশ্যই নিতাম না।’ লোকটি বলল।

‘আপনি যে দেশের মানুষ, সে দেশের রাজনৈতিক স্বার্থ আপনি দেখবেন না?’ বলল আহমদ মুসা।

‘দেশ আমার স্বার্থ দেখেনি। আমি দ্বারে-দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছি, চাকুরী পাই নি। তারপর বিচারক অন্যের দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে আমাকে জেলে পাঠিয়েছে। বাধ্য হয়েই কিলার গ্রুপে নাম লিখিয়েছি।’ লোকটি বলল।

‘বিচারক যেমন অন্যের দায় আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে আপনাকে জেলে পাঠিয়েছে এবং যারা আপনাকে চাকুরী দেয়নি এমন কিছু লোকের দায় আপনিও তো অন্যায়ভাবে অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারেন না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার কথা ঠিক। কিন্তু একজন বিচারক অন্যায়কে ন্যায় বলে রায় দিয়েছে, তাই আমিও এটাই ন্যায় হিসেবে গ্রহণ করেছি।’

বলে একটু থামল লোকটি। একটু ভেবে বলল, ‘তবে প্রয়োজন হলে আমি আপনাকে সাহায্য করবো।’

‘আমাকে কেন, দেশকে সাহায্য করবেন না?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘কারণ, আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। বন্দুকধারী কাউকে আমি কখনো এমন সুন্দর ব্যবহার করতে দেখিনি।’ বলল লোকটি।

‘ধন্যবাদ। কী সাহায্য করবেন, কিভাবে সাহায্য করবেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘সেটা আমি ঠিক করব। আমার দুই কলিগের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ আপনি নিতে পারলেও আমি খুশি হবো। তবে তার আগেই আমি চেষ্টা করবো তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে।’

‘ধন্যবাদ, তাতে আমাদেরও লাভ হবে।’

বলে একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘তাহলে এখন তো কথা আর নেই। সাহায্যের প্রতিশ্রুতির জন্যে ধন্যবাদ। আবার করে দেখা হবে?’

‘আমি নামায পড়ি না। কিন্তু আমি অদৃষ্টবাদী। ভাগ্য যখন আমাদের আবার দেখা করাবে, তখন দেখা হবে।’ বলল লোকটি।

বিমর্ষতা নেমে এল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। বলল, ‘দেশ না হয় দোষ করেছে, কিন্তু আল্লাহ্’র আদেশ মানবেন না কেন?’

‘আল্লাহ্ আমাকে কিলার বানিয়েছেন, আমি তো কিলার হতে চাইনি। আর কিলার হওয়ার পর আর নামায পড়ার সুযোগ থাকে না।’ লোকটি বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আল্লাহ্ আপনাকে কিলার বানাবেন কেন? চাকুরী না পেয়ে বিনা অপরাধে অন্যায়ভাবে বিচারক আপনাকে জেলে পাঠানোর

ফলে আপনি যে সংকটে পড়েছিলেন, সে সংকটের সুযোগ নিয়ে শয়তান আপনাকে কিলার বানিয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সংকট থেকে আল্লাহ আমাকে বাঁচাননি কেন?’ বলল লোকটি।

‘আপনার মধ্যে ধৈর্য্যের অভাব, তাই। সে কারণেই সংকট আপনাকে কাবু করে ফেলেছিল এবং তার ফলে শয়তানের জন্যে পথ উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্ কুরআন শরীফে বলেছেন, ‘কষ্টের পাশেই কষ্টের উপশম থাকে।’ আল্লাহ্’র এই ওয়াদার উপর বিশ্বাস করে ধৈর্য্য ধারলে কষ্টের উপশম জীবন্ত রূপ নিয়ে মানুষের সামনে আসে। আপনি উপশমকে কাছে আসার সে সুযোগ দেননি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সব কষ্টেরই উপশম হয় ধৈর্য্য ধরলে?’ বলল লোকটি।

‘বিশ্ব চরাচরের মালিক ও স্রষ্টা আল্লাহ্ বলেছেন, কষ্টের সাথেই উপশম। তাই কষ্টের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরতে পারলে উপশম আসাটাই স্বাভাবিক। তবে ‘স্বাভাবিক’ শব্দের বিপরীতে ‘অ-স্বাভাবিক’ বা ‘ব্যতিক্রম’ শব্দ যখন রয়েছে, তখন ব্যতিক্রমী বিষয় হিসেবে কষ্টের উপশম কখনও কোন ক্ষেত্রে নাও আসতে পারে। কিন্তু এটা ধরার বিষয় অবশ্যই নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ আপনাকে। বিষয়টাকে এমনভাবে দেখার সুযোগ হয়নি, সামর্থ্যও বোধ হয় ছিল না। কিন্তু যা ঘটার, যা হবার, তা তো ঘটেই গেছে। এখন এই সব আলোচনার কোন অর্থ নেই।’ বলল লোকটি।

‘অর্থ অবশ্যই আছে। কিলার হওয়াই শেষ কথা নয়, কিলার হওয়া কারো শেষ পরিচয়ও নয়। কিলার হওয়ার পর নামায পড়ার সুযোগ নেই, একথা ঠিক। তবে নামায সব পাপের কালো দাগ মুছে ফেলতে পারে। পাপের জীবন থেকে ফিরে আসার তওবা মানুষের পাপের ক্লেশক্লিষ্ট জীবনকে পবিত্র করে তুলতে পারে।’

আশার একটা চাপা ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠল লোকটির চোখে-মুখে। বলল, ‘ধন্যবাদ। আপনি খুব ভালো লোক। ভালো লোকরা মানুষের মনে হতাশার বদলে আশার উজ্জীবন ঘটায়। এমন ভালো লোকদের অবিশ্বাস করা চলে না। ঠিক আছে আবার দেখা হবে।’ বলল লোকটি।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আপনার নাম জিজ্ঞেস করা কি ঠিক হবে?'

এতক্ষণে হাসল লোকটা। বলল, 'আপনি আইনজীবী হলে বোধ হয় বেশি ভালো করতেন। আপনি কেমন বন্দুক চালান জানি না। কিন্তু কথা আপনার দারুন লক্ষভেদি। যাক, আমার নাম মেন্দারিস মালিক। ডবল এম। আপনার নাম কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করলাম না।'

'যাকে হত্যার জন্যে আপনাদের দু'জন লোককে নিয়োগ করা হয়েছিল, আমি সেই আবু আহমদ।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ, আবার দেখা হবে।' বলে হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল মেন্দারিস মালিক।

'আস্-সালামু আলাইকুম।' বলে লোকটির সাথে হ্যান্ডশেক করল আহমদ মুসা।

'আসি।' বলে আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরুবার জন্যে পা বাড়াল।

সাথে সাথে হাঁটতে লাগল মেন্দারিস মালিকও।

মেন্দারিস মালিক গাড়ি পর্যন্ত এসে আহমদ মুসাকে বিদায় জানাল।

মাউন্ট আরারাতের গোড়ায় টুরিস্ট বেজক্যাম্প নাম্বার ওয়ানে পর্যটন রেস্টুরেন্টে আহমদ মুসা বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে আর চোখ দু'টি নিবদ্ধ রেখেছে পাশেই মেলে রাখা পত্রিকায়।

কিন্তু পত্রিকার এক বর্ণও সে পড়ছে না। মনে তার ভিন্নরকম চিন্তার ঝড়।

ভ্যান-এর পুলিশ প্রধান ডিজিপি মাহির হারুন গত কয়েকদিন থেকে গোটা পূর্ব আনাতোলিয়া অঞ্চলের রিপোর্ট গোয়েন্দাদের মাধ্যমে তার কাছে পাঠাচ্ছে। এই ব্যবস্থা করা হয়েছে আংকারার প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে।

গোয়েন্দা রিপোর্টে অস্বাভাবিক কিছু দেখছে না আহমদ মুসা। উল্কিওয়ালাদের সুপারিশে তাদের বশংবদ হিসাবে ইজদির প্রদেশ ও আশে-

পাশের কিছু অঞ্চলে যেসব সেনা অফিসার নিয়োগ পেয়েছিল তার তৎপরতার রিপোর্টও আসছিল আহমদ মুসার কাছে। তাদের তৎপরতায় অস্বাভাবিক কিছু নেই। তবে সব ব্যপারেই একটু বেশি সতর্ক মনে হয়।

তাদের চলাফেরায় ফ্রী-নেসটা আগের মত নেই। অন্যদিকে গোয়েন্দারা বড় কোন অস্বাভাবিক তৎপরতার খবর দিতে না পারলেও রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে মাউন্ট আরারাতের সেসব ক্যাম্পগুলোতে ভিজিটরের সংখ্যা বেড়েছে। আর গোটা ইজদির ও সন্নিহিত অঞ্চলে হঠাৎ করেই ফেরিওয়ালা, হোম সার্ভিস কোম্পানীর লোকজন ও খ্রীস্টান ধর্মগুরুদের আনা-গোনা বেড়েছে। গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুসারে আনা-গোনার ফ্রিকোয়েন্সি আগের তুলনায় তিনগুণ বেড়েছে। এসব তথ্য থেকে আহমদ মুসার মনে হচ্ছে এগুলো সবই গণসংযোগের কৌশল। কেন এই গণসংযোগ, তার জবাব আহমদ মুসার কাছে নেই। তবে এটা নিশ্চিত যে, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এবং সেটা বড় কিছু। মেন্দারিস মালিক বলেছে, ওরা এ অঞ্চলটা গ্রাস করতে চায়। কিন্তু সেটা কিভাবে? কোন একটা গ্রুপ কি এট পারে!

এসব চিন্তা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল আহমদ মুসাকে। শেষ দিকে কফি খেতে ভুলে গেছে সে।

কিন্তু তার আচ্ছন্ন ভাব ছিন্ন হয়ে গেল পাশের টেবিলের দু'টি চেয়ার টানার কর্কশ শব্দে।

আহমদ মুসা তাকিয়ে দেখল, দু'জন যুবক এসে বসেছে পাশের টেবিলে। দু'জনের চেহারাই অদ্ভুত প্রকৃতির। তাদের চোখে-মুখে অপরাধের চিহ্ন। পরনেও তাদের কালো জিন্স ও কালো গেঞ্জি।

টেবিলে বসেই ভদকা ও কাবাব-রুটির অর্ডার দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ভদকা, কাবাব-রুটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবং কথার ফুলঝুরি ছুটল তাদের মুখে।

একজন বলল, 'খেয়ে নাও, খেয়ে নাও আমাদের দুঃখের দিন শেষ। অঢেল টাকা নয়, অঢেল সোনা আসবে আমাদের ঘরে।'

আহমদ মুসা সত্যিই পত্রিকা পড়া শুরু করেছিল। কিন্তু লোকটির এই কথাগুলো কানে যেতেই তার কান খাড়া হয়ে উঠল। অঢেল সোনা? কোত্থেকে? রহস্যের গন্ধ পেল আহমদ মুসা। আরেক কাপ কফির অর্ডার দিল সে।

পাশের টেবিলের প্রথম লোকটির খাওয়া শেষ হতেই দ্বিতীয় লোকটি বলে উঠল, 'পূর্ণিমার সেই রাতটা কত দূরে, কয়দিন বাকি? সেদিন মাউন্ট আরারাতের সেই গোপন গুহার বহু শতাব্দীর গোপন মুখটা খুলে যাবে। বেরিয়ে আসবে স্বর্ণের ভাণ্ডার। ভাবতে অবশ্যই অবাক লাগছে। আসবে তো জুনের সেই পূর্ণিমার রাত? পাওয়া যাবে তো সেই গুহা? আছে তো সেখানে সেই স্বর্ণভাণ্ডার? বল ব্রাদার বল।'

'এসব ফালতু চিন্তা বাদ দাও। এবার কোন ভুল হয়নি। আমি মি. ভারদার বুরাগের কাছে বিস্তারিত শুনেছি। খ্রীস্টপূর্ব ৫শ বছর আগের মিহরান মাসিসের আঁকা মাউন্ট আরারাতের সেই মানচিত্র এখন আমাদের হাতে। আজকের মত সেই সময়ের এক ভীষণ তপ্ত জুনে, যখন মাউন্ট আরারাতের হাজার ফিট পর্যন্ত বরফ গলে গিয়ে নুহের কিস্তি ও সব গুহার গোটা অবয়ব নগ্ন হয়ে পড়েছিল। সেই সময় আঁকা মাসিসের মানচিত্রটি। সেই মানচিত্র সামনে রেখে অত্যাধুনিক এ্যান্টি আইস ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবি থেকে নিখুঁতভাবে স্বর্ণভাণ্ডারের গর্তটি চিহ্নিত করা হয়েছে। আর 'গোল্ড সেনসেটিভ বিম ট্রান্সমিটার' থেকে 'রে' ফেলে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, অঢেল স্বর্ণের ভাণ্ডার সেখানে রয়েছে।' বলল প্রথম লোকটি।

দ্বিতীয় লোকটি তার হাতের মদের গ্লাস টেবিলে রেখে হাত বাড়িয়ে প্রথম লোকটির সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'সোরেন, তোকে ধন্যবাদ। এত বড় একটা খবর তুই দিতে পারলি সেজন্য আমার ভাগ থেকে একটা অংশ স্বর্ণ তোকে বেশি দেব। কিন্তু আমরা নিরাপদে কাজটা করতে পারবো তো? শালার আর্মি বেটারা তো সারাক্ষণ চোখ রেখেছে পাহাড়টার উপর।'

সোরেন লোকটা তার হাতের আধা গ্লাস ভদকা গোটাটাই গলায় ঢেলে দিয়ে গ্লাসটা সশব্দে টেবিলে রেখে বলল, 'আরে, এসব নিয়ে ভাবিস না। সব ব্যবস্থা পাকা-পোক্ত হয়েছে। আমরা যখন কাজ করব, তখন আর্মি স্বয়ং আমাদের পাহারায় থাকবে, আমাদের সাহায্য করবে।'

‘ফুলমুনটা আসতে আর কয়দিন বাতি, সোরেন? চাঁদের কয় তারিখ আজ? শালা দিন তো যাচ্ছে না।’ বলল আরেক নামের দ্বিতীয় লোকটা।

‘ফুলমুন যেদিন আসার সেদিনই আসবে। শালা আবার চাঁদের সহজ হিসাবটা ভুলে গেল।’ বলল সোরেন।

‘শালা, দুনিয়া ভোলার অবস্থা এখন, দিনের হিসাব দূরে থাক।’ আরেক নামের লোকটা বলল।

‘দুনিয়া ভুলে গেলেও সুন্দরী পার্টনারকে ভুলিস না।’ বলল সোরেন।

আরও একটা অশ্লীল কথা বলল।

ওদের আলোচনা অশ্রাব্য অশ্লীলতার দিকে টার্ন নিল।

আহমদ মুসার মুখ তখন অপার খুশিতো উজ্জ্বল। উল্কিওয়ালাদের দু’জনের সাক্ষাতই শুধু নয়, ওদের একটা বড় প্রোগ্রামেরও সন্ধান পাওয়া গেল এদের মাধ্যমে। আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিল, ওদের ফলো করতে হবে। জানতে হবে ওদের ঠিকানা।

এক সময় ওরা উঠল। বেরিয়ে গেল ওরা রেস্টুরেন্ট থেকে।

আহমদ মুসাও উঠল।

ওরা বেরিয়ে বেরিয়ে যাবার পর আহমদ মুসাও বেরুল রেস্টুরেন্ট থেকে।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়েই আহমদ মুসা দেখল, ওরা দু’জন একটা লাল গাড়িতে উঠছে।

ওদের গাড়ি স্টার্ট নিল। রেস্টুরেন্টের কারপার্ক-লনটি অতিক্রম করে গাড়িটা রাস্তার দিকে এগোলো।

আহমদ মুসার গাড়িটিও স্টার্ট নিয়ে ছুটল গাড়িটার পেছনে।

রেস্টুরেন্টের বাইরের গেটের গেটম্যান আহমদ মুসার গাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। আহমদ মুসার গাড়িটা যখন গেট অতিক্রম করছিল, তখন গেটম্যান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসার দৃষ্টি যে সামনের মোড়ে একটা রাস্তার বাঁকে আড়াল হতে থাকা লাল গাড়িটার দিকে নিবদ্ধ ছিল, সেটাও গেটম্যান তার দু’চোখ খুলে দেখার ও বুঝার চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসার গাড়ি সামনের রাস্তার মোড়ে লাল গাড়িটার পথ ধরে চোখের আড়ালে চলে যাবার আগ পর্যন্ত গেটম্যান সেদিকে তাকিয়েছিল।

গেটম্যানের এই বাড়তি আগ্রহের কারণ কি, তা আহমদ মুসার জানার সুযোগ হলো না। আহমদ মুসার নজর সে সময় লাল গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে গেটম্যানের সন্ধানী চোখের দৃষ্টি তার চোখ এড়াত না।

আহমদ মুসার লক্ষ্য লাল গাড়ির ঐ দুই যুবককে অনুসরণ করে ওদের ঠিকানা জেনে নেয়া। তাই আহমদ মুসা তার গাড়ির স্পীড় লাল গাড়িটার সমান রেখে সমান দূরত্বে থেকে ওদের অনুসরণ করে চলছে। অবশ্য মাঝে মাঝে গাড়ির গতির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। লাল গাড়ি চলছিল মাউন্ট আরারাতের উত্তরে পাহাড় পেরিয়ে। গাড়ি এগিয়ে চলছে এঁকে-বেঁকে সামনের দিকে। মাঝে মাঝেই সামনের লাল গাড়িটা হারিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের আড়ালে। আহমদ মুসাকে তাই সামনের লাল গাড়িটাকে অনেক বেশি কাছ থেকে অনুসরণ করতে হচ্ছে। তবে পথের পার্বত্য অবস্থা সামনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। আধা মাইলের মধ্যে একটা মোড় পাওয়া যাবে। পাহাড়ের পরেই এই মোড়টা। এটা রোড জংশনও। দক্ষিণের ভ্যান, দক্ষিণ-পশ্চিমের আগ্রি, উত্তর-পশ্চিমের কারস এবং উত্তরের ইজদির অঞ্চল থেকে আসা রাস্তা। সব এখানে এসে মিশেছে। আর অরিয়াস অঞ্চল থেকে আসা রাস্তা। সব এখানে এসে মিশেছে। আর অরিয়াস অঞ্চল থেকে যে রাস্তা এখানে এসে মিশেছে, সে রাস্তা দিয়ে তো আহমদ মুসারাই যাচ্ছে। একটা বিষয় ভেবে আহমদ মুসা খুশি হলো যে, লাল গাড়িটা যদি তার গাড়িকে খেয়াল করেও থাকে, পার্বত্য পথে ঢোকার পর তার গাড়ির কথা লাল গাড়িটা ভুলে যাবার কথা। এটাই যদি হয় তাহলে রোড জংশনের পর লাল গাড়িটাকে ফলো করা অনেকখানি সহজ হবে। আর যদি তার গাড়িটাকে লাল গাড়ি মনে রেখে থাকে, তাহলে জংশনের পর সমভূমির রাস্তায় লাল গাড়িকে অনুসরণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

আহমদ মুসার গাড়ি শেষ পাহাড়টার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছে। মিনিট খানেকের মধ্যেই বেরিয়ে যাবে পাহাড়ের ছায়া থেকে।

সামনেই মোড়। মাত্র দু’শ-আড়াই’শ গজ দূরে।

আহমদ মুসা দেখল লাল গাড়িটা রোড জংশনটা পেরিয়ে কারসমুখী রাস্তায় ঢুকে গেল।

আহমদ মুসার গাড়ি রোড জংশনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এ সময় আহমদ মুসা দেখল বামে 'ভ্যান'-এর দিক থেকে এবং ডানে ইজদির দিক থেকে দুটো গাড়ি তীব্র গতিতে ছুটে আসছে রোড জংশনের দিকে।

রোড জংশনে প্রবেশ করেছে আহমদ মুসার গাড়ি। তার সামনে পড়তেই দেখতে পেল কারসের রাস্তায় প্রবেশ করে সেই লাল গাড়িটা এ্যাবাউট টার্ন করে এদিকে ফিরে আসতে শুরু করেছে।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। আঘাতে ঘুমভাঙা বাঘের মত গোটা স্নায়ুতন্ত্রী এ সাথে জেগে উঠল। আহমদ মুসার মুখ থেকে আপনাতেই অস্ফুটে বেরিয়ে এল, 'ওরা আমাকে ট্র্যাপে ফেলেছে।' পেছনে গাড়ির শব্দ পেল আহমদ মুসা। তাকিয়ে দেখল, আরেকটা মাইক্রো পেছন দিক থেকে ছুটে আসছে। ওদের ট্র্যাপটা এবার সম্পুর্ণ হলো।

একটু ভাবল আহমদ মুসা। বিস্মিত হলো সে, এই আয়োজন ওরা কখন করল, কিভাবে করল? হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল, মাউন্ট আরারাতের রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুবার জন্যে যখন গেটে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, তখন তার দিকে চেয়ে থাকা গেটম্যানের দৃষ্টি অস্বস্তিকর লেগেছিল। তার হাতে একটা মোবাইলও ছিল। কিন্তু আহমদ মুসার চোখ লাল গাড়িটার পেছনে ছিল বলে গেটম্যানকে নিয়ে চিন্তা করার সে সময় পায়নি।

রোড জংশনের সার্কেলে প্রবেশ করে ডান বা বাম কোন দিকে টার্ন না নিয়ে গাড়ির ব্রেক কসেছে আহমদ মুসা। তার গাড়ির সামনে সার্কেলের দুই ফুট উঁচু আইল্যান্ড।

ট্র্যাপ থেকে বের হওয়া বা মোকাবিলা করার নানান কৌশল মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে আহমদ মুসার।

ডান বা বাম দিকের মাইক্রোকে ওভারটেক করে ডান বা বামের রাস্তায় যাবার সে চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে মাইক্রোর পাশ ঘেঁষে তাকে যেতে হবে। সে ক্ষেত্রে খুব কাছ থেকে মাইক্রোর গুলিবৃষ্টির মুখে সে পড়বে। এক হাতে

ড্রাইভ করে অন্য হাতে গুলি চালিয়ে মোকাবিলা করা যাবে না। তাছাড়া বাম বা ডান যে দিক থেকেই সে বেরুবার চেষ্টা করুক, মাইক্রোকে সাহায্য করার জন্যে লাল গাড়িটা ছুটে আসবে। তার উপর আরেকটা বিপদও আছে। সেক্ষেত্রে সে পেছন থেকেও আক্রমণের শিকার হবে। এজন্যে পেছনের মাইক্রো তো আছেই। তার উপর যেদিকে সে যাবে, তার বিপরীত পাশের মাইক্রোও তার পিছু নেবে। সব দিক থেকে চিড়েচ্যাপ্টা হওয়ার দশায় পড়বে।

এই অবস্থায় আহমদ মুসা আল্লাহ্’র উপর ভরসা করে আইল্যান্ডকে সামনে রেখে ওদেরকে প্রথমে আক্রমণে এনে আত্মরক্ষা ও আক্রমণের একটা কৌশল ঠিক করল।

আহমদ মুসার গাড়িটাও তার আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র হবে। কারণ এ গাড়িটা সেমি বুলেট প্রুপ। গুলিবৃষ্টির মুখে তার গাড়ির সব কাঁচই ভেঙে যাবে, কিন্তু গাড়ির বডিকে কোন বুলেটই অতিক্রম করতে পারবে না। ভ্যান- এর পুলিশ প্রধান মাহির হারুন তাদের শ্রেষ্ঠ গাড়িটাই তাকে ব্যবহার করতে দিয়েছে।

আহমদ মুসা তার পকেট থেকে মেশিন রিভলভারটা বের করে পাশে রাখল। দু’পাশ থেকে তার দিকে ছুটে আসা গাড়িগুলোকে থামিয়ে দেয়ার জন্যে এ রিভলভার নয়, পয়েন্টেড গুলির জন্যে ভিন্ন রিভলভার দরকার। আহমদ মুসা তার মাথার পেছনে ঘাড়ের জ্যাকেটে রাখা মিনি রিভলভার হাতে নিল। এ রিভলভারের মিনি বুলেটে একটি করে পাওয়ারফুল বিস্ফোরক থাকে। এ রিভলভারই সে প্রথম ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার আত্মরক্ষা ও আক্রমণের কৌশল কাজে লাগাবার জন্যে।

আইল্যান্ডকে সামনে রেখে গাড়ি ব্রেক কারার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আহমদ মুসার এই কৌশল-চিন্তা ও প্রস্তুতির কাজ শেষ হয়ে গেল।

আহমদ মুসার গাড়ি দাঁড়াবার পর মুহূর্তকাল দ্বিধা করেছে মাইক্রো দু’টো, তারপ দ্রুত ছুটে আসতে লাগল আহমদ মুসার গাড়ির দিকে। দু’দিক থেকে এসে মাইক্রো দু’টি আহমদ মুসার গাড়িকে স্যান্ডউইচ বানাতে চায়, এ রকমই একটা ভাব গাড়ি দু’টির গতিতে।

দু'টি গাড়িকেই আহমদ মুসা দেখতে পাচ্ছে। তার রিভলভার প্রস্তুত। ট্রিগারে তর্জনি। দুই মাইক্রোকে থামাতে হলে তাকে দু'টি গুলিই করতে হবে মুহূর্তের ব্যবধানে।

বাম দিকের মাইক্রোর মাথাটাই প্রথম আইল্যান্ড থেকে বেরিয়ে এল। আহমদ মুসার চোখ গিয়ে পড়ল মাইক্রোর সামনের বাম চাকাটার উপর। এই চাকাই তার টার্গেট। এই চাকা ভেঙে পড়লে গাড়িটা নির্ঘাত আইল্যান্ডের সাথে ধাক্কা খাবে। চাকাটা দেখার সাথে সাথে তার তর্জনি চেপে বসল রিভলভারের ট্রিগারে। পরক্ষণেই মাইক্রোটার সামনের বাম চাকা বিস্ফোরিত হলো প্রচন্ড শব্দে। মাইক্রোটা কিছুটা কাত হয়ে বামে বেঁকে গিয়ে আঘাত করল আইল্যান্ডকে।

আহমদ মুসা গুলি করেই হাতের রিভলভার ঘুরিয়ে নিয়ে টার্গেট করল ডান দিকের মাইক্রোকে।

মাইক্রোটা সম্পূর্ণটাই আইল্যান্ডের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

আহমদ মুসার রিভলভারের গুলি আগের মতই এ মাইক্রোর সামনের ডান চাকায় আঘাত করল। চাকা বিস্ফোরিত হবার সাথে সাথেই দ্রুত গাড়ির মাথাটা ডান দিকে বেঁকে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল আইল্যান্ডের দেয়ালে।

আইল্যান্ডে ধাক্কা খাওয়া গাড়ি থেকে নামতে ওদের দেরি হবে। এই সুযোগে গাড়ি চালিয়ে ওদের পাশ কাটিয়ে ওদের ট্রাপ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চিন্তা করল আহমদ মুসা।

দুই হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি স্টার্ট দিতে যাবে, এসময় পেছরে আছে। দুই মাইক্রোর অবস্থা দেখেই সম্ভবত পেছনের গাড়িটা গুলি করতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট করল।

পেছনের গুলিবৃষ্টির মধ্যে দিয়েই তাকে এখনি এই ট্র্যাপ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। দুই মাইক্রো থেকে ওরা বেরিয়ে এলে তাকে ত্রিমুখি গুলিবৃষ্টির মুখে পড়তে হবে।

কিন্তু সময় পেল না আহমদ মুসা। গাড়ি ঘুরিয়ে নেবার আগেই সে দেখল গুলিবৃষ্টিসহ পেছনের মাইক্রোটি তীব্র বেগে এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

মাইক্রোটির আঘাত এড়িয়ে কোন দিকে গাড়িটা সরিয়ে নেবার সুযোগ নেই তার। ডান ও বাম পাশে দু'টি গাড়ি আইল্যান্ডে ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের এড়িয়ে পথ করে নিতে হলে তার যতটা সময় ও সুযোগ দরকার, সেটা পেছনের মাইক্রো অসম্ভব করে দিয়েছে। মাইক্রোটি তার গাড়ির উপর এসে পড়ল। ওরা আজ যেভাবে হোক আহমদ মুসাকে শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোঝা যাচ্ছে।

গাড়ি থেকে তার নেমে যাবারও কোন উপায় নেই। দু'পাশের দুই মাইক্রো থেকে লোক বেরিয়ে আসছে অস্ত্র হাতে। নামলেই ওদের গুলির মুখে পড়তে হবে।

'হাসবুনাল্লাহ্' বলে চোখ বন্ধ করল আহমদ মুসা।

পরক্ষণেই পিছন দিক থেকে শব্দ কানে এল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের। চমকে উঠে চোখ খুলল আহমদ মুসা।

পেছনে তাকিয়ে দেখল পেছনের মাইক্রোটি দাউ-দাউ করে জ্বলছে। মাইক্রোটি তার গাড়ি থেকে মাত্র গজ তিন-চারেক দূরে এসে থেমে পড়েছে।

বিস্মিত আহমদ মুসা দু'পাশে তাকাল। দেখল, ডান ও বামের মাইক্রো থেকে লোকরা নেমে পড়েছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে স্টেনগান। ডান পাশের মাইক্রোর লোকরাই আগে নেমেছে। ছুটে আসছে ওরা। আহমদ মুসাকে দেখতেও পেয়েছে। সংগে সংগেই ওদের স্টেনগান উপরে উঠল। আহমদ মুসার হাতের মেশিন রিভলভার আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। তর্জনি ছিল রিভলভারের ট্রিগারে। তর্জনি তার চেপে বসল ট্রিগারে। অব্যাহত গুলির বৃষ্টি ছুটে চলল স্টেনগানধারী ছয় সাতজন লোকের দিকে।

কিন্তু এই সময়ে বাম দিক থেকে অব্যাহত গুলিবৃষ্টি শুরু হলো। গুলি গুলো এসে ছেঁকে ধরল আহমদ মুসার গাড়িক।

গুলী বন্ধ করে নিরুপায় আহমদ মুসা 'হাসবুনাল্লাহু নি'মাল ওয়াকীল, নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসীর' বলে শুয়ে পড়েছে গাড়ির মেঝেতে। তার এখন করণীয় কিছু নেই। ডান দিকের অস্ত্রধারীদের প্রতি তার গুলিবৃষ্টি কী ফল দিয়েছে, সেটা দেখারও সময় পায়নি আহমদ মুসা। তবে সেদিক থেকে কোন গুলি আসছ না।

গাড়ির ফ্লোরো আশ্রয় নেবার পর মুহূর্তও পার হয়নি, আরেকটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা। এবার বিস্ফোরণটা বাম পাশে, একদম কাছেই হলো।

বিস্ফোরণের সাথেই বাম দিকের গুলিবৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল।

পার হলো কয়েক মুহূর্ত।

ফ্লোর থেকে উঠল আহমদ মুসা। গাড়ির সীটে বসে তাকাল বাম দিকে দ্বিতীয় বোমা বিস্ফোরণের স্পটের দিকে। দেখতে পেল অনেকগুলো মানুষের ছিন্ন-ভিন্ন দেহ। বাঁচার মত কাউকে মনে হলো না। তাকাল ডান দিকে। দেখল, তার গুলিতে কাজ হয়েছে। ওরা দৌড়ে সার বেঁধে ছুটে আসছিল। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া দেহ নিয়ে ওরা সারবেঁধেই পড়ে আছে।

কিন্তু তাকে রক্ষার জন্যে দু'টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটাল কে? বিস্ফোরণ দু'টি সাক্ষাত আল্লাহ্'র সাহায্য হিসাবে এসেছে। কিন্তু আল্লাহ্ কাকে দিয়ে এই সাহায্য করালেন? কে সে?

দুই হাতে দুই রিভলভার নিয়ে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল। গাড়ি থেকে নেমেই আহমদ মুসা দেখতে পেল, পেছনের জ্বলন্ত মাইক্রোর পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছে মেন্দারিস মালিক। তারও হাতে রিভলভার।

আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়ে সে ছুটে এল।

'কেমন আছেন আপনি? ভালো তো? ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলাম আপনাকে নিয়ে। আল্লাহ্'র হাজার শোকর যে আপনাকে দেখতে পেলাম। ওরা আট-ঘাট বেঁধে পরিকল্পনা করেছিল।' আহমদ মুসার সামনে এসে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল মেন্দারিস মালিক।

আহমদ মুসা জড়িয়ে ধরল তাকে। বলল, 'আমাকে বাঁচানোর জন্যেই আল্লাহ্ আপনাকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্'র মূর্তিমান সাহায্য হিসাবে আপনি এসেছেন। আল্লাহ্'র হাজার শোকর। আপনাকে ধন্যবাদ।'

'আপনি নিজেকে নিজেই বাঁচিয়েছেন।'

'ডান ও বাম পাশের মাইক্রো দু'টিকে যদি আপনি অকেজো করে দিতে না পারতেন, তাহলে গাড়ি সমেত আপনাকে ওরা পিশে ফেলত। আবার ডান

পাশের বন্দুকধারীদের আপনি ঠিক সময়ে ঠেকিয়েছেন। ওরা আপনার গাড়ির এত কাছে এসে পড়েছিল যে আমি দূরে থেকে জ্বলন্ত মাইক্রোর উপর দিয়ে ওদের উপর বোমা ফেলতে সাহস পাইনি।' বলল মেন্দারিস মালিক।

'কিন্তু পেছনের মাইক্রো আমাকে তো প্রায় শেষ করেই ফেলেছিল। আপনার বোমা ঠিক সময়ে মাইক্রোকে আটকে দিয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আল্লাহ্'র হাজার শোকর। আমি অনেকটা পেছন থেকে মাইক্রোর উপর বোমাটি ফেলেছিলাম। ভয় ছিল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায় কিনা। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেছেন।'

'আলহামদুলিল্লাহ্।' মেন্দারিস মালিক বলল।

'আলহামদুলিল্লাহ্। যদি আপনি বাম পাশের গুলিবৃষ্টিরত বন্দুকধারীদের উপর ঠিক সময়ে বোমা না ফেলতেন, তাহলে কিন্তু আমার বাঁচা দায় হতো। আমাকে পাল্টা গুলি করার সুযোগ ওরা দিত না।' বলল আহমদ মুসা।

'এটাও ছিল ভাগ্য। আমি যেখান থেকে শূন্য দিয়ে লক্ষ্য ছাড়াই জ্বলন্ত মাইক্রোর উপর দিয়ে বোমাটি ছুঁড়েছিলাম, তা পয়েন্টেড ছিল না। সেটা যে অস্ত্রধারীদের মাঝখানে পড়েছে, সেটা আমি বলছি লাক।'

থমল মেন্দারিস মালিক মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই বলল, 'চলুন দেখি ওদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

'চলুন।' বলল আহমদ মুসাও।

হাঁটতে শুরু করে আহমদ মুসা টেলিফোন করল ডিজিপি মাহির হারুনকে। তাকে এখানকার সব ঘটনা জানাল সংক্ষেপে। ডিজিপি মাহির হারুন বলল, 'আপনি ঠিক আছেন তো।' তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'আমি কিছু লুকাইনি মি. মাহির হারুন। আমি ভালো আছি। তবে স্নেক গ্রুপের একজন সদস্য সাহায্য না করলে আমি এভাবে কথা বলার অবস্থায় বোধ হয় থাকতাম না।' আহমদ মুসা বলল।

'স্নেক গ্রুপ? ও তো কিলার গ্রুপ। তারা আপনাকে সাহায্য করল? কিভাবে। কেন?' জিজ্ঞাসা ডিজিপি মাহির হারুনের।

‘স্নেক গ্রুপ কিলার ঠিকই। কিন্তু মি. মাহির হারুন, মানুষই কিলার হয়, কিলার মানুষও হতে পারে। সেই একজন মানুষই আমাকে সাহায্য করেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তা হতে পারে। শুনেছি, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিম সৈনিকদের হিংস্র প্রাণীরাও সাহয্য করতো। আপনি কিলারকে মানুষ করবেন, সেটা স্বাভাবিক। ধন্যবাদ। আমি আসছি। তাকে আমি ধন্যবাদ দেব। আমি ইজদির পুলিশকেও বলছি ওখানে যাবার জন্যে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

‘আসুন। ধন্যবাদ। আস্‌-সালামু ‘আলাইকুম।’

আহমদ মুসা মোবাইলের কল অফ করে মেন্দারিস মালিককে বলল, ‘ডিজিপি মাহির হারুন আসছেন। ইজদির পুলিশকেও উনিই জানাবেন। ডিজিপি মাহির হারুন খুব খুশি হয়েছেন আপনার উপর। উনি নিজেই আপনাকে ধন্যবাদ দেবেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সত্যিই আমি মানুষ হতে পারব মি. আবু আহমদ?’ আহমদ মুসার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল মেন্দারিস মালিক।

‘আপনি মানুষই আছেন। পশুত্ব বা শয়তানের কিছু গুণ আপনার মনুষত্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আপনার জেগে ওঠা মনুষত্ব সে অপশনগুলোকে উচ্ছেদ করেছে। ফেরেস্তারা যাকে সিজদা করেছিল, সেই মানুষই আপানি এখন হয়ে গেছেন।’ আহমদ মুসা বলল।

হঠাৎ মেন্দারিস মালিক আহমদ মুসার দুই হাত চেপে ধরে কেঁদে ফেলল। বলল, ‘এই মানুষ হওয়ার সৌভাগ্য কি আমার হবে? আমি কত লোককে হত্যা করেছি, সে সংখ্যা আমি বলতে পারবো না। আমার নিষ্ঠুরতার জন্যেই দলের নেতৃত্ব আমি পেয়েছি। আমার এই সীমাহীন পাপ কি আল্লাহ্‌ মাফ করবেন?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আল্লাহ্‌ দয়ার অন্তহীনতা সম্পর্কে জানলে এই কথা আপনি বলতেন না। গোটা মানব জাতির পাপের সমষ্টি আল্লাহ্’র দয়ার সমুদ্রের তুলনায় একটা বারি-বিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয়। দেখুন, আল্লাহ্’র এক নাম ‘রহমান’, আরেক নাম ‘রহীম’। দুই নামেরই অর্থ ‘দাতা’, ‘দয়ালু’। কিন্তু তাঁর

এই দুই দয়ার ক্ষেত্র ভিন্ন। তিনি রহমান, কারণ অপরাধী, পাপী, তাকে অস্বীকারকারী, তার ধর্মের শত্রু, কাফের, ফাসেক নির্বিশেষে সকল মানুষকে তিনি ভালোবাসেন। তিনি তাদের প্রত্যেককেই আহার দেন, আশ্রয় দেন। তাদের কাউকেই তিনি দিনের আলো, উপকারী বাতাস, জীবন ধারনের পানি এবং সুখ-ভোগ থেকে বঞ্চিত করেন না। না চাইতেই সকল মানুষকে তিনি এই সব নিয়ামত দান করেন। আর রহীম তিনি এই কারণে যে, তিনি অসীম ক্ষমাশীল এবং বেনজীর দাতা। অপরাধ করে মানুষই। আর তার পাপের বোঝা যতবড়ই হোক, মানুষ যখন অনুতপ্ত হয়ে বিনীতভাবে মহান আল্লাহ্’র সামনে দাঁড়ায় ক্ষমার জন্য, তিনি ক্ষমা করে দেন। মানুষ তখন তার প্রয়োজন নিয়ে হাজির হয় তাঁর কাছে, প্রার্থনা করে তার আশা পূরণ হওয়ার জন্যে, তখন তিনি তার আশা পূর্ণ করেন। তিনি তার বান্দাহ্ মানুষকে ভালোবাসেন, তাই তিনি চান মানুষ ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাক, মানুষ তার কল্যাণের প্রয়োজন নিয়ে তার সামনে দাঁড়াক, প্রার্থনা করুক, আবেদন করুক অভাব পূরণের। তিনিই আমাদের মহান আল্লাহ্, মাহামহিম স্রষ্টা এবং অসীম দয়ালু প্রতিপালক। মি. মেন্দারিস মালিক আপনার পাপ তাঁর দয়ার মহাসিন্ধুর কাছে কিছুই নয়। বান্দাহ্ তাঁর দরবারে শুধু হাজির হওয়ার অপেক্ষা মাত্র, তিনি দু’হাত বাড়িয়ে আছেন বান্দাকে মাফ করার জন্যে, তার চাওয়া পূরণের জন্যে।’ থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই মেন্দারিস মালিক সিজদায় পড়ে গেল। কাঁদল অনেক সে।

যখন সিজদা থেকে সে উঠে দাঁড়াল, তখন অনেক শান্ত সে। আশার ঔজ্জ্বল্য তার চোখ। স্বস্তির স্নিগ্ধতা তার চেহারায়।

‘খোশ আমদেদ নতুন মেন্দারিস মালিক।’

স্বাগত জানাল আহমদ মুসা মেন্দারিস মালিককে। তার চোখে-মুখে আনন্দ।

‘মেন্দারিস মালিক যদি নতুন মানুষ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে থকে, তাহলে তার রূপকার আপনি। আল্লাহ্ আপনাকে এর যাযাহ্ দান করুন।’ বলল মেন্দারিস। গম্ভীর ও ভারি তার কণ্ঠ।

‘আলহামদুলিল্লাহ্‌। চলুন এবার আমরা আমাদের কাজ শুরু করি।’ বলল আহমদ মুসা মেন্দারিস মালিককে লক্ষ্য করে।

‘চলুন।’ বলে হাঁটতে শুরু করল মেন্দারিস মালিক।

আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করেছিল আগেই।

একে একে সবগুলো বডিই সার্চ করল দু’জনে মিলে। কিন্তু তাদের পকেটে মানিব্যাগ ছাড়া আর কিছু মিলল না।

মানিব্যাগগুলোতে শুধু টাকাই দেখা গেল। মাত্র একটা মানিব্যাগে টাকার সাথে সাদা কাগজের একটা শীট চারভাঁজ করা অবস্থায় পাওয়া গেল। মানিব্যাগটা ছিল সামান্য কিছু টার্কিশ নোট ছাড়া সবটা ডলারে ভর্তি। হতে পারে মানিব্যাগটা ছিল তাদের এই মিশনের নেতার। টাকা বিলি-বন্টনের নোট রাখার জন্যে কি ছিল সাদা কাগজের শীটটা!

টাকা সমেত মানিব্যাগটা তার পকেটে রেখে দিয়ে কাগজের শীটটা আহমদ মুসা নিজের কাছে রাখল, সাদা কাগজ দরকার হতে পারে এই ভেবে।

‘সোহা ও হোলি আর্কগ্রুপের লোকরা দারুণ সতর্ক। এরা অপরাধ করে, কিন্তু তাদেরকে ধরার মত কোন চিহ্ন রেখে যায় না।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

‘আপনি সেদিন বলেছিলেন ওদের দলের নাম জানেন না, এখন যে নাম বললেন?’ আহমদ মুসা বলল।

হাসল মেন্দারিস মালিক। বলল, ‘আপনার সাথে সেদিন কথা বলার পর আমি ওদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি। কিছু জানতে পেরেছি।’

‘দলের নাম ছাড়া আর কী জানতে পেরেছেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘তেমন কিছু নয়। তবে আমার মনে হয়েছে শীঘ্রই বড় কিছু ঘটাতে যাচ্ছে ওরা। খুবই ওভার কনফিডেন্ট ওরা যে, ওদের বাধা দেবার সাধ্য কারও নেই। ওরা বলেছে, এটা ওদের শেষ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয় তাদের হাজার হাজার বছরের স্বপ্ন সার্থক করবে।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

‘কি তাদের যুদ্ধ, কি ঘটাতে চায় তারা?’ আহমদ মুসার স্বাগত কণ্ঠের জিজ্ঞাসা।

‘আমিও বুঝতে পারিনি। আজকাল ওরা খুব সাবধান হয়েছে। ওরা কাজ করার জন্যে লোকও পাল্টাচ্ছে। যাদের আমি চিনতাম। তাদের দেখা যায় না।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

‘আপনি কখন কিভাবে আমাদের ফলো করলেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমি ক’দিন ধরে রেস্টুরেন্টে আসছি। আমি জানতাম, ওদের সন্ধানে আপনিও সেখানে আসবেন। মুখে খ্রীস্টান সন্যাসীদের মত দাড়ি নিয়ে আজও এসেছিলাম। এসেই দেখলাম আপনাকে। মদ্যপ দু’জনের কথা আমিও শুনেছি একটু দূরে বসে। আপনি ওদের ফলো করলে আমিও উঠলাম। গাড়ি নিয়ে এলাম গেটে। আমি জানতাম বুদ্ধিমান গেটম্যান ওদের টাকা খায়। আমি গেট পার হবার সময় গেটম্যানকে ওদের স্টাইলে হাত নেড়ে বললাম, ‘মাসিস মুক্ত হোক।’ ওরা মাউন্ট আরারাতকে ‘মাসিস’ বলে। ওরা একে অপরকে দেখলে এই কথা বলেই স্বাগত জানায়। আমার কথায় গেটম্যান আমাকে তাদের লোক বলে ধরে নিল। আমাকে ইংগিতে দাঁড়াতে বলল। দাঁড়ালে সে বলল, ‘আপনাদের দু’জন লোককে একজন লোক ফলো করেছে। এটা আমি জানিয়ে দিয়েছি সবাইকে।’ আমি উদ্বিগ্ন হলাম। নিশ্চয় আপনি বিপদে পড়বেন। আমি পিছু নিলাম আপনাদের। অর্ধেক পথ এগোনোর পর আমি দেখলাম একটা রোড ক্রসিং-এর ডান দিকের একটা রাস্তা থেকে একটা মাইক্রো প্রবল বেগে ছুটে এসে আপনার পিছু নিল। আমার গাড়িতে একটা সমস্যা থাকায় তার মত স্পিডে আমি চলতে পারলাম না। কিন্তু পিছু ছাড়লাম না আপনাদের।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

দূরে পুলিশের গাড়ির সাইরেন শোনা গেল। শব্দ আসল ইজদির দিক থেকে।

‘তাহলে ইজদির থেকেই প্রথমে আসছে পুলিশ। ডিজিপি মাহির হারুনের আসতে দেরি হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ডিজিপি সাহেব কি ‘ভ্যান’ থেকে আসবেন?’ জিজ্ঞাসা মেন্দারিস মালিকের।

‘না। আগ্রিতে এসেছেন উনি, ওখন থেকেই আসবেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে তো তাড়াতাড়িই এসে পড়তেন।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

‘আসুন আমার গাড়িতে বসি। গাড়ির সামনের ও পেছনের কাঁচ ভেঙেছে। গুলিতে বাইরেরও ক্ষতি হয়েছে। তবে ভেতরে বসা যাবে। আসুন।’

বলে আহমদ মুসা চলল তার গাড়ির দিকে।

মেন্দারিস মালিকও চলল তার সাথে।

৫

চাঁদ ডুবে গেল পশ্চিমে। সূর্যও উঠল পূবে। রাতটা বৃথাই গেল আহমদ মুসাদের।

'মি. আবু আহমদ, নিশ্চয় ওরা কোনোভাবে টের পেয়ে গেছে যে আমরা ওদের প্ল্যান জেনে ফেলেছি।' বলল মেন্দারিস মালিক।

'এটাও সম্ভব নয়। রাত ১২ টার আগ পর্যন্ত আপনার ও আমাদের লোকরা পাহাড়ের পথ থেকে বেশ দূরে দূরে এককভাবে দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়েছে। তাদের দেখে বড় রকমে সন্দেহ করা অসম্ভব। অতএব সন্দেহ বশে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর রাত ১২ টার পর আমাদের লোকরা পাহাড়ে ওঠার কয়েকটি রাস্তার পাশে ক্লোজ হয়েছে, সেটাও দলবেঁধে নয়, এককভাবে অন্ধকারে ক্রলিং করে। এতে তাদের দেখতে পাওয়া এবং ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। এককভবে কাউকে পেলে, সন্দেহ হলে তাকে পাকড়াও বা শেষ করার কথা। কিন্তু এমন ঘটনা একটিও ঘটেনি। অতএবত তারা ফিরে গেছে এ বিষয়টাকে আমরা হিসেবের বাইরে রাখতে পারি।'

'তাহলে তারা না কেন?' বলল ড. বারজেনজো।

এই ড. বারজেনজোরই বাগদত্তা ড. আজদা। ড. বারজেনজোকে তাদের পারিবারিক প্রয়োজনে দেশের বাইরে যেতে হয়েছিল। কয়েকদিন হলো ফিরে এসেছে। আহমদ মুসা তাকে ডেকে নিয়েছে। আহমদ মুসা তার বাড়িতে গিয়েছিল। পরিচিত হয়ে এসেছে সবার সাথা।

ড. বারজেনজোর কথা শেষ হতেই সেখানে এলো অরিয়াস এলাকার ভারপাপ্ত পুলিশ অফিসার রশিদ দারাগ এবং আরারাত অঞ্চলের ডাইরেক্টর অব পুলিশ খাল্লিকান খাচিপ। খাল্লিকান খাচিপ বলল, 'স্যার ঐ প্রশ্নটা আমারও, ওরা এল না কেন?'

'এ প্রশ্ন আমারও। প্রশ্নটারই উত্তর সন্ধান করছি। মনে হয় উত্তরটা আমি পেয়েও গেছি।' বলল আহমদ মুসা।

'পেয়ে গেছেন? কী সেটা?' উদগ্রীব কণ্ঠে বলল ড. বারজেনজো।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমার মনে হয় শব্দের অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের ভুল হয়েছে।' একটু থামল আহমদ মুসা।

তাকাল ডিপি, খাল্লিকান খাচিপের দিকে।

বলল, 'ফুলমুন কী?'

'কেন, ফুলমুন তো পূর্ণিমা।' বলল খাল্লিকান খাচিপ।

'অমাবস্যা ফুলমুন নয় কেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'অমাবস্যায় চাঁদ তো দেখা যায় না।' বলল খাল্লিকান খাচিপ।

'দেখা যায় না, কিন্তু অমাবস্যায় মুন তো ফুলই হয়ে থকে। বলা যেতে পারে, এটা ডার্ক ফুলমুন, আর পূর্ণিমারটা লাইটেড ফুলমুন। অন্যভাবেও বলা যায়, একটা কৃষ্ঞপক্ষের ফুলমুন, আরেকটা শুক্লপক্ষের ফুলমুন।' আহমদ মুসা বলল।

'চমৎকার! নতুন তত্ত্ব। কিন্তু বাস্তবতা আমি মনে করি এটাই। নতুন তত্ত্বটি আমরা মেনে নিলাম স্যার। কিন্তু স্যার, এই নতুন অর্থ গ্রহণ করে এর দ্বারা আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?' বলল ড. বারজেনজো।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'অপরাধীদের জন্যে শুক্লপক্ষ ভালো, না কৃষ্ঞপক্ষ ভালো?'

'কৃষ্ঞপক্ষ।' বলল খাল্লিকান খাচিপ।

'এ কারণেই কি তারা কৃষ্ঞপক্ষের ফুলমুনে অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

কোন কথা এল না ডিপি খাল্লিকান খাচিপ, ইন্সপেক্টর রশিদ দারাগ এবং ড. বারজেনজোর দিক থেকে। নির্বাক তারা। বিস্ময় তাদের চোখে-মুখে। ইন্সপেক্টর রশিদের মুখ তো বিস্ময়ে 'হা' হয়ে গেছে।

'এই সহজ কথাটা আমাদের মাথায় আসেনি কেন? পূর্ণিমায় তো ওরা কিছুতেই আসতে পারে না। পূর্ণিমায় মাউন্ট আরারাতের বরফাবৃত অংশে তো আলোর মহামেলা বসে। বরফের উপর চাঁদের আলো পড়ে দিনের বেলার চেয়ে

অনেক বেশি চোখ ধাঁধাঁনো উজ্জ্বল হাসি হাসে মাউন্ট আরারাত। এই আলোর মেলায় তো অন্ধকারের জীব অপরাধীরা অন্ধকারের কাজ নিয়ে আসতে পারে না। তাদের জন্যে কৃষ্ঞপক্ষের অমাবস্যা বা ডার্ক ফুলমুনই উপযুক্ত সময়। ধন্যবাদ মি. আবু আহমদ। অদ্ভুত আপনার বিশ্লেষণ। সত্যিই আপনি আল্লাহর সবিশেষ নেয়ামতে ধন্য।' খল্লিকান খাচিপ বলল।

'আলহামদুলিল্লাহ। এক বিরাট সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এখন তাহলে আমাদের কী করণীয়?' বলল ড. বারজেনজো।

'কিছু নয়, আসুন আমরা কৃষ্ঞপক্ষের ডার্ক ফুলমুনের অপেক্ষা করি।'

একটু থেমেই আহমদ মুসা বলল, 'আজকের মত কাজ আমাদের সাঙ্গ হলো। চলুন ফিরে যাই আমরা।'

কৃষ্ঞপক্ষের শেষ প্রান্ত। পূর্ণ অবয়ব নিয়ে চাঁদ বর্তমান। কিন্তু তা পৃথিবীর আড়ালে। এখন পৃথিবীও নিকশ অন্ধকারে ঢাকা, চাঁদও।

মাউন্ট আরারাতের সাড়ে ১৪ হাজার ফিট উপরে স্নো-লাইনের প্রায় প্রান্ত ঘেঁষে স্থাপিত ৫ম ট্যুরিস্ট বেজ ক্যাম্পের একটা তাঁবুতে বসা আহমদ মুসা তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত ৯টা বাজে। তাঁবুতে আরও ৭ জন। সবাই ক্যাম্প-চেয়ারে বসে। সবারই পরনে ট্যুরিস্ট পোষাক।

আহমদ মুসারা ১ দিন আগে এই ৫ নং বেজ ক্যাম্পে এসেছে। তিন দিন আগে তারা যাত্রা করেছিল পর্বতের গোড়ায় স্থাপিত এক নম্বর বেজ ক্যাম্প থেকে।

ঘড়ির দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতেই মোবাইল বেজে উঠল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসা তাকাল মেন্দারিস মালিকের দিকে। বলল, 'আপনি আর ড. বারজেনজো তাঁবুর বাইরেটা দেখে আসুন অবাঞ্ছিত কিছুর উপস্থিতি আছে কি না।'

মোবাইল বেজে চলেছে। বেজে থেমে গেল। ধরল না আহমদ মুসা। বাইরের রিপোর্ট পায়নি।

মিনিট দেড়েক পরে ড. বারজেনজো এসে বলল, 'বাইরেটা ঠিক আছে।'

আহমদ মুসা মিসকলটায় কল করল।

ওপার থেকে কথা বলল ডাইরেক্টর অব পুলিশ খাল্লিকান খাচিপ। বলল, ‘স্যার, ওদিকের খবর কী?’

‘কোন খবর নেই মি. খাচিপ। কোন দিক থেকেই কোন নড়াচড়া নেই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওদের নড়া-চড়া আজকেও দেখা যাবে না বলেই মনে হচ্ছে। খবর পেলাম, সেনাদের একটা দল পাহাড়ের উপরে গেছে। ওরাও মনে হয় খবর পেয়েছে। এ জন্যেই তারা গেছে যাতে মাউন্ট আরারাতের কোন ক্ষতি না হয়, ক্রিমিনালরা যাতে উপরে গিয়ে কোন ঘটনা ঘটাতে না পারে। আমাদের বোধ হয় আজকেও খালি হাতে ফেরত যেতে হবে, স্যার।’

‘একটা বিষয়, মি. খাল্লিকান খাচিপ। মাউন্ট আরারাতে কোন অপরাধ ঘটতে যাচ্ছে বা অপরাধীরা এখানে একত্রিত হচ্ছে, এটা সেনাবাহিনী জানতে পারলে সে খবর পুলিশকে জানানোর কথা। তারা নিজেরাও যদি অভিযান পরিচালনা করতে চায়, তাহলেও পুলিশকে তারা জানাবে এবং পুলিশকেও তারা সাথে নেবে। তাই কি না, মি. খাল্লিকান খাচিপ?’ আহমদ মুসা বলল।

‘এটাই নিয়ম। কিন্তু ওরা তো কিছু জানায়নি। হতে পারে জানাবার সময় হয়নি। বিষয়টি ইমারজেন্সি বলেই তারা নিজেরাই এগিয়ে এসেছে।’ বলল খাল্লিকান খাচিপ।

‘এটাও হতে পারে। কিন্তু অয়্যারলেস, মোবাইলের যুগে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। ঠিক আছে। তবে ঐ সেনাদের আসা দেখে আমাদের পরিকল্পনার কোন হেরফের হবে না। প্লিজ, দেখবেন কোথাও যেন কোন শিথিলতা না আসে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এটাই উচিত। ঠিক আছে স্যার। দায়িত্বের ক্ষেত্রে কোন অন্যথা হবে না।’ বলল খাল্লিকান খাচিপ।

‘ধন্যবাদ। আস্-সালামু ‘আলাইকুম।’

কল ক্লোজ করে মোবাইল রেখে দিল আহমদ মুসা।

হন্ত-দন্ত হয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করল মেন্দারিস মালিক। বলল, ‘একদল সৈন্য এদিকে আসছে।’

তার কথা শেষ হতে না হতেই হুড়মুড় করে তাঁবুতে প্রবেশ করল একদল সৈন্য। তাঁবুতে প্রবেশ করেই একজন সৈন্য তার স্টেনগানের ব্যারেল সবার উপর দিয়ে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে বলল চিৎকার করবে না, তোমরা সকলে হাত তুলে দাঁড়াও। কেউ চালাকির চেষ্টা করলে তাকে কুকুরের মত গুলি করে মারবো।' উপস্থিত সৈনিকদের দিকে একবার তাকিয়ে আহমদ মুসা হাত তুলল।

সবাই আগেই হাত উপরে তুলেছিল।

আহমদ মুসা সৈনিকদের দেখছিল গভীরভাবে। সৈনিকদের পোষাকে কোন খুঁত নেই। পায়ের বুটও এই সৈনিকদের। সবার মাথার চুলই আর্মি কাট। মি. খাল্লিকান খাচিপ তাহলে এই সৈনিকদের কথাই বলেছিল। কিন্তু তারা এভাবে আমাদের উপর চড়াও হলো কেন!

এসব ভাবনা থেকে আহমদ মুসা বলল, 'আপনারা এভাবে আমাদের উপর চড়াও হয়েছেন কেন? আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সৈনিকরা তখন তাঁবুর লোকজনদের বাঁধার কাজ শুরু করে দিয়েছিল। কিছু সৈন্য তাদের স্টেনগান বাগিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। অন্যরা বাঁধার কাজ করছিল।

আহমদ মুসার কথার উত্তরে একজন সেনা অফিসার বলল, 'আমরা খবর পেয়ে ছি আজ মাউন্ট আরারাতে বড় একটি ক্রিমিনাল ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। এ ঘটনা কারা ঘটাবে আমরা জানি না। সুতরাং ট্যুরিস্ট-ননট্যুরিস্ট যাদেরকেই আমরা মাউন্ট আরারাতে পাব, তাদেরকে এই রাতের জন্যে গ্রেফতার করে রাখব। সকালেই সকলে ছাড়া পেয়ে যাবেন।' কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ও কর্কশ কণ্ঠ সেনা অফিসারের।

কিছু বলার জন্যে হা করেছিল ড. বারজেনজো। আহমদ মুসা আশংকা করল সে আমাদের পরিচয় দিয়ে দিতে পারে।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা ডাকল ড. বারজেনজোকে তার মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নেবার জন্যে। বলল, 'এঁরা ঠিকই বলেছেন। এঁদের আমাদের সহযোগিতা করা উচিত।' বলে আহমদ মুসা তার তর্জনিটা ঠোঁটে ঠেকাল। বুঝতে পেরেছে সে। তার ঠোঁটে অস্ফুট একটু হাসি।

‘আমাদের সহযোগিতা করার কোন দরকার নেই। আমাদের কাজের জন্যে আমরাই যথেষ্ট। আমরা বেঁধে রেখে যাচ্ছি।’ আবার কর্কশ কণ্ঠ সেনা অফিসারের। সবার মত আহমদ মুসাকেও ওরা পিছমোড়া করে বাঁধল। অন্যদের মত পা’ও বাঁধা হলো তার।

তারপর সৈনিকরা সবাই বেরিয়ে গেল।

সৈনিকদের বেরিয়ে যাওয়ার ধরন দেখে চমকে উঠল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মনে সন্দেহের যে ধোঁয়াটে অবয়ব ছিল তা যেন আলোর রূপ নিয়ে সামনে এল। ট্রেইন্ড সৈন্যদের পদক্ষেপ ও হাঁটা ওদের মত অমন হতেই পারে না। বিশেষ করে ডিউটিকালীন সময়ে।

সব সৈন্য বেরিয়ে গেলে সেনা অফিইসারটি ঘুরে দাঁড়াল। পকেট থেকে টেনিস বলের মত একটা গোলাকার বস্তু বের করল ছুঁড়ে মারার জন্যে।

আহমদ মুসা দেখেই বুঝল ওটা ক্লোরোফর্ম বোম।

অফিসার বস্তুট বের করেই ছুঁড়ে মারল তাঁবুর মাঝখানে।

পলকের মধ্যেই ঘটে গেল ঘটনা।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত, সবাই ঢলে পড়ল তাঁবুর মেঝেতে। আহমদ মুসাও।

পল পল করে সময় বয়ে গেল।

এক সময় আহমদ মুসা মাথা তুলে চারদিকটা দেখে উঠে দাঁড়াল। ছুটে এল তাঁবুর বাইরে। কাউকে দেখল না। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, দু’একটা শব্দ তার কানে এল। বোঝার চেষ্টা করল কোন দিক থেকে আসছে।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। যাকে দেখতে পেল সে হলো মেন্দারিস মালিক।

খুশি হয়ে জড়িয়ে ধরল মেন্দারিস মালিককে আহমদ মুসা। বলল, ‘ধন্যবাদ, আপনি ওদের ক্লোরোফর্ম বোমাকে ফাঁকি দিতে পেরেছেন?’

‘হ্যাঁ, এই বিষয়কে আজ প্রথম প্রাকটিস করলাম।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

‘আপনার কথার মধ্যে বড় একটা সত্য আছে। এ ধরণের ক্লোরোফর্ম বোমার কার্যকারিতা এক দেড় মিনিটের বেশি থাকে না। বিশেষ করে বিস্ফোরণের

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লোরোফর্ম গ্যাসের মাথার স্নায়ু অবশকারী অণুগুলো দ্রুত উপরে উঠে যায়। সুতরাং শুয়ে বা বসে থাকা কেউ মিনিট খানেক নিশ্বাস বন্ধ করে রাখতে পারলে সে আর আক্রান্ত হয় না।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ। এত বিস্তারিত আমি জানতাম না। ভবিষ্যতে কাজে দেবে।'

একটু থেমে বলল, 'স্যার, সৈনিকরা আমাদেরকে এভাবে বাঁধল, সংজ্ঞাতীন পর্যন্ত করে দিল সবাইকে, এর অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। আমাদের সন্দেহ করলে আমাদের ধরে নিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু তা না করে এক রাতের জন্যে সংজ্ঞাহীন করে গেল। ভোর হলেই সবাই ছাড়া পেয়ে যাবে! এতেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? রাত কি আর আসবে না? দুর্বোধ্য লাগছে তাদের আচরণ।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আর যদি ওরা সৈনিকই না হয়, তাহলে কি অর্থ পরিষ্কার হয় না?'

'তার মানে, ওরা...।' কথা শেষ না করেই থেমে গেল মেন্দারিস মালিক। তার চোখে এক রাশ বিস্ময়।

'হ্যাঁ, ওরা সৈনিক নয়। ওরা সৈনিকের পোষাক পরে এসেছে। আমি মনে করি ওরাই তারা, যারা আজ রাতে মাউন্ট আরারাতের স্বর্ণভাণ্ডার লুট করার জন্যে আসার কথা।' বলল আহমদ মুসা।

'ও গড! সৈনিকদের ইউনিফর্ম পুরানো মনে হয়েছে। ওদের কোড নাম্বার, বুকের নেমপ্লেট কোনটাই নতুন তৈরি বলে মনে হয় নি। অথচ ভূয়া সৈনিকদের পোষাক-পরিচ্ছদ সবই সাধারণত নতুন ভাবে তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক।' বলল মেন্দারিস মালিক।

'আপনার পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ মেন্দারিস মালিক। এর একটাই জবাব, এই ইউনিফর্ম তারা সৈনিকদের কাছ থেকেই পেয়েছে। এর সুযোগ ওদের রয়েছে। সে আর এক কাহিনী।' আহমদ মুসা বলল।

'এখন আমরা কী করব স্যার। আমার মনে হয় এদের বাঁধন খুলে দিয়ে ওদের জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করা দরকার।' বলল মেন্দারিস মালিক।

ওদের সবার বাঁধন কেটে দিয়ে আহমদ মুসা ও মেন্দারিস মালিক কয়েকটি স্টেনগান কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল। আহমদ মুসার পিঠে একটা ব্যাগও ঝুলছে। পোষাকও তাদের পাল্টে গেছে। বরফের উপর দিয়ে চলার মত তাদের ক্লাইম্বারের পোষাক।

আহমদ মুসার চোখে নাইটভিশন গগলস্। সে আগে হাঁটছে তার পেছনে মেন্দারিস মালিক।

অন্ধকার হলেও এ পথ আহমদ মুসার চেনা।

এর আগে দু'বার এপথ দিয়ে ১৬ ফিট পর্য উপরে উঠেছে আহমদ মুসা। কিন্তু আজ কোন পর্যন্ত উঠতে হবে সে জানে না। প্রচারিত তথ্য অনুসারে সাড়ে ১৫,০০০ ফিট লেভেলের দুই শৃঙ্গের মাঝখানের এক উপত্যকায় প্লাবন শেষে নুহ আ.- এর নৌকা ল্যান্ড করেছিল। আজকের আরোহনের সীমা এই লেভেল পর্যন্ত হতে পারে।

বিশ মিনিট আরোহনের পর একটা চাপা কাশির অস্ফুট আওয়াজ কানে প্রবেশ করতেই আহমদ মুসা চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। যে ঢাল দিয়ে তারা এগিয়ে এসেছে, তার গোটাটাই এখান থেকে দেখা যাচ্ছে নাইটভিশন গগলসের মধ্য দিয়ে। কিছুই চোখে পড়ল না। কিন্তু তার শোনাটা সত্য।

আহমদ মুসা আরও কিছুটা সময় দেখার সিদ্ধান্ত নিল। বলল মেন্দারিস মালিককে, 'চলুন, এই গলিটা দিয়ে বরফের চাং-টার পেছনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি।'

'কোন বিশ্রাম নেবেন না, কিছু ঘটেছে?' বলল মেন্দারিস মালিক। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

'পেছন থেকে একটা শব্দ পেয়েছি। সেটার উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া দরকার। নিশ্চিত হওয়ার জন্যেই পেছনটা একটু দেখা প্রয়োজন।' আহমদ মুসা বলল।

'অবশ্যই স্যার। চলুন।' বলল মেন্দারিস মালিক।

দু'জনে গিয়ে বরফের চাংটার পেছনে আশ্রয় নিল।

সময় বয়ে চলল পল পল করে। গত হলো মিনিট দু'য়েকের মত সময়।

বরফের একটা টিলার বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এল একদল মানুষ। দশ বারোজনের মত হবে। হবে ওদের চেহারা স্পষ্ট নয়।

ঢালটার মাঝামাঝি আসতেই স্পষ্ট হয়ে গেল ওরা সশস্ত্র একদল মানুষ।

ওরা আরও কাছে এসে পড়ল। এখন তিন চার গজের মধ্যে ওরা। মুখ কারও দেখা যাচ্ছে না। পশমের টুপি ওদের কপাল পর্যন্ত নেমে এসেছে। জ্যাকেটের পশমের কলার নিচ থেকে পকেটের অর্ধেকেটা ঢেকে দিয়েছে।

ওদের গলায় দুলছিল লকেট।

ওরা বরফের চাংটার ওপাশ দিয়ে যাবার সময় লকেটের অবয়বটাও ভালোভাবে নজরে এল আহমদ মুসার। মাউন্ট আরারাতের খোদাই করা ছবির মাথায় ক্রস যেন পুঁতে দেয়া। ক্রস থেকে বিচ্ছুরিত তীক্ষ্ণ একটা আলোর প্লাবন সিক্ত করছে মাউন্ট আরারাতকে।

এরা কারা? উল্কিওয়ালাদেরই এটা দ্বিতীয় দল নিশ্চয়! ওদের গলায় লকেট নেই, এদের আছে। গায়ের উল্কি দেখা যায় না বলেই হয়তো প্রদর্শনীর এই বিকল্প ব্যবস্থা।

আহমদ মুসাদের সামনে দিয়ে চলে গেল ওরা সবাই।

ওদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে আহমদ মুসারা বেরিয়ে এল বরফের চাংটার আড়াল থেকে।

‘এরা ওদেরই লোক। ভাগ্য ভালো, আমরা ওদের চোখে পড়িনি।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

‘উল্কিওয়ারা গলায় মাউন্ট আরারাতের প্রতিকৃতিও কি ধারণ করে থাকে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘এটা আমি জানি না স্যার। তবে উল্কিওয়ালা যাদের আমি দেখেছি, তাদের কারও গলায় মাউন্ট আরারাতের প্রতিকৃতি দেখিনি।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

‘কিন্তু এদের প্রত্যেকের গলায় যে ক্রসের সাথে মাউন্ট আরারাতের প্রতিকৃতিও দেখলাম!’ আহমদ মুসা বলল।

‘এ রকম কখনও আমি দেখিনি। হতে পারে মাউন্ট আরারাতের অভিযানের সময় ওরা মাউন্ট আরারাতের বাড়তি প্রতিকৃতি পরেছে।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

‘হতে পারে, তবে সন্ত্রাসী বা গোপন দলগুলো প্রতীক বাছাই ও ব্যবহারের নীতির ক্ষেত্রে খুবই কনজারভেটিভ। এক্ষেত্রে তারা তাদের নীতির অন্যথা করে না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমিও তাই মনে করি স্যার। কিন্তু এক্ষেত্রে বাহুর উল্কি প্রতীকের রূপ একেবারে গলায় উঠে এল কেন, তার অর্থ বুঝতে পারছি না।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

‘থাক। এই বিষয়ে আর নয়। চলুন আমরা সামনে এগোই। এসব ভেবে লাভ নেই। চোর-বাপাড়েও মৈত্রী হয়। উল্কিওয়ালারা তো দুই দল এক সাথে কাজ করছে। আরও ভিন্ন কেউ তাদের সাথে যোগ দিতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক বলেছেন স্যার। চলুন।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

এগুতে লাগল তারা আবার। প্রায় এক ঘন্টার মধ্যে তারা পর্বতের প্রায় সাড়ে ১৫ হাজার ফিট লেভেলে পৌঁছে গেল। পর্বতের যে অংশটা তারা অতিক্রম করে এল, সেটা খুব দুর্গম নয়। সিঁড়ির মতই ঢালু অনেকটা। মাউন্ট আরারাতের দু’টি মূল শৃংগ বিস্তারিত এলাকা জুড়ে উঠে এসেছে উপরে। তবে পর্বতের অনেক এলাকা খুবই সুগম। চৌদ্দ হাজার ফুট থেকে সাড়ে পনের হাজের ফুটের মধ্যবর্তী এই রুট তেমনি একটা এলাকা।

সামানেই দু’টি ছোট বরফাচ্ছাদিত শৃংগের দেয়াল। দুই শৃংগের সংযোগকারী যে স্হান তাও বেশ উঁচু ও খাড়া। এর মধ্যে আবার এ পাশটা আরোহনের যোগ্য, কিন্তু ও পাশটা একেবারেই অগম্য। এ কারণেই এই শৃংগ ঘুরে ওপাশে পৌঁছাতে হয়।

আহমদ মুসা শৃংগের দেয়ালের গোড়ায় বসে পড়ল। বলল, ‘এ দেয়ালের ওপরেই সেই বহুল আলোকিত, বহুল কথিত স্থান, যেখানে হযরত নুহ আ.-এঁর কিস্তি প্লাবনের পানি সরে গেলে ল্যান্ড করেছিল। ওরা যে স্বর্ণভাণ্ডার খুঁজতে এসেছে তা ওপাশের উপত্যকার কোন একটা পাহাড়ের গুহায় রয়েছে। সুতরাং

ওদের গন্তব্য এবং কর্মস্হল এই উপত্যকা। উপত্যকার সামনের ছোট দুই শৃংগের ওপাশে হলেও অনেক ঘুরে যেতে হয় ঐ উপত্যকার সামনের ছোট দুই শৃংগের ওপাশে হলেও অনেক ঘুরে যেতে হয় ঐ উপত্যকায়। একনিতে দশ মিনিটের পথ নয়। কিন্তু এই দুই শৃংগের পাদদেশটাই ঘুরে ওপাশের উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় ঘন্টা খানেকের মত। এসময় খরচ করে ঐ উপত্যকায় গিয়ে এই মুহুর্তে তাদের কোন কাজ নেই। তার চেয়ে দুই শৃংগের মাঝখানে দেয়ালের মত জায়গায় গিয়ে উপত্যকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করাই এই মুহুর্তে তাদের বড় কাজ। উপত্যকায় তাদের কর্মস্থল থেকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এই আড়ালে থাকবে আমাদের এই এখনকার সদর দফতর।'

'কিন্তু এ সদর দফতর থেকে আমরা আর কী করব?' বলল মেন্দারিস মালিক।

'দুই শৃংগের মাঝখানের দেয়ালটার আড়ালে আমরা গিয়ে বসব। সেখান থেকে ওপাশের উপত্যকায় চোখ রাখব। দেয়ালের ওপাশটা খাড়া বলে গোটা উপত্যকাটাই আমাদের চোখের নিচে থাকবে এবং আমাদের আওতার মধ্যেও থাকবে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমাদের লক্ষ্য কী? কী কেতে চাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞাসা মেন্দারিস মালিকের।

'আমরা ওদের গোটা গ্যাংকে ধরতে চাই। এর মাধ্যমে আমরা ওদের সামনের পরিকল্পনা বানচাল করে দিতে চাই।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু আমরা তো মাত্র দু'জন!' বলল মেন্দারিস মালিক।

'আমাদের আর লোকরা তো সংজ্ঞা হারি য়ে পড়ে থাকল। আমাদের পরিকল্পনা মার খেয়েছে এর ফলে। ভালো কথা মনে করেছেন, এই বিষয়টা নিয়ে ডিপি খাল্লিকান খাচিপের সাথে আলোচনা করা দরকার। আগে কথা ছিল ওর বাহিনী বেজ ক্যাম্প ওয়ানেই থাকবে। কিন্তু এখন ওদের সাহয্য দরকার আমাদের।' বলল আহমদ মুসা।

বলেই আহমদ মুসা পকেট থেকে মোবাইলটা হাতে নিল। কল করল আরিয়াস-আরারাত অঞ্চলের পুলিশের ডাইরেক্টর খাল্লিকান খাচিপকে।

ওপারে খাল্লিকান খাচিপের কণ্ঠ পেতেই আহমদ মুসা সালাম দিয়ে বলল, ‘মি. খাল্লিকান খাচিপ, আপনার বাহিনী কোথায়?’

‘আছে এই এলাকাতেই। তবে আমি মনে করছি স্যার, এ সবের আর প্রয়োজন নেই। মাউন্ট আরারাত তো আইনিভাবে সেনা-ব্যবস্থাপনার অধীন। ওরাই তো দেখছি মাউন্ট আরারাতের এই পর্যটন রুটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচ্ছে। আমাদের প্রয়োজন তেমন একটা আছে বলে মনে হচ্ছে না।’ বলল খাল্লিকান খাচিপ।

‘ওরাই এই পর্যটন ইউনিটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচ্ছে’- এ কথাটার অর্থ বুঝলাম না মি. খাল্লিকান খাচিপ?’ প্রশ্ন আহমদ মুসার। তার কপাল কুঞ্চিত।

‘হ্যাঁ স্যার, আগে একটা সেনাদল গেছে এখন আর একটা সেনাদল উপরে উঠে গেল। এই কিছুক্ষণ আগে। ওদের অফিসারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম ওরা গোটা এই পর্যটন রুটে সারারাত ধরে টহল দেবে। তারা নাকি জানতে পেরেছে পর্বতের এই ঢালে কোথাও নাকি কিছু ঘটতে চলেছে। আর তারা আমাকে বলেছে, আপাতত আপনাদের কোন কাজ নেই। মাউন্ট আরারাত পুলিশ অফিসে আপনারা ফিরে যান। প্রয়োজন হলে আমরা ডাকবো।’ বলল খাল্লিকান খাচিপ।

আহমদ মুসার কপালের কুঞ্চন আরও বেড়ে গেছে। তার মনে চিন্তার ঝড়। এই সেনাদল আবার কারা? এবার কি সত্যিই সেনাদল পাঠানো হয়েছে? না এরাও নকল। মাউন্ট আরারাত সেনা-ব্যবস্থাপনার অধীনে রয়েছে। সেনাবাহিনী পর্বত অঞ্চলের পর্যটন এলাকাসহ সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এজন্যে মাউন্ট আরারাতে সেনাবাহিনীর একটা ঘাঁটি রয়েছে। সেখান থেকে পর্বতের বিভিন্ন অংশে সনাটহল পাঠানো তাদের রুটিন কাজ। মি. খাল্লিকান কথিত সেনাদল সেই রুটিন কাজের অংশও হতে পারে। আবার তা নাও হতে পারে। কিন্তু এসব যাচাইয়ের সুযোগ এই মুহূর্তে নেই।

এসব চিন্তা করে আহমদ মুসা বলল, করে আহমদ মুসা বলল, ‘মি. খাল্লিকান খাচিপ, আপনারা বেজ ক্যাম্প থেকে নড়বেন না। আর দশ পনের জনের একটা পুলিশের দল আপনি উপরে পাঠিয়ে দিন।’

‘কিন্তু ওরা তো বলেছে আমাদের চলে যেতে।’ খাল্লিকান খাচিপ বলল।

‘বলুক। ওটা কোন অফিসিয়াল অর্ডার নয়। বাইদি বাই বলেছে। যাদের উপরে পাঠাবেন তাদের বলে দেবেন, কেউ জিজ্ঞেস করলে তারা যেন বলে, ‘৫ম বেজ ক্যাম্পে চৌদ্দ-পনেরজন ট্যুরিস্ট হঠাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে। তাই উপরের নির্দেশে ওদের রেসক্যু করার জন্যে আমরা যাচ্ছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সংজ্ঞা হারানোর ঘটনা সম্পর্কে যদি তারা কিছু না দেখে?’ জিজ্ঞাসা খাল্লিকান খাচিপের।

‘ঘটনা সত্য। এখানে একটা ঘটনা ঘটেছে। শয়তানরা আমাদের চৌদ্দ জন লোককে সংজ্ঞাহীন করে ফেলেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘মারাত্মক ঘটনা। হ্যাঁ, এটা একটা বিষয়, পুলিশ সেখানে যেতে পারে।’ বলল খাল্লিকান খাচিপ।

‘হ্যাঁ, মারাত্মক ঘটনাই। কিন্তু ওটা নিয়ে এখন পুলিশের করণীয় কিছু নেই। সকালে এমনিতেই ওরা সংজ্ঞা ফিরে পাবে। আপনার লোকরা যেন ওখানে না দাঁড়ায়, সোজা যেন চলে আসে সাড়ে পনের হাজার ফিট উপরের লেভেলে। আর যাদের পাঠাচ্ছেন, তাদের দায়িত্বে যে পুলিশ অফিসার থাকবেন তার মোবাইল নাম্বারটা আমাকে জানিয়ে দেবেন।’ আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা সালাম দিয়ে কল অফ করে দিল।

‘চলুন, ঐ দুই শৃংগের সংযোগকারী দেয়ালে আমরা উঠি। ওখান থেকে আমরা ঐতিহাসিক উপত্যকায় ওরা কী করছে, তা দেখতে পাব এবং আমাদের কিভাবে এগোতে হবে তাও ঠিক করতে পারবো।’ বলল আহমদ মুসা।

‘চলুন। কিন্তু ডিপি মি. খাল্লিকান খাচিপ কী বললেন? মনে হলো ডিপি লোক পাঠাচ্ছেন। কান্তু এত দেরিতে কেন?’ মেন্দারিস মালিক বলল।

‘আরো একটা সেনাদল উপরে উঠেছে এবং তারাই এই রুটের দেখভাল করার কথা বলেছে। তারা পুলিশকে চলে যেতেও বলেছে। তাই ডিপি মি. খাল্লিকান খাচিপ চলে যাবার চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। এখন উনি একদল পুলিশ পাঠাচ্ছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এ সেনাদল আবার কারা? পুলিশকে তারা ডিউটি ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। লক্ষণটা ভালো মনে হচ্ছে না স্যার।’ মেন্দারিস মালিক বলল।

‘আমিও সেটাই ভাবছি মি. মেন্দারিস মালিক। তবে না দেখে তাদের ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। কারণ মাউন্ট আরারাত তো সেনা নিয়ন্ত্রণে। এখানে ওদের স্থায়ী ঘাঁটিও রয়েছে। এটা একটা দিক। অন্য দিকটা হলো, ঘাঁটির সেনাদলের একটা অংশ ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে পারে। এর নিশ্চিত সম্ভাবনাও আছে, একথা আমি আগেই বলেছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘দুই সম্ভাবনাই যদি থাকে, তাহলে খারাপ সম্ভাবনাকেই আমাদের সামনে রাখতে হবে স্যার।’ মেন্দারিস মালিক বলল।

‘ঠিক বলেছেন মি. মেন্দারিস মালিক।’ বলল আহমদ মুসা।

কথা বলার সাথে সাথেই আহমদ মুসা ও মেন্দারিস মালিক উঠছিল সেই পাহাড়ের দেয়ালে।

পাহাড়ে আরোহনটা এখানে বেশ মজার। পাহাড়ের দেয়ালটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে উপরে উঠেছে।

ওঠার গোটা পথটাই ছোট ছোট খুঁটির মত ডজন-ডজন টিলায় ভরা। যেন কোন ধ্বংসাবশেষ ছাড়া।

উঠে গেছে তারা দেয়ালের মাথা অনেকটা চিরুনীর মত অনেক টিলার সমষ্টি।

খুশি হলো আহমদ মুসা। তাদের নিরাপদ আড়াল নেয়ার একটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আল্লাহ্ যেন করে রেখেছেন।

পাশাপাশি দুই টিলার আড়ালে গিয়ে বসল তারা। ওপাশের উপত্যকাটাই হলো ‘আর্ক অব নুহা’ উপত্যকা। তাকাল তারা উপত্যকার দিকে। গোটা উপত্যকা তাদের নজরের আওতায়।

উপত্যকার দিকে চোখ ফেলতেই নজরে পড়ল, তারা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে নিচে বিশ ডিগ্রি কৌণিক অবস্থানে পাহাড়ের গায়ে ঠিক ‘ওয়েল ড্রিলিং’- এর মত আট ইঞ্চি ব্যাসের মেগা সাইজের পাইপ বসানো হয়েছে বরফের বুক চিরে। একটা বড় ইঞ্জিন এই পাইপ বসাতে সাহায্য করছে। ইঞ্জিনটা তখনও চলছে। শব্দ খুবই অস্পষ্ট। বোঝাই যাচ্ছে সাইলেন্সার লাগানো হয়েছে ইঞ্জিনে।

কয়েকটা লম্বা স্ট্যান্ডের সাথে সেট করা টপসাইড ঢাকা কয়েকটা উজ্জল বাল্ব আলোকিত করে রেখেছে উপত্যকার সংশ্লিষ্ট এলাকাটিকে। চারদিকের অমাবস্যার গভীর অন্ধকারের মধ্যে জায়গাটিকে মনে হচ্ছে আলোর দ্বীপ।

দেখা গেল পাইপের মুখে একটা জটিল মেশিন ফিট করা হয়েছে। সেই মেশিন থেকে বেরিয়ে আসা কয়েকটা নল স্ট্যান্ডের উপর রাখা একটা স্ক্রিনের পেছনে সংযুক্ত হয়েছে। কয়েকজন স্ক্রিনটার উপর ঝুঁকে পড়েছে। আহমদ মুসা গভীর মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করছে স্ক্রিনটাকে।

ওদিক থেকে চোখ না ঘুরিয়েই আহমদ মুসা বলল, 'মি. মেন্দারিস মালিক, তেল কোম্পানি ড্রিল করে মেশিন দিয়ে তেল টেনে নেয়, এরা মনে হয় ড্রিল করে স্বর্ণভান্ডার থেকে স্বর্ণ টেনে নিতে চাইছে।'

'কিন্তু স্যার, স্ক্রিনের দিকে ওরা হা করে চেয়ে বসে আছে কেন?' বলল মেন্দারিস মালিক।

'ওরা ড্রিল করে যে পাইপ বসাচ্ছে, তার মাথায় নিশ্চয় একটা সুসংরক্ষিত ক্যামেরা সেট করে রাখা হয়েছে। সেই ক্যামেরা যা কিছু দেখছে তার ছবি পাঠাচ্ছে স্ক্রিনে। ওরা সম্ভবত কথিত স্বর্ণভাণ্ডার যে গুহায় আছে, সে গুহাতেই ড্রিল করার পাইপ বসিয়েছে। এখন তারা কখন স্বর্ণভাণ্ডার দেখতে পাবে, তার অপেক্ষা করছে।' আহমদ মুসা বলল।

'প্রায় দু'শ থেকে তিনশ ফুট গভীর বরফের স্তর এখানে।' বলল মেন্দারিস মালিক।

'দৃশ্যত এটা অসম্ভব। কিন্তু ওদের কাছে কয়েক শতাব্দী আগের একটা ম্যাপ আছে। সে মানচিত্রে হযরত নুহ আ. - এর নৌকার ল্যান্ডিং উপত্যকা এবং তার চারপাশের গুহাগুলো সুস্পষ্টভাবে চিহ্নত আছে। যা দেখে হিসেব-নিকেশ করে বলা যায় কোথায় কোন গুহার অবস্থান। ২শ থেকে তিনশ ফিট নিচে হাজার হাজার বছর থেকে জমে থাকা বরফের নিচে লুকিয়ে থাকা সে গুহার অবস্থান তারা নিশ্চয় বের করেছে।'

‘হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন স্যার। পড়েছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়ার মত দেশের কাছে এমন ক্যামেরা আছে যা দিয়ে আকাশ থেকেও তারা ভূ-গর্ভের কোথায় কী আছে, তার ছবি তুলতে পারে।’ মেন্দারিস মালিক বলল।

আহমদ মুসা দেখতে পেল, হঠাৎ উপত্যকার ওপাশে স্ক্রিনে নজর রাখা লোকজনদের মধ্যে হাসি-আনন্দের একটা হুল্লোড় পড়ে গেল।

‘মি. মেন্দারিস মালিক, ওরা সত্যিই স্বর্ণের দেখা পেয়ে গেছে মনে হয়। এছাড়া তাদের আনন্দের আর কোন কারণ নেই বলে মনে করি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক স্যার। ঐ দেখুন, সবাই ছুটে আসছে স্ক্রিনের দিকে। সবার দৃষ্টি স্ক্রিনে নিবদ্ধ।’ মেন্দারিস মালিক বলল।

‘হ্যাঁ, মি. মেন্দারিস মালিক, স্বর্ণই তারা দেখছে। দেখা যাক এখন তারা কী করে? মি. খাল্লিকান খাচিপের পাঠানো পুলিশ দল না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা দেখল, ওপাশের উপত্যকায় লোকজনদের মধ্যে আনন্দের পাশাপাশি ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেছে। পাইপের কাছে স্ক্রিনটির পাশে আর একটা মেশিন তারা টেনে নিয়ে এল। পাইপটাকে তারা সেট করল পাম্প মেশিনের মত মেশিনটার সাথে। একজন বোতাম টিপে মেশিনটাকে স্টার্ট দিল।

বড় মেশিনটার স্টার্ট নেয়ার গর্জন আহমদ মুসাদেরও কানে এল। তবে সাইলেন্সার লাগানো না থাকলে শব্দটা নিশ্চয় আরও বিকট হতো।

পাম্প মেশিনটার নিচের দিকে একটা রিলেজিং পাইপ রয়েছে। সে পাইপটাকে সেট করা হলো একটা প্লাস্টিক ধরনের বক্সের সাথে। বক্সের টপে পানির ট্যাংকর মত গোল সাইড ওয়ালা একটা হোল রয়েছে। তার সাথেই সেট করা হয়েছে পাইপটাকে।

পাম্প মেশিনটাতে একটা স্ক্রিন রয়েছে। মেশিনটা চালু হবার পর সবার দৃষ্টি আগের স্ক্রিনটার মত এ স্ক্রিনটার উপরও নিবদ্ধ।

পল পল করে গত হলো আরও কিছুটা সময়।

হঠাৎ দ্বিতীয় স্ক্রিনটার দিকে তাকিয়ে মহানন্দে ভীষণ নাচানাচি শুরু করে দিল সবাই। যেন আনন্দে তারা পাগল হয়ে গেছে।

'মি. মেন্দারিস মালিক, স্বর্ণভাণ্ডারে স্বর্ণ দেখার পর এবার তারা স্বর্ণ হাতে পেয়ে গেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'তাদের নাচানাচি দেখে তাই মনে হচ্ছে। আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতই তাদের দশা। কিন্তু স্বর্ণ তারা হাতে পেয়েছে কী করে বুঝা গেল?' বলল মেন্দারিস মালিক।

'পাইপটার সাথে নতুন যে মেশিন সেট করেছে দেখছেন, সেটা ম্যাগনেটিক পুলিং মেশিন। এই পাওয়ার মেশিন যে কোন ধাতব বস্তুকে টেনে তার মধ্যে নিয়ে এসে অন্য একটি রিলিজিং পাইপ দিয়ে বের করে দিতে পারে। কোন ধাতব বস্তু যদি কোথাও লাগানো থাকে কিংবা ধাতব, চামড়া বা কাপড় ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক কোন প্যাকেটে ধাতব কোন বস্তু রাখা থাকে, তাহলে সেগুলোকেও টেনে নিয়ে আসতে পারে। আর এই ম্যাগনেটিক পুলিং মেশিনে যে আরেকটা স্ক্রিন দেখছেন, সেটা দিয়ে দেখা যায় মেশিনটি কিভাবে পুল করে নিয়ে আসছে। আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হলো, পাইপটিকে যে গুহা-মুখে সেট করা হয়েছে, সে পাইপের মাধ্যমেই গুহার স্বর্ণভাণ্ডার থেকে ম্যাগনেটিক পুলিং মেশিনটি স্বর্ণ টেনে নিয়ে আসছে। আর সেই মেশিনের মাধ্যমে এসে প্লাস্টিকের বক্সটায় জমা হচ্ছে।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে নুহ আ. - এর স্বর্ণভাণ্ডারের কথা সত্য হল? সত্য হলো হাজার হাজার বছরের লোককথা।' মেন্দারিস মালিক বলল।

'ভুল বলছেন। এই স্বর্ণভাণ্ডার নুহ আ.-এর নৌকায় তোলা এবং নামানো যদি সত্য হয়েও থাকে, তাহলেও এই স্বর্ণভাণ্ডার হযরত নুহ আ.-এর নয়। তিনি এই স্বর্ণভাণ্ডার নৌকায় তুলেছিলেন এবং নামিয়েও ছিলেন তিনিই। যেহেতু প্রার্থনাগৃহটি প্লাবনে ধ্বংস হয়েছিল তাই সেই স্বর্ণের সাথে হযরত নুহ আ.-এর সম্পর্ক ছিল এ কথা কোথাও বলা হয়নি।' নৌকায় কোন অজৈব সম্পদ নুহ আ. তোলেননি। আল্লাহ্'র নির্দেশক্রমে তিনি নৌকায় তুলেছিলেন প্রত্যেক জীব-প্রজাতির এক একটি জোড়া। এরাই দুনিয়ার সম্পদ। কারণ দুনিয়াকে আবাদ করে

এরাই। আর তখন এদেরই সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল। দুনিয়ার মেটালিক বা অন্য কোন সম্পদের সংরক্ষণের প্রয়োজন তখন ছিল না। তাই সে ধরনের কিছু নৌকায় তোলার প্রশ্নই ওঠেনি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে নৌকায় অন্য কেউ মেটালিক সম্পদ তুলে থাকতে পারেন। ঐ স্বর্ণভাণ্ডার হয়তো ঐ ধরনের একটা সম্পদ।’ মেন্দারিস মালিক বলল।

‘বলা হয়, কিন্তু এর সত্যতার কোন প্রমাণ নেই। সত্য না হওয়াটাই যৌক্তিক।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু আমরা দেখছি ঐ তো স্বর্ণ গুহা থেকে বের হচ্ছে। এটা তো চাক্ষুস সত্য।’ মেন্দারিস মালিক বলল।

‘এই চাক্ষুস সত্য কিন্তু প্রমাণ করে না যে, এই স্বর্ণভাণ্ডার হযরত নুহ আ. এর নৌকায় উঠেছিল এবং তা থেকে নামিয়ে এই গুহায় রাখা হয়েছিল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘স্বর্ণভাণ্ডার তাহলে কোত্থেকে এল তার তো একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা দরকার।’ মেন্দারিস মালিক বলল।

‘সেকালে লুণ্ঠিত সম্পদ এভাবে নিরাপদ গুহায় লুকিয়ে রাখা হতো। আবার নানা কারণে উপাসনা গৃহের সম্পদও পাহাড়ের কোন নিরাপদ গুহায় গচ্ছিত রাখতো উপাসনাগৃহের প্রধানরা। মাউন্ট আরারাতের দুর্গম গুহাগুলো উপাসনা গৃহের পবিত্র সম্পদ গচ্ছিত রাখার উপযুক্ত জায়গা ছিল। এ গুহার স্বর্ণভাণ্ডারের ক্ষেত্রেও এ ধরনের কিছু ঘটে থাকতে পারে। আমার মনে হয়, এ স্বর্ণভাণ্ডারকে হযরত নুহ আ.-এর সাথে এবং তাঁর নৌকার সাথে যুক্ত করেছিল এই কারণে যে, লোকেরা যাতে এই সম্পদকে পবিত্র মনে করে, ভয় ও শ্রদ্ধা করে এবং এই সম্পদের দিকে হাত বাড়াতে সাহস না পায়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনার এই ব্যাখ্যাই ঠিক স্যার। এমন চিন্তা আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত। এ ধরনের সম্পদে হাত দেয়াকে মানুল অপরাধ জ্ঞন করে।’ মেন্দারিস মালিক বলল।

আহমদ মুসাদের এই আলাপ আর এগোল না।

পেছনে অনেকগুলো পায়ের শব্দে দু'জনেই চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকাল। না, পায়ের শব্দ ঠিক পেছনে নয়, যে পর্যটন রুট থেকে তারা এখানে উঠে এসেছে, সেই রুট থেকেই শব্দগুলো ভেসে আসছে। নিঃশব্দ পরিবেশ হওয়ার কারণেই শব্দগুলো দূরে হলেও কানে এসে বাজছে।

'আবার এক সেনাদল মি. মেন্দারিস মালিক। সংখ্যা আগের চেয়েও মনে হয় বেশি হবে।' লোকদের দেখে বলল আহমদ মুসা।

'এরা কি সেই সেনাদল যাদের কথা ডিপি মি. খাল্লিকান খাচিপ বলেছিলেন?' মেন্দারিস মালিক বলল।

'তাই হবে। তবে এরা সেনাবাহিনীর লোক নয়। এ ধরনের যৌথ অভিযানে এবং পার্বত্য পথে সেনাদলরা যেভাবে পথ চলে, এদের হাঁটার ধরন তার ধারে কাছেও নয়।' বলল আহমদ মুসা।

'তার মানে এরা প্রথমে যাওয়া সেনাদলেরই অংশ। আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটি গ্রুপ। দু'টি ভূয়া সেনা গ্রুপ। আর একটি গ্রুপ ক্রুসের সাথে গলায় মাউন্ট আরারাতের প্রতীক পরা। একটা গ্রুপ সেনাবাহিনীর পোষাক ছাড়া হলো কেন? সেনা পোষাক পরে ক্যামোফ্লোজ করা ওদের যে কৌশল, তার সাথে এই গ্রুপের অবস্থান তো মিলে না।' মেন্দারিস মালিক বলল।

'ঠিকই মেন্দারিস মালিক, হিসাব মিলে না। হতে পারে ওদেরকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে পরিকল্পনা ছাড়াই আনা হয়েছে। তাই ওদের বোধ হয় সামরিক পোষাক পরানো যায়নি।' বলল আহমদ মুসা।

'ওরা তো সবাই এসে গেল। আমাদের পুলিশরা কখন আসবে?' মেন্দারিস মালিক বলল।

'জানি না কোন বেজ ক্যাম্প থেকে ওরা আসছে! কী করা যাবে, অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।' বলল আহমদ মুসা।

সেনা দলটি ডান পাশের শৃংগের পাদদেশ ধরে বাঁকের দিকে চলে গেছে অনেকক্ষণ।

আহমদ মুসারা ঘুরল উপত্যকার দিকে আবার। উপত্যকায় তখন সে একই দৃশ্য। ম্যাগনেটিক পুলিং মেশিন চলছি।

প্লাস্টিকের বড় বাক্সটি ভরছে গুহার স্বর্ণভাণ্ডার থেকে উঠে আসা স্বর্ণে।

সবার চোখ ম্যাগনেটিক পুলিং মেশিনের স্ক্রিনের দিকে। স্বর্ণভণ্ডার থেকে কি সব বিচিত্র রূপের স্বর্ণ উঠে আসছে তাই দেখছে সবাই।

হঠাৎ ব্রাশফায়ারের শব্দে চারদিকের জমাট নিস্তব্ধতা ভেঙে পড়ল।

অনেকগুলো স্টেনগানের সম্মিলিত ব্রাশ ফায়ারের জমাট শব্দ।

কিছুই বুঝতে পারল না আহমদ মুসা। শুধু বিস্ময়ের সাথে দেখল আলোচিত স্থানটুকুতে যেখানে স্বর্ণ উত্তলন চলছে, এবং যারা কাজ করছিল তারা সবাই একে একে গুলিবিদ্ধ হয়ে ভূমিশয্যা নিয়েছে। ওরা সবাই রিল্যাক্স মুডে ছিল। কারও হাতেই ছিল না অস্ত্র। আকস্মিক আক্রমণের অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে ওরা। আক্রমণ এতটাই আকস্মিক ও ব্যাপক ছিল যে গুলিবৃষ্টি এড়িয়ে শেল্টার নেবারও সুযোগ কেউ পায়নি।

মেশিন তখন চলছে। স্বর্ণ ভাণ্ডার থেকে স্বর্ণ তাখনও উঠে আসছে।

কারা ওদের আক্রমণ করল? এটা কি ওদের নিজেদের মধ্যে স্বর্ণভাণ্ডার দখলের লড়াই? গুলিবৃষ্টি তখনও চলছে।

গুলি করতে করতেই একদল লোক অন্ধকার থেকে আলোতে গিয়ে প্রবেশ করল।

দেখেই আহমদ মুসারা বুঝল এরাই গলায় মাউন্ট আরারাতের প্রতীক পরা সেই লোকগুলো। আহমদ মুসা ভাবল, সেনা-পোষাক পরা লোকদের থেকে কি এরা তাহলে আলাদা?

ঐ উপত্যকায় যা ঘটতে লাগল তা দেখে আহমদ মুসাকে তার চিন্তা আর এগিয়ে নিতে হলো না।

গলায় মাউন্ট আরারাতের প্রতীকধারী লোকরা আলোকিত এলাকায় প্রবেশ করে কেউ বেঁচে নেই দেখার পর গুলি করা বন্ধ করে দিল। তারপর তারা ভাঙতে শুরু করল মেশিনপত্রসহ সবকিছু। তারা প্রথমে ভাঙল জেনারেটর। ম্যাগনেটিক পুলিং মেশিনটি স্বর্ণ উত্তোলনকারী পাইপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভেঙে ফেলল। ভেঙে ফেলল ড্রিলিং মেশিনও। স্বর্ণ জমা হওয়া প্লাস্টিক কনটেইনার থেকে ম্যাগনেটিক পুলিং মেশিনের পাইপ খুলে ফেলেছিল। এবার কয়েকজনে মিলে

প্লাস্টিক বক্স ধরে যে পাইপ দিয়ে স্বর্ণ ঢালা হয়ে গেলে তারা প্লাস্টিক কনটেইনারটিকেও ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলল। সবশেষে তারা পাইপের মধ্যে টাইম ডিনামাইট ঢুকিয়ে তাতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সব চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দিল এবং উলট-পালট করে দিল ভেতরের গঠনকেও। এই সব কাজ শেষ করতে পঁচিশ-তিরিশ মিনিটের বেশি সময় লাগল না।

সব শেষ করে তারা সবাই হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনায় বসল। দু'হাত তুলে তারা প্রার্থনা করতে লাগল। আহমদ মুসাদের মনে এবার বিস্ময়ের পালা।

আবার শুরু হলো ব্রাশ ফায়ার। অনেক স্টেনগানের সম্মিলিত ব্রাশফায়ার ছুটে এল অন্ধকারের বুক চিরে। প্রার্থনারত সবাইকে এক সাথে পেয়ে গেল গুলির ঝাঁক।

গুলি খেয়ে সবাই উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল। ওদের সবারই কাঁধে ঝুলানো ছিল স্টেনগান। প্রার্থনার আগে স্টেনগান কাঁধে রেখেই তারা সবকিছু ভাঙচুর করেছে। প্রার্থনার সময়ও স্টনগান ছিল তাদের কাঁধে। উপুড় হয়ে পড়ে গিয়ে তারা সবাই নিঃসাড় হয়ে গিয়েছিল।

আক্রমণকারীদের গুলি চলছিল তখনও। কিন্তু গুলিগুলো ছিল বৃথাই।

মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকদের উপর তা কোনই ক্রিয়া করছিল না। কেউ বেঁচে নেই নিশ্চিত হয়ে আক্রমণকারীরা অন্ধকার থেকে আলোতে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা দেখল ওদের পরনে সেনা পোষাক। বুঝল আহমদ মুসারা, এ সেনাদলই তাদের সামনে দিয়ে সবশেষে উপত্যকায় প্রবেশ করেছে।

সেনা-পোষাকের লোকরা প্রথমেই এগোচ্ছিল গুলি খেয়ে শেষ হয়ে যাওয়া লোকদের দিকে। তাদের লক্ষ্য সম্ভবতঃ ছিল এটা দেখা যে, ওরা কারা এবং কারা এই সর্বনাশ করল।

আক্রমণকারীরা লোকদের কাছাকাছি পৌঁছার সাথে সাথেই মৃতদের মধ্যে থেকে কয়েকজন তড়াক করে পাশ ফিরে শুয়ে থেকেই গুলি করতে লাগল আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করে। তাদের গুলি অবিরাম চলল।

দাঁড়িয়ে অগ্রসরমান আক্রমণকারীরা তাদের স্টেনগান তোলা কিংবা শুয়ে পড়া কিংবা কোন কিছুর আড়াল নেবারও সুযোগ পেল না। পয়েন্ট ব্লাংক গুলিবৃষ্টির মুখে পড়ে দাঁড়ানো অবস্থাতেই মুহূর্তের মধ্যে তাদের দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

গোড়া কাটা গাছের মত ওরা পড়ে গেল মাটিতে।

যারা এদের গুলি করেছিল, সেই চারজন উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু দাঁড়িয়েই আবার পড়ে গেল। সবই দেখছিল আহমদ মুসারা।

'স্যার, এমন জীবন্ত ফিল্ম দেখতে পারব কোনদিন ভাবিনি। অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। কে কার শত্রু, কেন শত্রু কিছুই বুঝলাম না স্যার।' বলল মেন্দারিস মালিক।

'ঠিক বলেছেন মেন্দারিস। একটা বিস্ময়কর দৃশ্য দেখলাম আমরা আজ। সেনা পোষাকধারীরা এক পক্ষ, এটা এখন পরিষ্কার। কিন্তু গলায় মাউন্ট আরারাতের প্রতীক ধারণকারীরা কারা? সোনা ভাগাভাগি, কিংবা সোনা কুক্ষিগত করার ঝগড়া এটা নয়। দেখাই তো গেল, স্বর্ণের প্রতি কোন লোভ তাদের নেই। যে পরিমাণ স্বর্ণ তোলা হয়েছিল, সেগুলো তারা আবার ফেরত পাঠিয়েছে পাইপ দিয়ে নিচে। তারপর তারা বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শুধু দিয়েছে, যাতে ঐ পথে পাইপ বসানো আর সম্ভব না হয়। কে এরা। কেন এমনটা করল সেটাই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে না।' আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চলুন, ছুটতে হবে এবার উপত্যকায়। আহত তিনজনকে বাঁচাতে হবে। আমাদের পুলিশ দলের জন্যে অপেক্ষা করার আর প্রয়োজন নেই।'

উঠে দাঁড়াল মেন্দারিস মালিকও। বলল, 'হ্যাঁ, ঐ তিনজন বোধ হয় সিরিয়াসলি আহত। প্রতিপক্ষদের হত্যা করে এরা প্রতিশোধ নিতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু তারা উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেও পারেনি।'

'আল্লাহ ওদের বাঁচিয়ে রাখুন। বাঁচা ওদের দরকার। ওরা সেনা পোষাক পরে আসা দলটির বিরোধী পক্ষের, মানে ওরা মিহরান মুসেগ মাসিসদের 'সোহা' গ্রুপ ও ভারদান বুরাগদের 'হোলি আর্ক' গ্রুপের বিরোধী। এদের কাছ থেকে

সন্ত্রাসী ঐ সংগঠন দু'টোর ষড়যন্ত্রের কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

চলতে শুরু করেছে আহমদ মুসা। মেন্দারিস মালিকও আহমদ মুসার পেছনে হাঁটা শুরু করে বলল, 'স্যার, আমার মনে হচ্ছে এরা খ্রীস্টানদের

কোন আলট্রা ধর্মীয় গ্রুপ। এরা দারুণ সংরক্ষণবাদী। কোন ধর্মীয় প্রতীক, ধর্মীয় স্থান ইত্যাদির সামান্য নড়চড়েরও এরা পক্ষপাতি নয়। আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, জর্জিয় ও তুরস্কে এদের সংখ্যা কম নয়।'

'হ্যাঁ, এরকম গ্রুপ আছে। বিপজ্জনক হয়ে থাকে এরা। সন্ত্রাসীরা স্বার্থের জন্যে সন্ত্রাস করে। কিন্তু এরা এদের অন্ধ, মনগড়া ধর্মাচারের জন্যে হাসতে হাসতে জীবন দিতে পারে। এদের অন্ধ চরমপন্থা সত্যিই ভয়ংকর।' আহমদ মুসা বলল।

'আমাদের মুসলমানদের মধ্যেও তো এ রকম কিছু গ্রুপ আছে।' বলল মেন্দারিস মালিক।

'আল্লাহ্'র কুরআন ও রসূলুল্লাহ্ স:-এর যে শিক্ষা তাতে মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের চরমপন্থী গ্রুপের উত্থান অসম্ভব। ইসলাম নীতি ও কর্মপন্থার দিক থেকে মধ্যম পন্থার ধর্ম। কিন্তু অনেক সময়ই বাইরের ষড়যন্ত্র এবং অন্ধ ও মনগড়া বিশ্বাসের দ্বারা তাড়িত বিভিন্ন গ্রুপের সৃষ্টি হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে। চতুর্থ খলিফা হযরত 'আলী রা.-এর শাসন যুগে খারেজী সম্প্র'দায়সহ এ ধরনের কিছু ফেৎনার আবির্ভাব ঘটে। এ ধরনের ফেৎনা এখনও আছে, যারা বিভিন্ন পরিভাষা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করতে চাচ্ছে। ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র এদের পেছনে রয়েছে। তবে এই গ্রুপ কখনই ইসলামের মূলধারায় প্রবেশ করতে পারেনি। এদের অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ীও হয়নি। এর কারণ আল্লাহর কুরআন, রসূলল্লাহ স.-এর জীবন মানে হাদীস অবিকৃত অবস্থায় আমাদের সামনে রয়েছে। সত্যের এই তেজই সব ফেৎনাকে অবশেষে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়।' থামল আহমদ মুসা।

'আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া স্যার। এই সুযোগ কিন্তু খৃষ্টান ও ইহুদিদের নেই'। বলল মেন্দারিস মালিক।

‘কারণ তাদের ধর্মগ্রন্থ অবিকৃত নেই এবং তাদের ধর্মগুরুদের জীবন ও কর্মও তাদের সামনে অবিকৃত অবস্থায় নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, ‘আমরা উপত্যকায় প্রবেশ করেছি মি. মেন্দারিস মালিক।’

‘ওরা সবই ধ্বংস করেছে, কিন্তু লাইটগুলো জ্বলছে কেন স্যার?’ বলল মেন্দারিস মালিক।

‘কারণ লাইটগুলো ব্যাটারি চালিত। জেনারেটরের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

যতটা সম্ভব দ্রুত হাঁটছে আহমদ মুসারা। যেখানে সম্ভব ডবল মার্চও করছে। বরফের সমুদ্রে না থাকলে ঘামে তাদের গোসল হয়ে যেত।

অল্পক্ষণের মধ্যে তারা আলোর প্রান্তসীমায় পৌছে গেল।

‘মেন্দারিস মালিক, তোমার স্টেনগান প্রস্তুত রাখ, আমরা যেন সেনা সদস্যদের মত বোকা না বনি।’

নিজের মেশিন রিভলভারটা হাতে নিতে নিতে বলল আহমদ মুসা।

অন্ধকার থেকে আলোর এলাকায় প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

তাদের দেখতে পেয়েছে আহত সেই তিনজন লোক।

অত্যন্ত ক্ষীপ্র লোকগুলো।

দেখতে পেয়েই তারা তাদের স্টেনগান তুলে নিয়েছে।

একেবারেই বেপরোয়া লোকগুলো। আহমদ মুসাদের রিভলভার ও স্টেনগান যে তাদের দিকে তাক করে রাখা হয়েছে, সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই।

বিদ্যুতবেগে তাদের স্টেনগানের নল উঠে আসছে আহমদ মুসাদের লক্ষ্যে।

ওদের থামানোর আর কোন উপায় ছিল না। আহমদ মুসার রিভলভার চোখের পলকে তিনবার অগ্নিবৃষ্টি করল। তিনটি গুলি বেরিয়ে তিনজনের কারো কব্জিতে, কারো বাহুতে গিয়ে বিদ্ধ হলো। স্টেনগান পড়ে গেল ওদের হাত থেকে।

আহমদ মুসা রিভলভার বাগিয়েই দ্রুত এগুলো তাদের দিকে। বলল, ‘আমরা আপনাদের শত্রু নই। যারা সোনা তুলতে এসেছিল, আমরা তাদের লোক নই। সোনার প্রতি আমাদের কোন লোভও নেই। পাশের পাহাড়ের উপর থেকে আমরা আপনাদের লড়াই দেখেছি। আপনাদের আহত হতে দেখে আপনাদের সাহায্যের জন্যে আমরা এসেছি। আপনাদের থামানোর আর কোন পথ ছিল না বলেই আত্মরক্ষার জন্যে আমি আপনাদের হাতে গুলি করতে বাধ্য হয়েছি। মারতে চাইলে আমি আপনাদের বুকে, মাথায় গুলি করতে পারতাম।’

বলে আহমদ মুসা হাতের রিভলভার পকেটে রেখে তাদের দিকে এগোলো।

মেন্দারিস মালিকও তার হাতের স্টেনগান কাঁধে ঝুলিয়েছে।

আহত তিনজনও শান্তভাবে শুয়ে পড়েছে।

আহত তিনজনের মধ্যে দুইজনের দুই উরুই গুলিবিদ্ধ। আরেকজনের লেগেছে পাঁজরে গুলি।

তখনও রক্তক্ষরণ হচ্ছে তাদের আহত স্থান থেকে।

‘অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে। রক্তক্ষরণ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। আমি চেষ্টা করব, আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।’ আহতদের লক্ষ্যে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা তার পিঠে ঝুলানো ব্যাগ নামিয়ে তার ভেতর থেকে অনেকগুলো প্রি-মেডিকেল ব্যান্ডেজ বের করে নিল।

এই প্রি-মেডিকেল ব্যান্ডেজ রক্তক্ষরণ বন্ধে কার্যকর। একই সাথে এটা ব্যান্ডেজ ও রক্তরোধক ঔষধও। এই ব্যান্ডেজ আহতস্থান থেকে অতিসহজে খুলে নেয়া যায়।

আহমদ মুসা অভিজ্ঞ ডাক্তরের মত সবার সব আহত স্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

আহতদের একজন বলল, ‘আপনি দেখছি ডাক্তার। কিন্তু গুলি করা দেখে মনে হয়েছিল আপনি একজন অতিদক্ষ বন্দুকবাজ।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আমি প্রফেশনাল ডাক্তার নই, প্রফেশনাল বন্দুকবাজও নই। আমি একজন সচেতন মানুষ।'

বলেই পকেট থেকে মোবাইল বের করল আহমদ মুসা। কল করল যে পুলিশদের এখানে আসার কথা ছিল তাদের চীফকে।

পুলিশ অফিসার তার কলে সাড়া দিয়ে বলল, 'স্যার, আমরা সাড়ে ১৫ হাজার ফিট লেভেলে পৌঁছে গেছি।'

আহমদ মুসা তাকে ধন্যবদ দিয়ে 'আর্ক অব নুহা' উপত্যকায় আসতে বলল এবং জানল, উপত্যকায় গুরুতর আহত তিনজন লোক রয়েছে। তাদের দ্রুত বেজ ক্যাম্পের হাসপাতালে নিতে হবে।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই আহতদের একজন বলল, 'আপনাদের সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ। আপনারা কে জানতে পারি কি?'

'বলেছি আমরা আপনাদের শক্রদের সাথের লোক নই। আপনাদের সাথেও আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমরা পুলিশও নই। তবে আমি পুলিশকে ডেকেছে। আপনাদের বেজ ক্যাম্প-১ এ নিয়ে যাবার জন্যে তাদের সাহায্য দরকার।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে আপনারা কে, সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি।' বলল আহতদের সেই লোকটিই।

'আমরা আপনাদের শুভাকাংখী। এটুকু পরিচয়ই থাক। পরে আলোচনা হবে।' বলল আহমদ মুসা।

তাদের কথা বলার আর সুযোগ না দিয়েই আহমদ মুসা চারিকের লাশগুলোর দিকে নজর দিল। পা বাড়াল ঘুরে দেখার জন্যে।

তার পাশে হাঁটছিল মেন্দারিস মালিকও।

'সেনা পোষাক পরা লাশগুলোকে দেখুন মি. মেন্দারিস মালিক, কাউকে চিনতে পারেন কিনা। তবে ওদের সার্চ করে লাভ নেই। তাদর নকল সেনা পোষাক তাদের প্রকৃত পরিচয়ের কিছুই রাখেনি, সেটা নিশ্চিত।' আহমদ মুসা বলল।

দু'জনেই ঘুরতে লাগল এক লাশ থেকে অন্য লাশের কাছে।

একটি লাশের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল মেন্দারিস মালিক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে দেখল লাশের মুখটাকে। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'স্যার, একে বোধ হয় আমি চিনতে পেরেছি। ইনি 'হোলি আর্ক গ্রুপ'- এর আরিয়াস অঞ্চলের প্রধান- ভারদান বুরাগ। লেক ভ্যান তীরের একটা ঘটনায় এই সংগঠনের প্রধান ওরান্তু নিহত হওয়ার পর ইনিই 'হোলি আর্ক গ্রুপ'- এর দায়িত্ব পেয়েছিলেন।'

আহমদ মুসার মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেও দেখল লাশটার চেহারা। বলল, 'আপনি ভালো করে চেনেন একে?'

'ভালো করেই চিনি। একটি মিটিং-এ ওরান্তু ওরারতু'র সাথে একদিন কথা হচ্ছিল। সে সময় ইনি তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। ওরান্তু ওরারতু তাকে ভারদান বুরাগ সম্বোধন করে তাঁর সাথে বসা আরেক জনের সাথে ভারদান বুরাগকে পরিচয় করে দিয়ে তাকে আরিয়াস অঞ্চলের প্রধান বলেছিল। একবার দেখলেও ভারদান বুরাগের চেহারা আমার মনে আছে।' মেন্দারিস মালিক বলল।

'ধন্যবাদ আপনাকে আপনার স্মরণশক্তির জন্যে মি. মেন্দারিস মালিক। আল্লাহ্'র হাজার শোকর যে আমাদের এক শত্রুকে আমাদের পথ থেকে তিনি সরিয়ে দিয়েছেন। উনি তো নেতা, দেখুন মি. মেন্দারিস মালিক, ওর পকেটে ওর মোবাইলটা পাওয়া যায় কিনা।' বলল আহমদ মুসা।

সংগে সংগেই মেন্দারিস মালিক ভারদান বুরাগের পকেট সার্চ করল। পেল একটা মোবাইল। মোবাইলটি সে তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

মোবাইলটি হাতে নিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'মোবাইলটা কাজে দিতে পারে।'

পুলিশের বাঁশির আওয়াজ পেল আহমদ মসা। বাঁশির আওয়াজটা এল 'আর্ক অব নুহা' উপত্যকার ওপ্রান্ত থেকে।

'পুলিশ দল এসে গেছে।' বলল আহমদ মুসা।

মাউন্ট আরারাতের বেজ ক্যাম্প-১ এর একমাত্র সরকররী হাসপাতালের ভিআইপি বেডে শুয়ে ফাদার আনতু আরামেহ। কথা বলছিল সে আহমদ মুসার সাথে।

ফাদার আনতু আরামেহ মাউন্ট আরারাতের সাড়ে পনের হাজার ফিট উপরে 'আর্ক অব নুহা' উপত্যকা থেকে উদ্ধার করে আনা তিনজন আহতের একজন।

গলায় মাউন্ট আরারাতের প্রতীক পরা যারা 'আর্ক অব নুহা' উপত্যকায় সেনা পোষাক পরা ভারদান বুরাগ ও তার বাহিনীকে হত্যা করে স্বর্ণভাণ্ডারের স্বর্ণ দখল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল, ফাদার আনতু আরামেহ সেই দলের নেতা।

আহমদ মুসার কাছে ফাদার আনতু আরামেহ অকপটে স্বীকার করেছে যে সে আর্মেনিয়ার নাগরিক। বহুদিন সে বাস করছে ইজদিরে। ইজদিরের সেন্ট মেরী গীর্জার সে প্রধান পুরোহিত।

এ সব দিয়েই আহমদ মুসার সাথে শুরু হয়েছিল তার কথা।

ফাদার আনতু আরামেহ গীর্জার প্রধান পুরোহিত জেনে আহমদ মুসা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'একজন শান্তিপ্রিয় ফাদার হয়ে 'আর্ক অব নুহা' উপত্যকার খুনোখুনির মত ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়লেন কিভাবে? আপনার সাথের লোকরাই বা কারা? গীর্জার লোক এরা নিশ্চয় নয়।'

'না এরা গীর্জার লোক নয়। 'আর্মি অব ট্রিনিটি' নামে একটা সংগঠন আছে। ঈশ্বর যিশু ও মেরীর স্বার্থ রক্ষায় উৎসর্গিত এরা। ঈশ্বর যিশু ও মেরীর জন্যে এরা জীবন দিতে প্রস্তুত। গীর্জার ফাদার হিসাবে এরা আমারও ভক্ত। আমি যখন জানতে পারলাম প্রভূ নূহের নৌকার গচ্ছিত স্বর্ণভাণ্ডা অপহরণের চেষ্টা করা হচ্ছে, তখনই আমি খোঁজ-খবর নেয়া শুরু করি। সব তথ্য যোগাড়ের পর আমি নিশ্চিত হলাম 'হোলি আর্ক গ্রুপ' ও 'সোহা' নামের দু'টি সন্ত্রাসী ও রাজনৈতিক সংগঠন নিছক ব্যক্তিগত ও গ্রুপ স্বার্থে প্রভূ নূহরে স্বর্ণভাণ্ডার আত্মসাৎ করতে চাচ্ছে। প্রভূ নূহের স্বর্ণভাণ্ডার মানে ঈশ্বরের স্বর্ণভাণ্ডার। এ স্বর্ণভাণ্ডার রক্ষা করা প্রতিটি ধর্মভীরু মানুষের দায়িত্ব। আমি 'আর্মি অব ট্রিনিটি'- কে বিষয়টা জানালাম। শুনেই তারা ক্ষীপ্ত হয়ে উঠল। তারা শপথ নিল ঈশ্বরের এ সম্পদ রক্ষায় তারা জীবন দিতে

প্রস্তুত। আমার সাথে ‘আর্ক অব নূহা’য় এরাই এসেছিল। জীবনও তারা দিয়েছে, কিন্তু রক্ষা করেছে ঈশ্বরের সম্পদ।’ থামল ফাদার আনতু আরামেহ।

‘ফাদার, আপনি ‘সোহা’ ও ‘হোলি আর্ক গ্রুপ’-কে রাজনৈতিক ও সন্ত্রিসী সংগঠন বললেন। আসলে ওরা কারা?’ আহমদ মুসা বলল।

‘হ্যাঁ, সোহা পুরোপুরি রাজনৈতিক সংগঠন। আর ‘হোলি আর্ক গ্রুপ’ একটি নিরেট সন্ত্রাসী সংগঠন। যে কোন উপায়ে যে কোন পথে অর্থ সম্পদের পাহাড় সৃষ্টি করা তাদের লক্ষ্য। প্রভু নূহের স্বর্ণভাণ্ডারেও অবশেষে তারা হাত দিয়েছে।’ বলল ফাদার আনতু আরামেহ।

‘কিন্তু একটি রাজনৈতিক এ একটি সন্ত্রাসী সংগঠনের মধ্যে এই মিলন হলো কী করে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘দুই গ্রুপ দুই উদ্দেশ্যে একে অপরকে ব্যবহার করছে। ‘হোলি আর্ক’ গ্রুপ টাকা দিয়ে ‘সোহা’র সমর্থন কিনে নিয়েছে যাতে তাদের পক্ষে প্রভু নূহের স্বর্ণভাণ্ডার লুট করা সহজ হয়। ‘সোহা’ গ্রুপের ব্যপক প্রভাব রয়েছে পূর্ব আনাতোলিয়অর পুলিশ ও সেনা দলের উপর। মাউন্ট আরারাতে প্রভু নূহের স্বর্ণভাণ্ডার লুটের জন্য পুলিশ ও সেনাদলের সাহায্য দরকার। কোটি কোটি ডলার খরচ করে ‘সোহা’র মাধ্যমে এদের সাহায্য পেতে চেয়েছে তারা এবং সেটা তারা পেয়েছে। অন্যদিকে ‘সোহা’ চেয়েছে ‘হোলি আর্ক গ্রুপ’- এর টাকায় পূর্ব আনাতোলিয়ায় তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে। তা তারা করেও ফেলেছে।’ বলল ফাদার আনতু আরামেহ।

‘সোহা’র এই রাজনৈতিক স্বার্থ কি ফাদার?’ আহমদ মুসা বলল।

প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ফাদার আনতু আরামেহ। বলল, ‘বিষয়টা বললে আমার গায়েও কালো দাগ পড়ে। কিন্তু তবু আমি বলব। কারণ, আমি আমার ধর্মের পক্ষে ও ন্যায়ের পক্ষে। কোন গোষ্ঠীগত বা জাতিগত ইগো অথবা আবেগের শৃংখলে বন্দী আমি নই।’

একটু থামল ফাদার আনতু আরামেহ। তারপর বলল, ‘তারা পূর্ব আনাতোলিয়া, বিশেষ করে এর মাউন্ট আরারাত অঞ্চলকে তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় এবং একে আর্মেনিয়ার অংশ বানাতে চায়। এক সময় ভ্যান পর্যন্ত গোটা

পূর্ব আনাতোলিয়া আর্মেনিয়ার অংশ ছিল, তারও আগে এই অঞ্চল ছিল একটা খ্রীস্টান সাম্রাজ্য। তারা এই সাম্রাজ্য আবার ফিরে পেতে চায় এবং আর্মেনিয়াকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে তারা বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়তে চায়।'

'আপনি বললেন বিষয়টি আপনার গায়েও কালো দাগ লাগায়। মানে আপনিও এর অন্তর্ভুক্ত, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আপনার নিজস্ব কোন ভাবনা আছে কিনা?' আহমদ মুসা বলল।

'আমার কথা, আমি আগেই বলেছি যে আমি ন্যায়ের পক্ষে। জাতিগত ইগো ও আবেগের হাতে আমি বন্দী নই। তাদের কথায় আবেগ ও ইগো দুইই আছে, কিন্তু যুক্তি নেই। ইহুদিরা যে অমূলক ও অন্যায়ভাবে ফিলিস্তিনে এসেছে এবং একটি রাষ্ট্র বাগিয়েছে, হোলি আর্ক গ্রুপদের দাবীও ঠিক এটা। এই দাবী সভ্যতা ও মানব ইতিহাসের ধারার বিরোধী। এ দাবী মেনে নিলে আমেরিকানদেরকে আমেরিকা, অস্ট্রেলীয়দের অস্ট্রেলিয়া এবং হিন্দু আর্যদেরকে ছাড়তে হবে ভারতবর্ষ। এভাবে কোন দেশই অক্ষত থাকবে না। সুতরাং এই ধরনের দাবী একটা পাগলামি। সেই পাগলামিই করছে 'হোলি আর্ক গ্রুপ' ও 'সোহা'।' বলল ফাদার আনতু আরামেহ।

'ফাদার, আপনি বললেন, 'সোহা'রা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। সম্পন্ন করে ফেলা তাদের সেই ষড়যন্ত্র বা কাজটা কী?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'এ ব্যাপারে আমার কাছে কোন স্পেসিফিক ইনফরমেশন নেই। আমার ঐ কথা বলার কারণ হলো, ইদানিং তাদের নেতারা বলে বেড়াচ্ছে যে, আর মাত্র কয়েকদিন, এরপর আমাদের দিন আসছে। আমাদের রাজ কায়েম হবে। আর্মেনিয়ার সাথে এই অঞ্চলের দূরত্ব আর থাকবে না। ইয়েরেভেন হবে আমাদের রাজধানী, আর মাউন্ট আরারাত হবে আমাদের তীর্থকেন্দ্র। এসব কথা থেকে আই বুঝেছি, তাদের প্রস্তুতি শেষ, শুধু ফল প্রকাশটাই বাকি। তাছাড়া আমি জেনেছি, তারা গত কিছু দিন ধরে বিশেষ শ্রেণীর বা তাদের পছন্দমত লোকদের সাথে ডোর-টু-ডোর যোগাযোগ করছে। সব ক্রিমিনাল গ্রুপের সাথেও তাদের যোগাযোগ হয়েছে। টাকা দিয়ে তারা তাদের বশ করে ফেলেছে। কিন্তু তারা কী করতে চায়,

ষড়যন্ত্র কী ধরনের, এত আয়োজন কিসের জন্যে, সেটা আমি জানতে পারিনি। তবে আমার গীর্জায় নিয়মিত আসে, এমন একজন কথাচ্ছলে একদিন বলেছে, ‘সামনের দিনগুলো ভালো নয়, ফাদার। গোটা পূর্ব আনাতোলিয়ায় নাকি আগুন জ্বলবে’।’ বলল ফাদার আনতু আরামেহ।

‘ধন্যবাদ ফাদার, আপনি মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন। আচ্ছা ওদের কোন ঠিকানা বা কনট্যাক্ট পয়েন্ট জানা আছে আপনার, ফাদার?’

‘কয়েকটা ঠিকানা আমার লোকরা সংগ্রহ করেছিল, সেগুলোর একটিতেও তারা এখন নেই। ওরা একটা ঠিকানায় কয়েক সপ্তাহের বেশি থাকে না। তবে দু’টি জায়গায় ওরা খুব বেশি ওঠাবসা করে। তার একটি হলো মাউন্ট আরারাতের বেজ ক্যাম্প-১ এর পর্যটন হোটেল। অন্যটি আমাদের ইজদির প্রদেশের রাজধানী ইজদিয়ের ইহুদিদের সিনাগগের পাশের হোলি আরারাত হোটেল। অবশ্য আমি জানি না ‘আর্ক অব নূহা’ উপত্যকার ঘটনার পর তাদের আরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে কিনা। ‘সোহা’র নেতা মিহরান মুসেগ মাসিস খুব চালাক লোক।’ বলল ফাদার আনতু আরামেহ।

‘অনেক ধন্যবাদ ফাদার। আপনি অনেক সাহায্য করেছেন। এবার উঠি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ, আমি চেষ্টা করব আরও স্পেসিফিক তথ্য জানার। পারলে আমি জানাব।’ বলল ফাদার আনতু আরামেহ।

ধন্যবাদ দিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘ফাদার, আমি আমার একটা কার্ড আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। ওতে টেলিফোন নাম্বার, ই-মেইল সবই আছে। আপনি ব্যবহার করতে পারবেন।’

বলে আহমদ মুসা তার নেমকার্ড বের করার জন্য জ্যাকেটের পকেটে হাত দিল। তার হাতটা প্রথমেই রিভলভারে গিয়ে পড়ল।

নেমকার্ড রিভলভারের তলায় চাপা পড়েছে। আহমদ মুসা নেমকার্ড বের করছিল রিভলভারের নিচ থেকে।

এই সময় ব্রাশ ফায়ারের শব্দ হলো। দরজায় দাঁড়ালো দু’জন পুলিশ গুলি খেয়ে দরজার উপরই পড়ে গেল।

আহমদ মুসা চমকে উঠে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল এই দৃশ্য।

সংগে সংগে তার হাত পকেটের নেমকার্ড ছেড়ে দিয়ে রিভলভার চেপে ধরল। তার তর্জনি রিভলভারের ট্রিগার স্পর্শ করল।

দুই পুলিশের গুলিবিদ্ধ দেহ মাটিতে পড়ে যাবার পরপরই আরও তিনজন উদ্যত স্টেনগান হাতে দরজায় দাঁড়াল। একজন চিৎকার করে বলল, 'মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও শয়তার ফাদার। তোমরা আমাদের সর্বনাশ করেছো। এবার আমরা তোমাদের সর্বনাশ করব। তোমার গোটা পরিবারকে সর্বনাশ করে এসেছি। এতক্ষণ গুলি করিনি তোমাকে শুধু এই খবর দেয়ার জন্যে। ফায়া...।'

'ফায়ার' শব্দ সে শেষ করতে পারলো না। জ্যাকেটের পকেট থেকে আহমদ মুসার মেশিন রিভলভার গুলিবৃষ্টি করল।

আদের পেয়ে স্টেনগানের ট্রিগার টেপার আগেই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে পুলিশের লাশের পাশেই তাদের তিনটি লাশ পড়ে গেল।

ফাদার আনতু আরামেহ বিছানায় উঠে বসেছিল। ভাবলেশহীন তার মুখ। চোখে তার শূন্য দৃষ্টি।

আহমদ মুসা তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বলল, 'আমি দুঃখিত ফাদার, আপনার পরিবারের কথা আমাদের পুলিশের ভাবা উচিৎ ছিল।'

ফাদার তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল 'আমি আমার পরিবারের জন্যে ভাবছি না আবু আহমদ। আমি ভাবছি, 'সোহা' এবং 'হোলি আর্ক গ্রুপ' কতটা জঘন্য পর্যায়ে নেমে গেছে!'

মুহূর্তের জন্যে থেমে ফাদার আনতু আরামেহ বলল, 'ধন্যবাদ মি. আবু আহমদ। দ্বিতীয়বার আপনি আমাকে বাঁচালেন। আমি দারুন বিস্মিত হয়েছি আপনার ক্ষীপ্রতা ও লক্ষ্যভেদ দেখে। পকেটে রিভলভার রেখে এই ক্ষীপ্রতা ও লক্ষ্যভেদ স্বাভাবিক নয়!'

'বিপদে আল্লাহ্ এভাবেই সাহায্য করেন তার বান্দাহদেরকে।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার এই ধর্মভীরুতাকে আমার খুব ভালো লাগে। সত্যিকার ধর্মভীরু মানুষ যে ধর্মেরই হোক তারা একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারে, তাদের মধ্যে

সুন্দর সহাবস্থানও সম্ভব। গত দু'দিনে দু'বার আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছে। মনে হচ্ছে দু'যুগ থেকে আপনার সাথে আমার পরিচয়!' বলল ফাদার আনতু আরামেহ।

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করল ডিপি মি. খাল্লিকান খাচিপ। বলল সে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে, 'সব আমি শুনেছি মি. আবু আহমদ। আল্লাহ্'র শোকর যে আপনি এ সময় ঘরে ছিলেন। তাতে ফাদারকে বাঁচালো গেছে।'

বলেই তাকাল ফাদার আনতু আরামেহ'র দিকে। বলল, 'ফাদার, আমি দুঃখিত আপনার পরিবারের জন্যে।'

'স্যার, যারা চলে গেছে, তাদের কথা না ভেবে দেশের, জনগণের যারা শত্রু, তাদের কথা ভাবুন। আমি আপনাদের পাশে আছি।'

বলে একটু থামল ফাদার আরামেহ। তারপর তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'মি. আবু আহমদ, আমি 'আর্মি অব ট্রিনিটি'- এর গোয়েন্দা ইউনিটের প্রধানকে খবর দিয়েছি। তার সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক। সেও সত্যিকার একজন ধর্মভীরু মানুষ। অনেক খবর তার কাছে থাকার কথা। সে অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবে।'

'ধন্যবাদ ফাদার। সবার সাহয্য পেলে আমরা খুশি হবো।' আহমদ মুসা বলল।

বলেই আহমদ মুসা ফিরল ডিপি মি. খাল্লিকান খাচিপের দিকে। ফিরেই তাকে বলল, 'মি. খাল্লিকান, ফাদারকে এখনি এখান থেকে সরিয়ে ইজদিরের পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অন্য কোন হাসপাতালে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে না।'

'ঠিক বলেছেন স্যার, আমিও এই চিন্তাই করছিলাম। ধন্যবাদ আপনাকে।'

'ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ সকলকে। আমি উঠছি। জরুরী কিছু কাজ আছে।'

আহমদ মুসা সালাম দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৬

আহমদ মুসা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তার গাড়িতে উঠল। বাম হাত স্টিয়ারিং-এ রেখে ডান হাতে চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট করল গাড়ি। ঘড়ির দিকে তাকাল। আর আধাঘন্টা বাকি মেজর নাঈমের সাথে দেখা করার। মেজর নাঈম তাকে জানাবে দু'দিন আগে মাউন্ট আরারাতের 'আর্ক অব নূহা' উপত্যকায় 'সোহা' ও 'হোলি আর্ক' গ্রুপের লোকের লোকেরা যে সেনাদের পোষাক পরে গিয়েছিল, তারা সেনাবাহিনীর কিনা এবং নাম-পরিচয় কী?

আহমদ মুসা বিষয়টি জানতে টেলিফোন করেছিল আংকারায় জেনারেল মেডিন মেসুদের কাছে। জেনারেল মেসুদ তখনই নাম দিয়েছিল মেজর নাঈমের। বলেছিল, এই মেজর দেশ প্রেমিক এবং সোহাদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। জেনারেল মেসুদ আরও বলেছিল সে এ ব্যপারে মেজর নাঈমকে একটা ব্রীফ দেবে। পরে মেজর নাঈমই আহমদ মুসার সাথে যোগাযোগ করে দেখা করার সময় ঠিক করেছিল।

আহমদ মুসার গাড়ি মুভ করতে যাবে এই সময় একজন সামনে থেকে ছুটে আহমদ মুসার গাড়ি পর্যন্ত এসেই চোখের পলকে পকেট থেকে রিভলভার বের করে আহমদ মুসাকে গুলি করার জন্য।

লোকটি ছুটে গাড়ির সামনে আসতেই আহমদ মুসা টের পেয়েছে কী ঘটতে যাচ্ছে। তখন তার রিভলভার বের করার সময় ছিল না। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টার কোন বিকল্প ছিল না।

আত্মরক্ষার জন্যে বাম দিকে সীটের উপর শুয়ে পড়ে আক্রমণে যাবার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। অন্যদিকে সামনে থেকে গুলি আসবে বিধায় সামনের স্টিয়ারিং-এর উপর ঝুঁকে পড়া বিপজ্জনক হবে। সবশেষে আহমদ মুসা ডান হাত ডান লকের উপর রেখে দেহটাকে ডান দরজার সাথে সেঁটে গিল। একটা গুলি কানের পাশ দিয়ে বাম কাঁধের উপর দিয়ে চলে গেল। আহমদ মুসা ডান হাত

ইতিমধ্যে দরজার লক খুলে ফেলেছিল এবং দরজা ঠেলে গড়িয়ে পড়ল রাস্তার উপর। রিভলভারও পকেট থেকে বের করে নিয়েছিল আহমদ মুসা।

গাড়ির উইন্ড স্ক্রিন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল।

নিয়ন্ত্রণহীন গাড়িটা তার সামনে দিয়ে রাস্তার ডান পাশের দিকে গড়িয়ে চলল।

আহমদ মুসা রিভলভার বাগিয়ে দ্রুত গড়িয়ে চলল গাড়ির সাথে যাতে তার অবস্থান সম্পর্কে শত্রু পক্ষের বিভ্রান্তির সুযোগ সে নিতে পারে।

তাই হলো। আহমদ মুসা লোকটির পেছনে এসে পড়ল।

ওদিকে লোকটি সত্যিই বিভ্রান্ত হয়েছিল। সে সামনে তাকিয়ে আহমদ মুসাকে না দেখে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল গাড়ির দিকে ছুটে আসার জন্যে। তার হাতে উদ্যত রিভলভার।

ঘুরে দাঁড়িয়েই সে দেখতে পেল আহমদ মুসাকে।

কিন্তু সে তার রিভলভার আহমদ মুসার দিকে ঘুরিয়ে নেবার আগেই আহমদ মুসার রিভলভারের গুলি তার ডান হাতে বিদ্ধ হলো। রিভলভার ছিটকে পড়ল তার হাত থেকে।

হাত চেপে ধরে দৌড় দিল লোকটি পালাবার জন্যে।

এবার আহমদ মুসা তার পায়ে গুলি করল। তাকে জীবন্ত হাতে পেতে চায় আহমদ মুসা। এ পর্যন্ত 'সোহা' কিংবা 'হোলি আর্ক গ্রুপ'- এর কাউকেই জীবন্ত ধরা যায়নি।

পায়ে গুলি খেয়ে পড়ে গেল লোকট।

আহমদ মুসা ছুটল তার দিকে।

লোকটি পেছন ফিরে আহমদ মুসাকে একবার দেখল। তারপর গলায় ঝুলানো সোনার চেইনের লকেট মুখে পুরে শুয়ে পড়ল।

আরো জোরে দৌড়াল আহমদ মুসা। কিন্তু কোন ফল হলো না। আহমদ মুসা পৌঁছার আগেই পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষ লোকটির জীবন কেড়ে নিয়েছে।

আহমদ মুসা লোকটার কাছে পৌঁছার সাথে সাথে ডিপি খাল্লিকান খাচিপ এবং পুলিশরাও পৌঁছে গেল।

'স্যার, আপনি ঠিক আছেন তো? এরা পাগল হয়ে উঠেছে। আপনাকে সাবধান হতে হবে স্যার।' আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

খাল্লিকান খাচিপের কোন কথার জবাব না দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'মি. খাল্লিকান খাচিপ, একেও জীবন্ত ধরা গেল না। এর হাতে পায়ে গুলি করে ভেবেছিলাম জীবন্ত ধরতে পারব, তা হলো না। বুঝা যাচ্ছে, 'সোহা'দের হার্ডকোর লোক যারা, তারা প্রত্যেকেই কাছে পটাসিয়াম সায়ানাইড রাখে।'

'সাংঘাতিক ফেরোশাস আর দারুণ কমিটেড এরা দেখছি। এরকম 'ডু-অর-ডাই' যাদের নীতি, তাদের সাথে পারা কঠিন। স্যার, এখান থেকে বেরুলে দয়া করে আপনি পুলিশ নিয়ে বেরুবেন। আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা এত উদাসিন জানতে পারলে উপরওয়ালারা আমার চাকুরীই রাখবে না স্যার।' বলল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

'উপরওয়ালাদের আমি দেখব মি. খাল্লিকান খাচিপ। আপনি এ লাশসহ আগের দু'টি লাশকে দেখুন, এদের কোন ঠিকানা-পরিচয় বের করা যায় কিনা। আমার জরুরি কাজ আছে এক জায়গায়। আমি সেখানে যাচ্ছি।'

বলে আহমদ মুসা যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

মি. খাল্লিকান খাচিপ আহমদ মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে বাধা দেবার সাহস পেল না। তবু বলল, 'স্যার, আপনার উইন্ড শিল্ড একেবারে ছাতু হয়ে গেছে। আপনি আমার গাড়ি নিয়ে যান।'

'পুলিশের গাড়ি নিয়ে গেলে অসুবিধা আছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি এখনি একটা প্রাইভেট কার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি স্যার। উইন্ড শিল্ডের ভাঙা কাঁচে আপনার গাড়ির ভেতরটা বসার অযোগ্য হয়ে গেছে।' বলল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

হাসল আহমদ মুসা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সে সময় নেই মি. খাল্লিকান খাচিপ। ইতিমধ্যেই আমার দেরি হয়ে গেছে। ভাববেন না, যুদ্ধ ক্ষেত্রে এর চেয়ে অনেক ভাঙা গাড়ি নিয়ে চলতে হয়। আমরা এখন যুদ্ধক্ষেত্রে ধরে নিন।'

বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। চলল গাড়ির দিকে।

‘মি নাজিম, একে দেখুন। এর নাম ছাড়া তার কিছুই আমরা জানি না। আমাদের দেশে তার কোন স্বার্থও নেই। কিন্তু দেখুন বার বার মৃত্যুর মুখে পড়লেও আমাদের লড়াই তিনি লড়ে যাচ্ছেন। নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মডেল মানুষ আর দ্বিতীয় আছে বলে মনে হয় না। আল্লাহ্ তার ভালো করুন।’ আহমদ মুসাকে দেখিয়ে পাশে দাঁড়ানো পুলিশ অফিসার নাজিমকে কথাগুলো বলল ডিটি খাল্লিকান খাচিপ।

‘স্যার, এ ধরনের ভালো লোক আছে বলেই পৃথিবীটা এখনও কল্যাণ নিয়ে টিকে আছে। পর্বত প্রমাণ উঁচু স্যার এদের কর্তব্য, কিন্তু এরা নিজেদেরকে সবার চেয়ে ছোট করে দেখে। সেদিন স্যার খানার টেবিলে একটা প্লেট কম পড়েছিল। আমি শেষ প্রান্তে ছিলাম। প্লেট আমি সে কারণেই পাইনি। উনি উঠে এসে তার খানার প্লেটটি আমাকে দিয়ে আমার পরে বসলেন। আমি প্রতিবাদ করার আগেই বললেন, ‘খেয়েই আপনাকে ডিউটিতে দৌড়াতে হবে। আমার সে রকম ডিউটির কোন তাড়া নেই। সুতরাং আমার একটু পরে খেলে ক্ষতি নেই।’ আমার মত একজন পেটি পুলিশ অফিসার আর কোথায় তিনি, যাকে স্বয়ং প্রেসিডেন্টও সমীহ করেন, শ্রদ্ধা করেন। তাঁর এই কাজ আমাকে বড় করেনি বরং আরও বড় করেছে তাঁকেই।’

‘ধন্যবাদ ইন্সপেক্টর মি. নাজিম। আপনি ঠিক চিন্তা করেছেন। আসলেই তিনি ভিন্ন মাপের, ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। এমন মানুষ আমি দেখিনি।’

কথাগুলো বলছিল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ আহমদ মুসার চলন্ত গাড়ির দিকে তাকিয়ে।

তার দু’চোখের শূন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সেদিকে গাড়িটি দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার পরও।

দৃষ্টি তার বাইরে থাকলেও তার অন্তরে চলছে তখন একটা হিসাব-নিকাশ। আবু আহমদ নামের লোকটি তো আমার মত খাল্লিকান খাচিপকেও পাল্টে দিয়েছে। আমি টাকার বিনিময়ে আসামীকে বাদী বানাতাম, আর বাদীকে বানাতাম আসামী। বিচার বিক্রি করতাম টাকার বিনিময়ে। অবশেষে টাকার বিনিময়ে দেশের শত্রুদেরও সাহায্য করতে শুরু করেছিলাম। এই আবু আহমদের নিঃস্বার্থ

কাজের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত আমার বিবেককেও জাগিয়ে তুলেছে। সে বিবেকের পাহারায় আমার মত লোকও সেই পাপগুলো করার আর সুযোগ পাচ্ছে না।

পুলিশ অফিসার মি. নাজিম ডিপি খাল্লিকান খাচিপকে আপনার মধ্যে বিভোর হয়ে যেতে দেখে বলল, ‘স্যার, লাশগুলো নিয়ে যেতে হবে।’

চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে বলল, ‘চলুন অফিসার।’

‘চলুন।’ বলল পুলিশ অফিসার।

ওদিকে আহমদ মুসার গাড়ি পৌঁছে গেল মাউন্ট আরারাত সেনা ক্যাম্পের বাইরে হাইওয়ের পাশের মাউন্ট মালিক রেস্টুরেন্টে।

রেস্টুরেন্টটির ঠিক বিপরীতে রাস্তার ওপাশের উপত্যকায় রয়েছে বিরাট এক আঙুর বাগান। বাগানের মালিকানা একজন ইহুদি ব্যবসায়ীর। তার নাম মালিক মেরারী মালুস। তার নামের প্রথম শব্দ দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে রেস্টুরেন্টটির। মজার ব্যপার হলো তার এই ইহুদি পরিচয় কেউ জানে না। সবাই তাকে মালিক সাহেব বলে জানে। রেস্টুরেন্টের মালিক হবার সুবাদে সেনা অফিসারদের সাথে তার ব্যপক পরিচয়।

আহমদ মুসা রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি পার্ক করে রেস্টুরেন্টের ভেতরে প্রবেশ করল। রেস্টুরেন্টের সবচেয়ে দূরবর্তী কোণের নির্ধারিত টেবিল তখনও খালি। আহমদ মুসা বসল গিয়ে টেবিলটিতে।

দু’মিনিটের মধ্যেই প্যান্ট ও টি-সার্ট পরা একজন তরুণ এসে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে টেবিলে বসার জন্য অনুমতি চাইল।

আহমদ মুসা তরুণটির মুখের দিকে চেয়ে দেখল তার নাকের ডান পাশে সুন্দর কালো একটা আচিল।

এই চিহ্নটার কথাই জেনারেল মেডিন মেসুদ আহমদ মুসাকে জানিয়েছিল।

‘বসুন।’ বলল আহমদ মুসা।

তরুণটি বসে বলল, ‘স্যার, আমি মেজর নাঈম মেহরান। জেনারেল মেডিন মেসুদের নির্দেশে আমি এখানে এসেছি।’

‘জানি। নাস্তার অর্ডার দিয়েছি। নাস্তা খেতে খেতেই কথা হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা কথা শেষ হবার সাথেই নাস্তা এসে গেল।

নাস্তায় কাঁটাচামচ লাগাবার আগেই মেজর নাঈম মেহরান পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে আহমদ মুসার হাতে দিয়ে বলল, ‘স্যার, এটি পকেটে রাখুন।’

আহমদ মুসা দ্রুত কাগজটি নিয়ে পকেটে পুরে বলল, ‘সবার পরিচয় এসেছে?’

‘সবার সম্ভব হয়নি, তবে অফিসারদের সবার পরিচয় পাওয়া গেছে।’ নাস্তার দিকে মুখ রেখে আস্তে করে বলল মেজর নাঈম মেহরান।

‘কর্নেলের নাম?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘নূহা উপত্যকায় তথাকথিত সেনা অভিযানের নেতৃত্বে যে একজন কর্নেল ছিলেন তার নাম মোস্তফা মিকাহ।’ বলল মেজর নাঈম মেহরান।

নামের শেষ শব্দটা বিস্মিত করল আহমদ মুসাকে। ‘মিকাহ্’ হিব্রু শব্দ। অর্থ ঈশ্বরের মত। এমন একটা হিব্রু নাম কোন মুসলমানের হতে পারে না। আর এই অর্থের নাম তো কোন মুসলমান রাখতেই পারে না। আহমদ মুসা বলল, ‘কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্ মুসলমান তো?’

‘অবশ্যই। কেন বলছেন এ কথা?’ বলল মেজর নাঈম মেহরান।

‘তার মা নিশ্চয় ইহুদি কিংবা ইহুদি বংশোদ্ভুত ছিল। তা না হলে কর্নেলের নামে হিব্রু শব্দ এল কী করে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ইহুদি মা হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সন্তান তো মুসলমান। তার নামে হিব্রু শব্দ রাখবে কেন? নিশ্চয় ভুল হয়েছে।’ বলল মেজর নাঈম মেহরান।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ভুল নয় মেজর। ইহুদি বংশনীতির বিধান হলো, তাদের মেয়েরা যাদের বা যে ধর্মের লোকের ঘরেই থাক, তাদের গর্ভের ছেলেরা হবে ইহুদি। এমন ছেলেদের তারা ইহুদি হিসাবেই গণনা করে।’

বিস্ময় ফুটে উঠল মেজর নাঈম মেহরানের চোখে মুখে। বলল, ‘তাহলে কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্ ইহুদি?’

দু’জনেই মুখ নিচু করে খেতে খেতে কথা বলছিল।

আহমদ মুসা মেজর নাঈমের কথার কোন উত্তর না দিয়ে মুখ তুলল।

মুখ তুলে মাথাটা সোজা করতেই তার চোখ সোজাসুজি গিয়ে পড়ল কাউন্টারের এক পাশে বিশাল চেয়ারে বসে থাকা একজন সুদর্শন সুবেশধারী ভদ্রলোকের উপর। লোকটি তার দিকেই তাকিয়েছিল। আহমদ মুসার সাথে চোখাচোখি হতেই লোকটি চমকে উঠে তার চোখ সরিয়ে নিল। লোকটির হাতে মোবাইল এবং তার সামনে একটা কম্পিউটার। আহমদ মুসা কিন্তু চোখ সরিয়ে নেয়নি।

তার চোখে বিস্ময়, মনে প্রশ্ন। লোকটি তার দিকে তাকিয়ে ছিল কেন? অবশ্য তার উপর হঠাৎ চোখ পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সে চমকে উঠল কেন? এই চমকে ওঠার অর্থ হলো, ধরা পড়ার ভয়। কিন্তু সে কী করছিল যে ধরা পড়ার ভয় করবে? তাহলে কি সে আহমদ মুসার সবকিছু ফলো করছিল? কিভাবে? কোন প্রশ্নেরই আহমদ মুসার কাছে জবাব নেই।

আহমদ মুসা দেখল লোকটি মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এর পরও তার চোখের একটা কোণ যেন আহমদ মুসার পাহারায় নিয়োজিত রয়েছে।

আহমদ মুসা মুখ নিচু করল। বলল খেতে খেতে, ‘আমাদের এই রেস্টুরেন্টের মালিককে কতটুকু চেনেন?’

‘কেন, তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী, সফল ফার্মমালিক।’ বলল মেজর নাঈম মেহরান।

‘আমি তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি মেজর।’ আহমদ মুসা বলল।

‘উনি একদমই রাজনীতি বিমুখ। রেস্টুরেন্টে কোন রাজনৈতিক আলোচনাও তিনি এলাও করেন না।’

‘চলুন, তাহলে এবার উঠি।’ বলেই আহমদ মুসা নাস্তার বিল টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল না মেজর নাঈম মেহরান।

সে বসে বসে ঠাণ্ডা পানিতে একটু করে চুমুক দিচ্ছিল। বলল সে, ‘স্যার, আপনি যান। আমি পরে যাব।’

'ও ঠিক আছে। সেটাই ভালো।' বলে আহমদ মুসা রেস্টুরেন্টের দরজার দিকে পা বাড়াল।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে কয়েক ধাপ এগিয়েছে আহমদ মুসা এমন সময় তার পাশে এসে একটি গাড়ি হার্ড ব্রেক করল।

গাড়ি থেকে হন্তদন্ত হয়ে নামল একজন সেনা অফিসার। তার ইউনিফর্মের শোল্ডাল ব্রান্ডে একজন কর্নেলের ইনসিগনিয়া।

সে গাড়ি থেকে নেমেই মুখোমুখি হলো আহমদ মুসার।

কর্নেল দ্রুত তার পকেট থেকে রাভলভার বের করে তার নল আহমদ মুসার কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্ আমার অপরাধ কী?'

'জানতে পারবেন।' বলল কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্।

'আমি জানি আমার অপরাধ। আমি আপনাকে এবং মালিক মেরারী মালুসকে জেনে ফেলেছি।' আহমদ মুসা বলল।

কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্। তার হাতটাও কেঁপে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা তার এই মেকি অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করল। বিদ্যুৎ বেগে তার বাম হাতটা উঠে গিয়ে কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্'র রিভলভার ধরা হাত এক ধাক্কায় উপরে ঠেলে দিল। একটা গুলিও রিভলভার থেকে বেরুল, কিন্তু তা মাথার উপর দিয়ে চলে গেল।

কিন্তু তার পরেই দৃশ্যপট পাল্টে গেল। আহমদ মুসার ডান হাত বাম হাতের সাথেই উপরে উঠে গিয়েছিল। রিভলভার থেকে গুলি বেরুবার সাথে সাথেই আহমদ মুসার ডান হাত কর্নেলের হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নিল। আহমদ মুসা রিভলভার কেড়ে নিয়েই পচণ্ড একটা আঘাত করল কর্নেলের মাথায় রিভলভারের বাঁট দিয়ে।

মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল কর্নেল। আহমদ মুসা তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে কর্নেলের গাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে ড্রাইভিং সীটে গিয়ে বসল।

গাড়ি স্টার্ট নিয়ে দ্রুত চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসা যখন কর্নেলকে রিভলভারের বাঁট দিয়ে মেরে তার সংজ্ঞাহীন দেহ গাড়িতে তুলছিল, তখন রেস্টুরেন্টের মালিক মি. মালিক মেরারী মালুস রেস্টুরেন্টের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ভয়ংকর বিস্ময় আর উদ্বেগে তার মুখ চুপসে গেছে।

সব ঘটনা মেজর নাঈম মেহরানও দেখতে পেয়েছিল। সেও উদ্বেগ নিয়ে ছুটে এসেছিল। কিন্তু আহমদ মুসার গাড়ি ততক্ষণে রেস্টুরেন্ট এলাকার বাইরে চলে গেছে। দাঁড়িয়ে পড়েছিল মেজর নাঈম মেহরান। এ ঘটনায় সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। তবে সে ভাবল, জনাব আবু আহমদ উপরের লোক। তিনি যাই করুন ভেবে চিন্তেই করবেন। সব চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে দিয়ে মেজর নাঈম ধীরে ধীরে গিয়ে তার গাড়িতে উঠল।

ওদিকে আহমদ মুসা সংজ্ঞাহীন একজন আস্ত কর্নেলকে পাঁজাকোলা করে তার কক্ষে আহমদ মুসাকে ঢুকতে দেখে আঁতকে উঠল সে। বলল, 'এই তো গেলেন, কোথায় পেলেন একে?'

'এ সেই কর্নেল যার ইউনিফর্ম পরে সেদিন 'আর্ক অব নূহা' উপত্যকায় শহীদ হয়েছিল একজন ভূয়া কর্নেল।' আহমদ মুসা বলল।

বুঝল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ। বলল, 'ধন্যবাদ স্যার, আপনি অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন।'

'আসল কাজটাই হয়নি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। এর কাছ থেকে অনেক কথা বের করতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'অবশ্যই স্যার।' বলল খাল্লিকান খাচিপ।

ঘরের মেঝেয় শুইয়ে দিয়েছিল কর্নেল মোস্তফা মিকাহকে।

'সংজ্ঞা ফিরতে কত সময় লাগে কে জানে?' স্বগত উক্তি করল খাল্লিকান খাচিপ।

'সংজ্ঞা ফিরেছে মি. খাল্লিকান খাচিপ। ও এখন সংজ্ঞাহীনতার ভান করছে।' বলেই আহমদ মুসা পকেট থেকে কলম নিয়ে এর নিবের তীক্ষ্ণ মাথা দিয়ে জোরে খোঁচা দিল কর্নেলের পায়ে।

কর্নেলের গোট দেহ স্প্রি-এর মত নেচে উঠল।

'আর নাটক না করে উঠে বসুন কর্নেল।' আহমদ মুসা বলল।

এই সাথে একটা চেয়ারও এগিয়ে দিল আহমদ মুসা কর্নেলের দিকে।

কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্ উঠে চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'আপনার এই সাংঘাতিক আচরণের মাশূল আপনাকে দিতে হবে। আমি একজন সেনা অফিসার, মনে রাখবেন।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্ তো সেদিন 'আর্ক অব নূহা' উত্যকায় নিহত হয়েছেন। লাশের ছবিও আমরা দেখাতে পারি। মি. খাল্লিকান খাচিপ ছবিটা তাকে দেখান তো প্লিজ।'

খাল্লিকান খাচিপ ড্রয়ার থেকে একটা ছবি বের করে কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্'র চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, 'দেখুন কর্নেল মোস্তফার নাম, নাম্বার সবই এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।'

মুখ চুপসে গেল কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্'র।

আহমদ মুসার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। বলল, 'আপনি 'সোহা' ও 'হোলি আর্ক গ্রুপ'-এর সাথে কতদিন থেকে আছেন?'

'কী বলছেন আপনি? ঐ ধরনের কোন দলকে আমি চিনি না।' বলল কর্নেল মোস্তফা।

আহমদ মুসা পকেট থেকে রিভলভার হাতে নিয়ে বলল, 'দেখুন কর্নেল, আমরা গল্প-গুজব করতে বসিনি। এক কথা আমি দু'বার বলব না।'

থামল আহমদ মুসা। পকেট থেকে এক খণ্ড কাগজ বের করল। ভাঁজ করা কাগজটি খুলল সে। কাগজটি মেলে ধরল সে কর্নেলের সামনে। বলল, 'এই কাগজটি আমি হোলি আর্ক গ্রুপের একজন শীর্ষ পর্যায়ের নেতার পকেট থেকে পেয়েছি। কাগজটি সাদা কাগজের একট শীট। কাগজে মার্ক ডিটেকটর ক্যামিকেল ছিটাবার পর এটা একটা নকশায় পরিণত হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে পূর্ব আনাতোলিয়ার আর্মেনিয়া সংলগ্ন তিনটি প্রদেশ এবং ছোট-বড় সবগুলো শহরের লোকেশন আছে। সেই সাথে রেড ডট। ২টি থেকে ৫টি পর্যন্ত ডট রয়েছে বিভিন্ন শহরে। আমি জানতে চাই কর্নেল, এই রেড ডটগুলোর অর্থ কী?'

‘বিশ্বাস করুন স্যার, এ ধরনের কাগজ আমি এই প্রথম দেখলাম। আমি জানি না এর অর্থ কী?’ বলল কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্।

আহমদ মুসা তার রিভলভার তুলে একটা গুলি করল কর্নেল মোস্তফা মিকাহ-কে লক্ষ্য করে। গুলিটা তার কানের উপরের অংশের কিছুটা ছিঁড়ে নিয়ে মাথা ও কানের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ভীষণ আঁৎকে উঠে হাত দিয়ে কান চেপে ধরল কর্নেল মোস্তফা মাকাহ্। ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেছে তার মুখ।

‘এগুলিটা আমি আপনাকে সাবধান করে দেবার জন্যে করেছি, দ্বিতীয় গুলিটা কিন্তু আপনার মাথা গুঁড়ো করে দেবে।’ আহমদ মুসা বলল।

ভীত কর্নেল তার বিহবল চোখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘বলছি স্যার। একটা বড় কিছুর পরিকল্পনা হয়েছে স্যার, কিন্তু আমাদের এখনও জানানো হয়নি। বলা হয়েছে, আজ জানানো হবে।’ থামল কর্নেল মোস্তফা।

‘কে জানাবে, কোথায় জানাবে?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘ইজদিরের হোলি আরারাত হোটেলে আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় একজনের সাথে দেখা হওয়ার কথা। সেখানেই কর্মসূচী আমাদের জানানো হবে বলা হয়েছে। এর বাইরে আমি কিছুই জানি না।’ বলল কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্।

‘সেই একজন কে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘সেটা আমাদের বলা হয়নি স্যার। শুধু আমাদের জানানো হয়েছে হোটেলটির তিন তলায় প্যারাডাইজ অডিটোরিয়ামে গিয়ে বসতে হবে। এটুকুই নির্দেশ ছিল আমার উপর।’ বলল কর্নেল মোস্তফা।

‘আর কারও কি ওখানে যাবার কথা ছিল?’ আহমদ মুসা বলল।

‘এবার কী ব্যবস্থা হয়েছে জানি না স্যার। তবে এর আগে সব কথা, সব ব্রিফিং একাধিক লোককে নিয়ে হয়নি।’ বলল কর্নেল মোস্তফা।

‘আচ্ছা কর্নেল, রেস্টুরেন্টে আমাকে আক্রমণের জন্যে কে আপনাকে বলেছিল?’ আহমদ মুসা বলল।

কর্নেল মোস্তফা একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল, ‘মাউন্ট মালিক রেস্টুরেন্টের মালিক মেরারী মালুস।’

‘কী বলেছিলেন তিনি?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘স্যার, আমার রেস্টুরেন্টের একটা টেবিলে আপনাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। মেজর নাঈম একটা তালিকা দিয়েছেন একজনকে। তার মধ্যে আপনার নাম আছে। আমার মত হচ্ছে আর্ক অব নূহা উপত্যকায় যাদের ইউনিফর্ম পাওয়া গেছে, তাদের তালিকা। মেজর নাঈমকে পরে দেখবেন। কিন্তু তার সাথের লোকটাকে যেতে দিলে আপনার বিপদ হবে স্যার। তার মূল কথা এটাই ছিল।’ বলল কর্নেল মোস্তফা।

‘রেস্টুরেন্ট মালিক এসব কথা জানলেন কী করে?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘আমি এটা জানি না স্যার। তিনি তো আমাকে আপনার ফটোও দেখিয়েছেন কম্পিউটারের মাধ্যমে। তা না হলে তো আমি আপনাকে চিনতেই পারতাম না।’ বলল কর্নেল মোস্তফা।

ভ্রূকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। তার মানে রেস্টুরেন্টের প্রত্যেক টেবিলের উপর ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার নজর রয়েছে প্রতি টেবিলে ট্রান্সমিটার যার মাধ্যমে শব্দ মনিটর করা হয়। একজন রেস্টুরেন্ট মালিক এই ব্যবস্থা করেছেন কেন। কিন্তু এ-নিয়ে চিন্তা করতে চাইল না আহমদ মুসা। কর্নেল মোস্তফাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘দেশের প্রতি ভালোবাসা কি আপনার মধ্যে অবশিষ্ট আছে কর্নেল মোস্তফা?’

মুখ নিচু করল কর্নেল মোস্তফা। দু’হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল সে।

বলল, ‘দেশকে আমি ভালোবাসি স্যার। কিন্তু আমি বিপদে পড়েছি। আমার উপর আমার মা’র নির্দেশ হলো, আমি যেন সোহা’র মেহরান মুসেগ মাসিস যা বলবেন তাকে মায়ের নির্দেশ বলে মনে করি। আমি যা কিছু করেছি তা এই দায় থেকেই করেছি। আমি দেশকে ভালোবাসি স্যার।’

‘আমার একটা কথা কি আজ শুনবেন?’ বলল আহমদ মুসা।

মুখ তুলে তাকাল কর্নেল মোস্তফা আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘অবশ্যই স্যার। আপনি নির্দেশ করুন। আপনি কে আমি জানি না। কিন্তু আপনি যে শাস্তি আমাকে দিয়েছেন, তা আমার প্রাপ্য ছিল।’

‘আজ সন্ধ্যায় আপনি ইজদিরের হোলি মাউন্ট আরারাত হোটেলে যাবেন। কি কর্মসূচি দেয় সেটা নেবেন। সে কর্মসূচিটি জানা দেশের জন্যে খুব বেশি প্রয়োজন। আমিও সেখানে আপনার আশে-পাশেই থাকব। আপনি হোটেল থেকে বেরিয়ে বিপরীত দিকের সিনাগগের পাশেই থাকব। আপনি হোটেল থেকে বেরিয়ে বিপরীত দিকের সিনাগগের পাশে রাস্তার কিনারে আপনার গাড়ি দাঁড় করিয়ে ইঞ্জিন পরীক্ষা করতে শুরু করবেন। এসময় পেছন দিক থেকে একটা লাল গাড়ি আসবে। আপনি সেই গাড়িটাকে ফলো করবেন।’ থামল আহমদ মুসা।

একটু থেমেই আবার বলল, ‘আমি আপনাকে ধরে নিয়ে এসেছিলাম, এই ব্যাপারে কেউ জানতে চাইলে আপনি এ কথা বলবেন: আপনি আমাকে গুলি করতে গিয়েছিলেন, এই জন্যেই আমি আপনাকে ধরে এনেছিলাম। পরে প্রশাসনের মধ্যস্থতায় সবকিছুর সুরাহা হয়েছে। আর আপনি যেহেতু একজন সেনা অফিসার তাই আপনাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।’

‘ঠিক আছে স্যার, আমি এটাই বলব।’ বলল কর্নেল মোস্তফা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘ধন্যবাদ কর্নেল, হয়তো সন্ধ্যার পরে কোথাও আমাদের দেখা হতে পারে। আমি চলি।’

‘অবশ্যই স্যার। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।’ বলল কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্।

সবাইকে সালাম দিয়ে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

‘কর্নেল মি. মোস্তফা আপনি একটু বসুন, আমি ওকে বিদায় দিয়ে আসছি। আমিই আপনাকে পৌঁছে দেব।’

বলে ডিপি খাল্লিকান খাচিপ আহমদ মুসার সাথে বেরিয়ে এল। বলল আহমদ মুসাকে, ‘মি. আবু আহমদ, আপনি কি নিশ্চিত, কর্নেল মোস্তফা আপনার কথা শুনবে? যদি বিষয়টা ফাঁস করে দেয় সে ও-পক্ষকে?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘মানুষ চিনতে আমার ভুল না হলে আমি মনে করি তাকে বিশ্বাস করা যায়। সত্যিই সে ইহুদি মায়ের সন্তান। মা তাকে ঐ কাজে বাধ্য করতে পারে।’

‘ধন্যবাদ আবু আহমদ। আপনার কথা সত্যি হোক। তাহলে স্যার আবার দেখা হবে। আস্‌-সালামু ‘আলাইকুম।’

আহমদ মুসা ‘ওয়া ‘আলাইকুম আস্‌-সালাম’ বলে পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা একজন তুর্কি ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে ইজদিরের সেই হোলি আরারাত হোটেলের এক পাশের একটা টেবিলে বসে মাঝে মাঝে কফির কাটে চুমুক দিচ্ছে, আর সামনে ছড়ানো কাগজে চোখ রেখে হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত। যেন মনোযোগ সহকারে সে তার ব্যবসায়ের কোন একটা জটিল হিসাব মেলাচ্ছে। চোখ দু’টি কাগজের উপর ব্যস্ত দেখা গেলেও রেস্টুরেন্টের দুই গেটের উপর নজরদারী ঠিক রেখেছে।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বাজতে আর ৫ মিনিট বাকি। এখনও দেখা নেই কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্‌’র। সে আসার আগেই হোটেলে ঢুকে গেছে তা পারে না। আহমদ মুসা পাশের এক মসজিদে মিগরিবের পড়েই এসে হোটেলে ঢুকেছে। তুরস্কে মাগরিবের নামাযের পরের সময়কেই সন্ধ্যা বলে। সন্ধ্যাতেই কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্‌’র হোটেলে আসার কথা। সুতরাং সে সন্ধ্যার আগে হোটেলে আসেনি এটা নিশ্চিত।

সে হোটেলে ঢোকার আগেই হোটেলের চারদিকটা দেখে নিয়েছে, হোটেলে ঢোকার ও বেরুবার তৃতীয় কোন গেট নেই। তার সামনের দুই গেট দিয়ে ঢুকে কাউন্টারের ভেতরের প্রান্তের পাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্‌’কে নিশ্চয় তিন তলায় উঠতে হলে এই সিঁড়ি দিয়েই উঠতে হবে।

সাড়ে সাতটা বাজল। তার আরও কয়েক মিনিট পরে আহমদ মুসা দেখতে পেল, কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্‌ হোটেলে প্রবেশ করল। তার পরনে কালো ট্রাউজারের উপর কালো জ্যাকেট, মাথায় একট ইংলিশ কালো হ্যাট।

আহমদ মুসা দেখল, কর্নেল মোস্তফা কাউন্টারে কিছু বলল, তারপর সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

আহমদ মুসা ভাবল, উপরে কর্নেলের কতটা সময় লাগতে পারে। নিশ্চয় আধাঘন্টার বেশি নয়।

কিন্তু বিশ মিনিট পরেই কর্নেল উপর থেকে নেমে এল। তার মুখটা বিষণ্ন।

আহমদ মুসা ইতমধ্যেই হিসাবের কাগজপত্র গুটিয়ে নিয়ে নাস্তা করছিল।

কর্নেল মোস্তফা বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে।

আরও মিনিট দুয়েক পরে আহমদ মুসার নাস্তা শেষ হলো।

সব বিল চুকিয়ে আহমদ মুসাও বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। আহমদ মুসা তার লাল গাড়ি নিয়ে এগোচ্ছিল। সিনাগগের কাছাকাছি পৌঁছে দেখল রাস্তার কেনারে একটা গাড়ি দাঁড় করানো রয়েছে। গাড়িটার ফ্রন্ট টপ তুলে একজন গাড়ির ইঞ্জিন পরীক্ষা করছে। আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো রোকটি কর্নেল মোস্তফাই।

আহমদ মুসা একবার হর্ন বাজিয়ে কর্নেল মোস্তফার গাড়ির পাশ দিয়ে সামনে এগোলো।

সিনাগগের এলাকা পার হবার আগেই দেখল কর্নেল মোস্তফার গাড়ি তার পেছনে চলতে শুরু করেছে।

ইজদির শহর পেরিয়ে আরও মাইল দশেক চলার পর একটা সরাইখানায় গাড়ি দাঁড় করাল আহমদ মুসা।

কর্নেল মোস্তফার গাড়িও দাঁড়াল।

আহমদ মুসা পেছনে তাকিয়ে আর কোন গাড়ি দেখল না। কেউ তাদের ফলো করেনি, নিশ্চিত হলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা সরাইখানার দিকে এগোলো।

কর্নেল মোস্তফাও।

আহমদ মুসা সরাইখানার রেস্টুরেন্টে না ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল বিশ্রাম কক্ষে যাবার জন্যে।

তুরস্কে সরাইখানার বিশ্রাম কক্ষ দুই ধরনের। এক ধরনের আছে ফ্রী। এখানে যে কেউ বিনা পয়সায় তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করতে পারে।

আরেক ধরনের আছে যার জন্যে ডোনেশন পে করতে হয়। যে রুম সে চায় তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা ডোনেশন পে করলেই চাবি বেরিয়ে আসে। সে চাবি দিয়ে ঘর খুলে তিন দিন সে কক্ষে থাকা যায়।

আহমদ মুসা ডোনেশন পে করে একটা কক্ষে প্রবেশ করল। পেছন পেছন আসা কর্নেলকে ডেকে নিল।

কর্নেল ভেতরে প্রবেশ করেই বলল, 'স্যার, খবর ভালো নয়।'

'ভলো নয়, তা আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি। বলুন খারাপ খবরটা কী?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

স্যার, কেউ আসেনি। কারও সাথেই দেখা হয়নি। কিছুক্ষণ বসার পর একটা টেলিফোন পাই। টেলিফোনটি আমার চেয়ারের পাশেই টিপয়ে রাখা ছিল। টেলিফোনে একজন বলে: 'আপনার সামনে মঞ্চের টেবিলে একটা মেসেজ আছে নিয়ে যান।' আমি গিয়ে মেসেজটা নেই।'

বলে কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্ এক টুকরো কাগজ তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

আহমদ মুসা চোখ বুলাল কাগজের টুকরোটির উপর। তাতে লিখা: 'কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে।'

ভ্রূ-কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। বলল, 'কর্নেল, আমার ওখান থেকে মানে পুলিশ স্টেশন থেকে আসার পর আপনার কার কার সাথে দেখা বা কথা হয়েছে, আপনার বাড়ির লোকরা ছাড়া?'

কর্নেল একটু ভাবল। বলল, 'আমি বাসা থেকে বের হইনি। অফিস থেকে ১২ ঘন্টার ছুটিতে আছি। বাইরের কারও সাথে দেখা বা কথা হয়নি। শুধু একবার টেলিফোন করেছিলেন মাউন্ট মালিক রেস্টুরেন্টে'র ওমার।'

আনন্দ প্রকাশ পেল আহমদ মুসার চোখে মুখে। বলল দ্রুতকণ্ঠে, 'কী বলেছিলেন তিনি?'

'তিনি বলেছিলেন, আপনার কোন যে বিপদ হয়নি, এজন্যে আল্লাহ্'র হাজার শোকর। আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম, খবরা-খবরও নিয়েছি। ঐ লোকরা মনে হচ্ছে বিপজ্জনক। ছেড়ে দেয়ার মধ্যে কোন কৌশল থাকতে পারে। আমি মনে করি,

আপনি কয়েকদিনের ছুটিতে যান। আমি তাকে বলেছিলাম, ঠিক আছে দেখছি আমি।’ কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্ বলল।

‘উনি আপনাকে এধরনের পরামর্শ দিলেন কেন? তাঁর সাথে আপনার আর কোন সম্পর্ক আছে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘না, নেই। এমনিতেই উনি সাংঘাতিক অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন। মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের ব্যাপারে তিনি অনেক খবর রাখেন। সরকারের নানা রকম এজেন্সি আছে, কোন এজেন্সির সাথে তিনি আছেন কিনা জানি না।’ বলল কর্নেল মোস্তফা।

‘আপনি যদি শোনেন, তার রেস্টুরেন্টের প্রতিটি টেবিলেই শর্ট সার্কিট ক্যামেরার নজরদারী আছে এবং প্রতি টেবিলের কথা শোনার জন্যে ট্রান্সমিটার বসানো আছে, তাহলে কি বিশ্বাস করবেন?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

বিস্ময় ফুটে উঠল কর্নেল মোস্তফার চোখে মুখে। বলল, ‘বিশ্বাস করব স্যার। কারণ আমার ব্যাপারে আপনাদের আলোচনা কিভাবে সে শুনল এবং আপনার ফটো কিভাবে সে আমার ই-মেইলে পাঠাল, এই প্রশ্নগুলোর সমাধান হয় আপনার কথা বিশ্বাস করলেই।’

‘রেস্টুরেন্টটির মালিক মানে মি. মালিক মেরারী মালুস কোথায় থাকেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আমি সেটা জানি না, স্যার।’ মাঝে মাঝে উনি রেস্টুরেন্টের উপর তলায় থাকেন দেখেছি।’ বলল কর্নেল মোস্তফা।

‘এখন তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

একটু ভাবল কর্নেল মোস্তফা। বলল, ‘রাত ১১টায় রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়, তার আগে একবার তিনি রেস্টুরেন্টে আসেন। আমার মনে হয় এখন রেস্টুরেন্টেই পাওয়া যাবে তাকে।’

‘আপনি আমার সাথে থাকবেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘কোথায় কিভাবে?’ জিজ্ঞাসা কর্নেল মোস্তফার।

‘আমি মি. মালিক মেরারী মালুসকে কিডন্যাপ করতে চাই। আপনি আমার সাথে থাকবেন।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা কর্নেল মোস্তফাকে সাথে রাখতে চায়, কারণ তার মিশন ফেল হওয়ার কোন অবকাশই সে রাখতে চায় না। কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্-কে আহমদ মুসা বিশ্বাস করে, কিন্তু তবু সামান্য ঝুঁকিও সে নিতে চায় না। এজন্যেই সে কর্নেল মোস্তফাকে সাথে রাখতে চায় যাতে রেস্টুরেন্টের কর্তা মি. মালিক বিষয়টি জানার কোন সুযোগই যেন না পায়।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই কর্নেল মোস্তফা বলল, 'আপনি সাথে রাখলে আমি গৌরব বোধ করব স্যার।'

আহমদ মুসা তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। বলল, 'ধন্যবাদ।'

দু'জনেই সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এল।

কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্ তার গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা তাকে বলল, 'ও গাড়িতে নয়। আমার গাড়িতে আসুন। ও গাড়ি ওখানেই থাকবে।'

বলে আহমদ মুসা তার গাড়ির ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল। পাশে উঠে বসল কর্নেল মোস্তফা।

ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলল গাড়ি। রাত দশটায় মাউন্ট মালিক রেস্টুরেন্টের সামনে এসে পৌঁছল গাড়ি।

আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে নামার আগে কর্নেল মোস্তফার দিকে চেয়ে বলল, 'কর্নেল, আপনাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে টেলিফোনটি পাওয়ার পর থেকেই। টেলিফোন কার ছিল?'

কর্নেল মোস্তফা আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বলল, 'স্যার, আমার মায়ের টেলিফোন।'

'ও, আচ্ছা।' বলে আর একবার ভালো করে তাকাল কর্নেল মোস্তফার দিকে।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল। নামল কর্নেল মোস্তফাও।

আহমদ মুসা জ্যাকেটের পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে এগোলো রেস্টুরেন্টের দিকে। রেস্টুরেন্টের গেটে ছিল একজন নিরাপত্তা প্রহরী।

'মালিক সাহেব কি রেস্টুরেন্টে আছেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আছেন স্যার।’ উত্তর দিল নিরাপত্তার জন্যে দরজায় দাঁড়ানো লোকটি।

আহমদ মুসা পেছন ফিরে তাকিয়ে কর্নেল মোস্তফাকে বলল, ‘আপনি দরজায় দাঁড়ান।’

বলেই আহমদ মুসা রেস্টুরেন্টে ঢুকে গেল। রেস্টুরেন্টে খদ্দের তেমন নেই। আর্মি ক্যাম্পের খদ্দের এ সময় থাকে না।

ক্যাশ কাউন্টারে কম্পিউটারের সামনে বসে আছেন মি. মালিক মেরারী মালুস। তার গায়ে আগের মতই লাল জ্যাকেট এবং লাল ফেজ ধরনের টুপি। টুপিটা একটু বিশেষ ধরনের। টুপির বেজটা ইলাস্টিক। এই ইলাস্টিক মাথাকে কামড়ে ধরে রাখে। আর পরনে তার ধবধবে সাদা ট্রাউজার।

আহমদ মুসা কাউন্টারের মাঝ পথে যেতেই মালিক মেরারী মালুস তাকে দেখতে পেয়েছে। সংগে সংগেই সে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে রিভলভার। উঠে দাঁড়িয়েই সে গুলি করেছে আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা প্রস্তুত হয়েই প্রবেশ করেছিল। মালিক মেরারী মালুস রিভলভার নিয়ে উঠে দাঁড়াবার সাথে-সাথেই আহমদ মুসার হাত বেরিয়ে এসেছিল পকেট থেকে রিভলভার সমেত।

মালিক মেরারী মালুসের হাত টার্গেটে উঠে আসার আগেই উঠে গিয়েছিল আহমদ মুসার হাত। কিন্তু আহমদ মুসা মারতে চায়নি মালিক মেরারী মালুসকে। তাই আহমদ মুসা মুহূর্তকাল অপেক্ষা করেছিল মালিক মেরারী মালুসের হাত উপরে উঠে আসার জন্যে।

মালিক মেরারী মালুসের হাত টার্গেটে উঠে এসে স্থির হবার সংগে সংগেই আহমদ মুসা ট্রিগার টিপেছিল।

আহমদ মুসার রিভলভারের গুলি যখন মালিক মেরারী মালুসের হাতে আঘাত করল। তখন তার তর্জনিও চেপে বসেছিল রিভলভারের ট্রিগারে। হাতটা তার কেঁপে গিয়েছিল। তার রিভলভার থেকে গুলি ঠিকই বেরুল, কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে আঘাত করল রেস্টুরেন্টের গেটে দাঁড়ানো একজন নিরাপত্তা কর্মীকে।

অদ্ভুত নার্ভের অধিকারী মালিক মেরারী মালুস রিভলভার ছেড়ে দেয়নি হাত আহত হলেও। তার বাম হাত দ্রুত এসে আহত ডান হাত থেকে রিভলভার নিয়ে দ্বিতীয় গুলি করতে যাচ্ছিল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা মালিক মেরারী মালুসের বাম হাতের জন্যে অপেক্ষা করছিল। কারণ মালিক মেরারী মালুসদের জীবন্ত ধরতে হলে তাদের দুই হাত অকেজো করে তাদের পটাসিয়াম সায়ানাইড খাওয়ার পথ বন্ধ করতে হবে, এটা আহমদ মুসা ঠেকে ঠেকে বুঝেছে।

আহমদ মুসার দ্বিতীয় গুলিটা মালিক মেরারী মালুসের হাতের আঙুলগুলো গুঁড়ো করে দিয়ে হাতে ঢুকে গেল।

এবার রিভলভার পড়ে গেল তার হাত থকে।

এই সময়ই একটা গুলি এসে লাগল আহমদ মুসার হাতে। গুলিটা আহমদ মুসার কনুইয়ের নিচ থেকে চামড়া চিরে কব্জির কিছু অংশ ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

তবুও আহমদ মুসার হাত থেকে রিভলভারে পড়ল না। তবে হাতটা নেমে গেল নিচে।

আহমদ মুসার মনোযোগ তখন এদিকে নয়, তার মনোযোগের লক্ষ্য নিবদ্ধ পেছন থেকে আসা গুলির শব্দের উৎসের প্রতি। বিদ্যুত বেগে আহমদ মুসার বাম হাত রিভলভার সমেত পকেট থেকে উঠে এসে ডান কাঁধের উপর দিয়ে শব্দের উৎস লক্ষ্যে আঘাত করল।

পেছন থেকে আসা গুলির শব্দের রেশ বাতাসে মেলাবার আগেই আহমদ মুসার গুলি নিক্ষিপ্ত হলো।

গুলি করেই ফিরে তাকাল আহমদ মুসা। দেখল, মাটিতে পড়ে বুক চেপে ধরে কাতরাচ্ছে কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্।

বিস্মিত আহমদ মুসা কর্নেলের দিকে যাবার জন্যে পা বাড়াবার আগেই পেছনে ফিরে কাউন্টারের দিকে তাকাল। দেখল, মালিক মেরারী মালুস আহত। ঝুলন্ত দুই হাত নিয়ে দৌড়ে উপরে উঠে যাচ্ছে।

'উপর দিয়ে পালাবার কোন পথ তাদের আছে?' প্রশ্নটা মাথায় আসতেই আহমদ মুসা তার পালানো বন্ধ করার জন্যে তার দুই পায়ে দু'টি গুলি করল।

মালিক মেরারী সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা চারিদিকে চাইল। দেখল, কাউন্টারের ক্যাশিয়ার, রেস্টুরেন্টের বয়-বেয়ারা এবং কয়েকজন খদ্দের পাথরের মত বসে আছে। ভীত সন্ত্রস্ত তাদের চেহারা।

‘যে যেখানে আছেন আপনারা সেখানেই বসে থাকবেন, কেউ অন্যথা করলে তার অবস্থা মালিক মেরারীর মত হবে।’

বলে আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে মালিক মেরারী মালুসের কম্পিউটার থেকে হার্ড ডিস্কটা বের করে নিয়ে পকেটে পুরে মালিক মেরারী মালুসকে পাঁজকোলা করে নিয়ে রেস্টুরেন্টের গেটে এসে তাকে রেখে গিয়ে বসল কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্’র কাছে। কর্নেল মোস্তফা কাতরাচ্ছে তখনও। তবে জীবনী শক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

আহমদ মুসা তার পাশে বসে তার মাথা তুলে নিয়ে বলল, ‘আপনি এটা করলেন কেন? আমি সত্যিই আপনাকে বিশ্বাস করেছিলাম।’

‘ওদের সহযোগিতার জন্য আমার মায়ের নির্দেশ আমি পালন করেছি স্যার। জানি না, মা বড় না দেশ বড়। হয়তো দেশই বড়, কিন্তু মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন, পালন করেছেন। তাঁর নির্দেশ আমি ফেলতে পারিনি স্যার।’

বলে একটা ঢোক গিলেই আবার ক্ষীণ স্বরে বলল, ‘স্যার, আমি দেশকেও ভালোবাসি। সেকারণেই আমি আপনাকে মারতে চাইনি। হাতে গুলি করেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম মি. মালিক পালাতে পারুক।’

এরই মধ্যে পুলিশের গাড়ি এসে গেল। সামনের গাড়ি থেকে ডিপি খাল্লিকান খাচিপ নামল।

খাল্লিকান আহমদ মুসার দিকে ছুটে আসতে আসতে বলল, ‘আপনি ঠিক আছেন স্যার?’

‘ভালো, মি. খাল্লিকান, আপনি এখুনি কর্নেলকে হাসপাতালে নেবার ব্যবস্থা করুন। আর মি. মালিক মেরারী মালুসকে পুলিশ অফিসে নিয়ে চলুন, আর সেখানে একজন ডাক্তারকে ডাকুন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘স্যার, আমি মরতে চাই। বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী হয়ে বাঁচতে চাই না। আমাকে দয়া করে হাসপাতালে নেবেন না।’ ক্ষীণ স্বরে আকুতিমাখা কণ্ঠে বলল কর্নেল মোস্তফা।

‘আপনার বিচার আপনি করবেন না কর্নেল। আপনার অসহায় অবস্থার কথা আমি জানি। ঐ রকম মা হলে যে কোন কারো বিপদ আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

দু’জন পুলিশ এসে ধরাধরি করে কর্নেল মোস্তফাকে গাড়িতে তুলল।

মালিক মেরারী মালুসকে আহমদ মুসা নিজের গাড়িতে নিল।

দু’টি গাড়ি হাসপাতালের দিকে আর অবশিষ্ট গাড়ি চলল পুলিশ অফিসের দিকে। কিছু পুলিশ থাকল রেস্টুরেন্টের পাহারায়।

পুলিশ অফিসে পৌঁছে আহমদ মুসা ডাক্তারকে বলল, ‘মি. মালিক আপনার হেফাজতে থাকবেন এক ঘন্টা। এ সময় আমি আপনার ওখানে উপস্থিত থাকবো।’

‘তার দরকার নেই স্যার, দু’জন পুলিশ দেব, তারা পাহারা দেবে।’ বলল খাল্লিকান খাচিপ।

‘না মি. অফিসার। মি. মালিকের মত সম্মানী ব্যক্তির চিকিৎসায় আমি হাজির থাকতে চাই।’ আহমদ মুসা বলল।

হাসল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ। বলল, ‘আপনার কথাই ঠিক স্যার। পুলিশের সিপাইরা তাঁর সম্মানের জন্যে যথেষ্ট নয়। আমি থাকছি আপনার সাথে।’

ঠিক এক ঘন্টা পরেই ডাক্তার তার কাজ শেষে বেরিয়ে গেল।

মালিক মেরারী মালুসকে ভিন্ন একটা বেডে সরিয়ে দিয়ে অপারেশন টেবিলটি নার্সরা সরিয়ে নিয়ে গেল।

আহমদ মুসা মুখোমুখি হলো মালিক মেরারী মালুসের। ডিপি খাল্লিকান খাচিপ পাশে এসে বসল।

‘মি. মালিক, পুলিশ কিন্তু আপনাকে গ্রেফতার করেনি। সুতরাং আপনি মিসিং একজন মানুষ। এটা করা হয়েছে দুনিয়া থেকে আপনাকে মিসিং করার জন্যে, যদি সত্য কথা না বলেন তবেই।’ আহমদ মুসা বলল।

মালিক মেরারী মালুস ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে থাকল। কোন কথা বলল না।

আহমদ মুসা পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে মালিকের সামনে তুলে ধরে বলল, 'পূর্ব আনাতোলিয়ার বাভিন্ন শহরে এই লাল ডটগুলোর অর্থ কী, মি. মালিক?'

মালিক মেরারী মালুস কাগজটা দেখে একটু যেন চমকে উঠেছিল। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। কিছুই বলল না।

জ্বলে উঠল আহমদ মুসার চোখ। কিন্তু পরক্ষণেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার চেহারা।

আহমদ মুসা তাকাল খাল্লিকান খাচিপের দিকে। বলল, 'প্লিজ আপনি একটা কম্পিউটার আনতে বলুন এখানে। দেখি মি. মালিক কথা না বললেও তার কম্পিটার কথা বলে কিনা।'

ডিপি খাল্লিকান খাচিপ ইন্টারকমে নির্দেশ দিল কম্পিউটার সেকশন থেকে সেকশনের রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ারকে একটা কম্পিউটার নিয়ে এখানে আসতে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একজন তরুণ কম্পিউটার এনে সেট করল।

খাল্লিকান খাচিপ তরুণকে দেখিয়ে বলল, 'সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এই ছেলেটি আমাদের কম্পিউটার উইং দেখাশুনা করে। সে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।'

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা পকেট থেকে কম্পিউটারের একটা হার্ড ডিস্ক বের করে ছেলেটির হাতে দিয়ে বলল, 'এই হার্ড ডিস্কটি সেট করে ফাইলগুলো ওপেন করো।'

'সিওর স্যার!' বলে তরুণটি কাজে লেগে গেল।

আহমদ মুসা, খল্লিকান খাচিপ, এমনকি মালিক মেরারী মালুসও তাকিয়ে আছে কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে। কিছুক্ষণ কাজ করার পর ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, মাত্র তিনটা উইনডো এবং তিনটা ফাইল দেখা যাচ্ছে। একটি ফাইল রেস্টুরেন্টের হিসাব-নিকাশ এবং দৈনন্দিন জমা-খরচ। দ্বিতীয় ফাইল একটি আঙুর বাগানের বিনিয়োগ, উৎপাদন ও বিক্রয়

বিষয়ক। আর তৃতীয় ফাইলটা বিভিন্ন ব্যাংকের একটা পার্সোনাল একাউন্টের বিবরণী। এছাড়া আর কিছু নেই, সবটাই ফাঁকা।'

''সবটাই ফাঁকা' না 'অন্ধকার'?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'স্যরি স্যার, অন্ধকার বলাই এ্যাপ্রোপ্রিয়েট। কারণ অবশিষ্টাংশের কোন দৃশ্যপট আমাদের সামনে নেই।'

'আচ্ছা বলত, এমন কি হতে পারে যে, এই হার্ড ডিস্কে আরও উইন্ডো আছে, ফাইল আছে, কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ না?' বলল আহমদ মুসা।

'এমনটা স্বাভাবিক নয় স্যার। গোপন ফাইল থাকলেও তার কোন না কোন একটা নাম পাওয়া যাবে। সে ফাইল খোলা যাবে না, কিন্তু সে ফাইলের নাম বা কোন সংকেত হার্ড ডিস্কে পাওয়া যাবে অবশ্যই।' ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি বলল।

'আচ্ছা হার্ড ডিস্কের কোন অংশ ডিজাবল করা যায় কিনা সাময়িক ভাবে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'সেটা করা যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তার জন্যে একটা প্রোগ্রাম বা ফাইল থাকবে। সে রকম কিছু দেখা যাচ্ছে না।' বলল ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি।

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। ভাবনার একটা ছাপ ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে।

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল আহমদ মুসা।

বলল, 'ইঞ্জিনিয়ার, তুমি কম্পিউটার থেকে ডিস্ক খুলে নাও।'

ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটা কম্পিউটার থেকে ডিস্ক খুলে নিল।

'ইঞ্জিনিয়ার, তুমি দেখ ডিস্কের কোন অংশে কোথাও টাচ বাটন আছে কিনা যা অন/অফ- এর কাজে ব্যবহার হতে পারে।' বলল আহমদ মুসা তরুণ ইঞ্জিনিয়ারকে লক্ষ্য করে।

অনেকটা সময় ধরে পরীক্ষা করল ডিস্কটিকে তরুণ ইঞ্জিনিয়ার। এক সময় তার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনন্দে। বলল সে আনন্দের সাথে, 'ক্যামোফ্লেজড একটা টাচ বাটন পাওয়া গেছে। মনে হয় এটাই সেই বাটন যা আপনি খুঁজছেন।'

‘ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার। বাটনটির রং কী ইঞ্জিনিয়ার?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘ধুসর।’ বলল ইঞ্জিনিয়ার।

‘ধুসর মানে ডাস্টি, ক্লাউডি। এটা নেতিবাচক শব্দ। অর্থাৎ কোন কিছু বন্ধ বা অফ থাকার ইংগিতবাহী। এখন বাটনটাকে টাচ বা প্রেস করে দেখতো বাটনটা স্বচ্ছ হয়ে উঠে কিনা।’ আহমদ মুসা বলল।

ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি বাটনটি টাচ করেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলল, ‘স্যার, বাটনটি স্বচ্ছ-ট্রান্সপারেন্ট হয়ে উঠেছে।’

‘আলহামদুলিল্লাহ্। এখন ইঞ্জিনিয়ার তুমি ডিস্কটি আবার কম্পিউটারে সেট করো।’ আহমদ মুসা বলল।

ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি হার্ড ডিস্কটি কম্পিউটারে সেট করেই সোৎসাহে বলে উঠল, ‘স্যার, নতুন উইন্ডো ওপেন হয়েছে। উইন্ডোটির নাম স্যার ‘আশার’ (Asher)।’

‘আশার (Asher)? ওটা হিব্রু শব্দ, অর্থ ‘ভাগ্যবান’ বা ‘আশীর্বাদপ্রাপ্ত’।’ আহমদ মুসা বলল।

কিন্তু উইন্ডো ওপেন করতে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি মন খারাপ করে বলল, ‘উইন্ডো ওপেনের জন্যে কম্পিউটার ‘পাসওয়ার্ড’ চাচ্ছে।’

আহমদ মুসা তাকাল মালিক মেরারী মালুসের দিকে। বলল, ‘তোমার গোপন উইন্ডো আমরা আবিষ্কার করেছি। এখন এর ‘পাসওয়ার্ডটা’ বল।’

মালিক মেরারী আগের মতই নিরব রইল। কম্পিউটারের দিক থেকে চোখটা সে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিল।

আবারও আহমদ মুসার চোখটা জ্বলে উঠল। বলল, ‘তোমাকে কথা বলাতে জানি মি. মালিক। কিন্তু তুমি আহত। একজন আহতের উপর আঘাত করার মত নির্দয় আমরা নই। কিন্তু আহতের আচরণ যদি আগ্রাসী, বেয়াদব বা বিদ্রোহাত্মক হয়ে ওঠে, তাহলে কিন্তু সে আর আহতের মর্যাদা পাবে না।’

বলেই আহমদ মুসা তাকাল খাল্লিকান খাচিপের দিকে। বলল, ‘ভাবুন তো পাসওয়ার্ডটা ওরা কী রাখতে পারে।’

‘বড় কঠিন বিষয় মি. আবু আহমদ। দেখছি মানুষ হিসাবেও ওরা ভীষণ জটিল। আমরা ওকে মুসলমান বলেই জানতাম। তার রেস্টুরেন্ট, বগান সর্বত্রই আরবী ও কুরানিক কোটেশনের ছড়াছড়ি। এখন দেখছি বেটা পাঁড় ইহুদি।’ বলল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

‘আপনারা খেয়াল করেননি অফিসার। ওর নামের ‘মালিক’ শব্দটাই শুধু আরবী। পরবর্তী ‘মেরারী’ ও ‘মালুস’ দুই শব্দই হিব্রু। যাক এবিষয়, এখন আমাদের দরকার আশার ইউন্ডোর ‘পাসওয়ার্ড’।’

বলে আহমদ মুসা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাবল। কয়েক মুহূর্ত পর চোখ খুলে মালিক মেরারীর দিকে চেয়ে বলল, ‘আপনি উইন্ডো বা ফাইলের নাম রেখেছেন ভাগ্যবান বা আশীর্বাদপ্রাপ্ত। তাহলে পাসওয়ার্ডটা হয় নিশ্চয় এর সাথে রিলেটেড এবং সেটা নাম বাচক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আচ্ছা, সে নাম বাচক শব্দ আপনাদের দলের নাম নয় তো!’

বলে তাকাল আহমদ মুসা ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটার দিকে। বলল, ‘তুমি পাসওয়ার্ডের জায়গায় টাইপ কর ‘SOHA-HAG’। এটা ওদের দুই সংগঠনের যৌথ নাম। ক্লিক করে দেখ কী রেজাল্ট আসে।’

ছেলেটি ক্লিক্ করে হতাশ চোখে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘স্যার, কম্পিউটার রিজেক্ট করছে।’

‘কী আর করা যাবে। ও. কে.।’

বলে আহমদ মুসা তাকাল মালিকের দিকে। বলল, ‘তোমাদের কাছে আশীর্বাদপ্রাপ্ত কী, আর্মেনিয়া না ইয়েরেভেন? আপনারা বলে থাকেন, বন্যার পানি নেমে গেলে হযরত নূহ আ. ‘কিস্তি’ থেকে প্রথমে আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভেনকে দেখতে পান। তাই ইয়েরেভেন আপনাদের কাছে বিশেষ আশীর্বাদপুষ্ট বলেই বিশেষ আনন্দ ও বিজয়ের প্রতীক।’

মালিক মেরারী মেলুসের চোখে-মুখে কোন প্রতিক্রিয়া নেই, তাই দুই চোখও সে বন্ধ রেখেছে।

আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠল। করুণার হাসি। বলল ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটাকে, ‘তুমি ইয়েরেভেন টাইপ কর। দেখ কম্পিউটার কী বলে।’

ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি 'ইয়েরেভেন' টাইপ করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কম্পিউটার প্রত্যাখ্যান করেছে।

আহমদ মুসা ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটার মুখ দেখেই বুঝল, তাদের এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। বলল, 'অভিজ্ঞতা তোমার কম ইঞ্জিনিয়ার। তাই উদ্বিগ্ন হচ্ছো। উদ্বেগের কিছু নেই। রক্ত-মাংসের জীবন্ত কম্পিউটার তো আমাদের হাতেই রয়েছে। এ কম্পিউটার থেকে কথা বের করতে 'পাসওয়ার্ড' লাগবে না, লাগবে শয়তানদের ঠিক করার যন্ত্র।'

কথা শেষ করেই আবার ফিরল মালিক মেরারীর দিকে। বলল, 'পূর্ব আনাতোলিয়ায় আপনাদের কাছে সবচেয়ে আশীর্বাদ প্রাপ্ত কী? প্লাবনের পর নূহ আ.- এর কিস্তি নোঙর করেছিল মাউন্ট আরারাতে। এই মাউন্ট আরারাতেই হযরত নূহ আ. পা রেখেছিলেন কিস্তি থেকে নামার পর। আর্মেনিয়া, ইয়েরেভেন নয়, মাউন্ট আরারাতই তাহলে আপনাদের কাছে সবচেয়ে বেশি আশীর্বাদপ্রাপ্ত, পবিত্র স্থান। ও এই কারণে আপনারা আপনাদের গায়ে মাউন্ট আরারাতের উল্কিও পরেন! কথাটা আমার আগে মনে হয়নি কেন!'

আহমদ মুসা একটু থেমে আবার বলে উঠল 'ইঞ্জিনিয়ার, এবার 'আরারাত'কে পাসওয়ার্ড বানাও।'

'স্যার, এটাই কিন্তু লাস্ট অপশন। এবার ব্যর্থ হলে গোপন উইন্ডো দেখা আর হবে না।' বলল ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

'চিন্তা নেই, তুরুপের তাস এবার হয়তো পেয়ে গেছি। ভয় করছ কেন, বলেছি তো জীবন্ত কম্পিউটার আমাদের হাতে আছে।' আহমদ মুসা বলল।

ওদিকে শুয়ে পড়েছে মালিক মেরারী মালুস। প্রথম বারের মত তাকে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। তার চোখে-মুখে অস্থিরতা।

ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি 'আরারাত' টাইপ করার পর ক্লিক করেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'আল্লাহু আকবার!'

খাল্লিকান খাচিপও আনন্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল চিৎকার করে, 'স্যার, আমার সাধ্যের মধ্যে থাকলে মিরাকল মেধার জন্যে আপনাকে আমি নোবেল পুরস্কার দিতাম।'

‘নোবেল নয় আমি বেহেশত পুরস্কার চাই মি. খাচিপ। যাক ইঞ্জিনিয়ার। তুমি শোন, এবার গোপন উইন্ডোর সবগুলো ফাইল ওপেন করো।’

বলে আহমদ মুসা চেয়ার টেনে নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটির পাশে বসল।

প্রথম ফাইলটার নাম দেখে চমকে উঠল আহমদ মুসা। ফাইলটির নাম: ‘সোর্ড অব গড: ফাইনাল সলিউশন।’ ফাইলটার নামের মধ্যেই হিংস্রতার উৎকট গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এই হিংস্রতার টার্গেট কে কিংবা কী?

আহমদ মুসার এই ভাবনার মধ্যেই ফাইলটির প্রথম পাতা খুলে গেল।

প্রথম পাতায় একটা শিরোনাম, ‘OS: Sword.’

শিরোনামের নিচে পূর্ণ পৃষ্ঠা প্রো-ফর্মায় তৈরী ডিজিটাল স্টেটমেন্টের মত কিছু।

‘এখানেই রাখ, পাতাটা দেখে নেই, কী আছে এতে।’

বলে আহমদ মুসা মনোযোগ দিল প্রো-ফর্মার দিকে।

ভার্টিক্যাল দিক থেকে মাত্র তিনটি কলাম। প্রথম কলাম ‘নাম’, দ্বিতীয় কলাম ‘সোর্ডস’ এবং তৃতীয় কলাম ‘টার্গেট’। নামের ঘরে হোরাইজেন্টালি আঁকা ২৪টি লাইনে এক থেকে ২৪টি নাম্বার সিরিয়ালি বসানো। ‘সোর্ডস’- এর ঘরে নামের ঘরে বসানো প্রতি নাম্বারের বিপরীতে লিখা দুই অথবা তিনটি করে ইংরেজী বর্ণ ক্যাপিটাল লেটারে। আর ‘নাম’ ও ‘সোর্ডস’ বরাবর ‘টার্গেট’- এর ঘরে ডিজিটাল অংশ বসানো হয়েছে ভগ্নাংশের আকারে। যেমন প্রথম নাম নাম্বার ‘১’ এরপর ‘সোর্ডস’- এর ঘরে লিখা ‘২’। তারপরেই টার্গেট এর ঘরে লিখা ১০০০- এর উপরে পঁচিশ অর্থাৎ পঁচিশ বাই এক হাজার। টার্গেটের ২৪টি ঘরে কোথাও ১০ বাই ৫০০, কোথাও ১০০ বাই ৫০০০, ইত্যাদি লিখা।

আহমদ মুসা নিশ্চিত যে, এটা একটা পরিকল্পনা, ধাঁধাঁর আড়ালে রাখা হয়েছে।

‘পরবর্তী পেজে যাও ইঞ্জিনিয়ার।’ বলল আহমদ মুসা।

দ্বিতীয় পাতা ওপেন করল ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি।

দ্বিতীয় পাতাটির উপর চোখ পড়তেই আহমদ মুসার চোখ দু’টি উজ্জল হয়ে উঠল। দেখল, এটা সেই রহস্যপূর্ণ ছক যেটা তার কাছে আছে। পূর্ণ পৃষ্ঠার

নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় কালো বৃত্ত। কালো বৃত্তের মধ্যে নাম্বার। আর কোন বৃত্তের এক পাশে একটি রেড ডট, কোথায় দু'পাশে দুইটি রেড ডট। এভাবে কোথাও তিন পাশে তিনটি, কোথাও চার পাশে চারটি রেড ডট।

'ইঞ্জিনিয়ার, তুমি ছোট কালো বৃত্তগুলোর নাম্বার সিরিয়ালি গুণে দেখ, বৃত্তের সংখ্যা এবং তার নাম্বারের সংখ্যা এক সমান কিনা।'

দশ সেকেন্ডের মধ্যেই ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটা আহমদ মুসাকে বলল, 'স্যার, কালো বৃত্ত এবং নাম্বারের সংখ্যা সমান।'

'তার মানে কালো বৃত্তগুলোর নাম হলো ঐ নাম্বারগুলো। বৃত্তগুলো তাহলে কী?'

বলে আহমদ মুসা তাকাল কালো বৃত্তগুলোর অবস্থানের দিকে।

গভীর ভাবনার চিহ্ন আহমদ মুসার চোখে মুখে। বলল সে ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটাকে, 'তুমি পূর্ব আনাতোলিয়ার একটা মানচিত্র সামনে আন।'

সংগে সংগেই পূর্ব আনাতোলিয়ার মানচিত্র কম্পিউটার স্ক্রিনে নিয়ে এল।

'ইঞ্জিনিয়ার, মি. খাল্লিকান খাচিপ, দেখুন কালো বৃত্তগুলোকে পূর্ব আনাতোলিয়া বিশেষ করে পূর্ব প্রান্তের প্রদেশগুলোর উল্লেখযোগ্য স্থান বা শহরগুলোর অবস্থানের সাথে মেলানো যায় কিনা।' বলল আহমদ মুসা।

কিছুটা সময় মিলিয়ে দেখার পর খাল্লিকান খাচিপ বলল, 'স্যার, কারসের কয়েকটি, আগ্রির কয়েকটিসহ ইজদির প্রদেশের ২৪টি শহরের সাথে কালো বৃত্তের অবস্থান হুবহু মিলে গেছে।'

'আল্-হামদুলিল্লাহ্। প্রথম কলামের রহস্য উদ্ধারে আমরা সফল। নাম অর্থাৎ জায়গার নাম আমরা পেয়ে গেছি। এখন দ্বিতীয় কলাম দেখুন। কলামের 'সোর্ডস' মানে 'তরবারী' বা 'আর্মস'। এই 'তরবারী' বা 'আর্মস'- এর কাছাকাছি আর কি হতে পারে? এর অর্থ বের হবার উপরই নির্ভর করছে ডাবল বা ট্রিপল ইংরেজি বর্ণগুলোর অর্থ কী!' আহমদ মুসা থামল।

অন্য সবাই নিরব। ভাবছিল আহমদ মুসা। ভাবছিল সবাই।

আহমদ মুসা কথা বলল আবার। বলল, 'সোর্ড বা অস্ত্র যারা চালায় তারাও এক অর্থে সোর্ড বা অস্ত্র। বরং তারাই প্রকৃত সোর্ড বা অস্ত্র। এই অর্থ গ্রহণ করার

পর পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ডাবল বা ট্রিপল বর্ণের যে গুচ্ছ রয়েছে তা এক একটি করে নাম। তবে বর্ণগুচ্ছের সংকেত থেকে নাম উদ্ধারের সাধ্য আমাদের নেই।' বলে আহমদ মুসা থামল আবার একটু।

তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। মনে মনে সে বলল, নামগুলো নিশ্চিতভাবে তাদের বাহিনীর অফিসারদের হবে। যেমন মাউন্ট আরারাত পয়েন্টে কর্নেল মোস্তফা ছিল। তার সাথে নিশ্চয় আরও একজন কেউ আছে। কারণ মাউন্ট আরারাতে পয়েন্টে বর্ণের দু'টি গুচ্ছ। একটিতে MM, অন্য গুচ্ছটিতে AB, প্রথমটির অর্থ হলো মোস্তফা মিকাহ্- এই দুই শব্দের আদ্যাক্ষর। AB হবে নিশ্চয় অন্য দুই শব্দের আদ্যাক্ষর। সুতরাং স্থানের নামের সাথে এই 'বর্ণগুচ্ছ' আর্মি হেডকোয়ার্টারে পাঠালে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এদের নাম জানা যাবে। এ-নিয়ে তেমন চিন্তা নেই। এখন বের করতে হবে তৃতীয় কলাম 'টার্গেট'- এর অর্থ।

আহমদ মুসা কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল, তার আগেই কথা বলে উঠল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ। বলল, 'স্যার, আপনি নিরব হওয়া ভয়ের কথা। আমরা কি সামনে এগুতে পারছি না?'

'আল্লাহ্ কারো পথ বন্ধ করেন না, যদি সে চেষ্টা করে সামনে এগোবার। আমরা চেষ্টা বাদ দেইনি। এখন আসুন আমরা তৃতীয় কলাম দেখি। তৃতীয় কলাম-এর 'টার্গেট' এর অর্থ আমরা সকলেই জানি যে, লক্ষ্যবস্তু। কিসের লক্ষ্যবস্তু বলুন তো?' একটু থামল আহমদ মুসা।

'কলাম'- এর দিক থেকে বোঝা যাচ্ছে লক্ষ্যবস্তুটা হলো 'সোর্ড'- এর।' বলর খাল্লিকান খাচিপ।

'ধন্যবাদ অফিসার। এর পরের প্রশ্ন হলো। 'সোর্ড' হলো ঘাতক অস্ত্র। এর লক্ষ্যবস্তুর উপযুক্ত নাম কি হতে পারে?'

একটু থামল আহমদ মুসা। সবাই নিরব।

আহমদ মুসাই কথা বলল আবার, 'সোর্ড-এর লক্ষ্যবস্তুর উপযুক্ত নাম হতে পারে 'ভিকটিম'। সুতরাং...।'

'ঠিক বলেছেন স্যার। ধন্যবাদ আপনাকে। এ সহজ বিষয়টা আমার মাথায় আসেনি।' বলর ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

'থ্যাংকস আফিসার। 'সোর্ডস'- এর লক্ষ্যবস্তু যদি 'ভিকটিম' হয়, তাহলে টার্গেট কলামে যে সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, তা ভিকটিমদের সংখ্যা। এই অর্থটা খুবই পরিষ্কার। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করেছে ভগ্নাংশ সংখ্যা, অর্থাৎ ২৫ বাই ১০০০, ১০ বাই ৫০০ ইত্যাদির অর্থ কী?' থামল আহমদ মুসা।

কারও মুখে কোন কথা নেই। ভাবছে আহমদ মুসা। ভাবছে সবাই।

ভাবনার মধ্যেই মুখ তুলল আহমদ মুসা।

তার চোখে আশের আলো জ্বলছে। বলল সে, 'মি. মালিক মেরারী, 'এই ভগ্নাংশের মধ্যে কি রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন?'

কথা বলল না মালিক মেরারী মালুস। কিন্তু তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে হিংস্র দৃষ্টি।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'জানি, আপনার খুব ইচ্ছা করছে গুলি করে আমার খুলিটা উড়িয়ে দিতে।'

বলেই আহমদ মুসা তাকাল ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটার দিকে। বলল, 'বলত, টেন বাই হন্ড্রেড বা এ ধরনের অংকের কত রকম অর্থ হতে পারে?'

'স্যার, এর সাধারণ অর্থ দশ এর একশ ভাগের একভাগ। অন্য অর্থেও এর ব্যবহার হয়। যেমন, ১০০ জনের মধ্যে ১০ জন, এই অর্থ মেলাতেও এমনটা লেখা হয়।' ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটা বলল।

'আমরা টার্গেটের কী অর্থ করেছি?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'ভিকটিম।' বলল ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি।

'আচ্ছা, এখন দশ বাই হানড্রেড- এর যে অর্থ করলে তার আগে 'ভিকটিম' শব্দটা বসাও। দেখ বক্তব্যটা কী দাঁড়াচ্ছে।' আহমদ মুসা বলল।

'বক্তব্যও দাঁড়াচ্ছে, ভিকটিম ১০০ জনের মধ্যে দশজন।' বলল ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি।

'ধন্যবাদ, তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে, টার্গেট- এর ঘরে যে সংখ্যাগুলো রয়েছে, তার মধ্যে যে সংখ্যাগুলো উপরে রয়েছে, সেগুলো বিভিন্ন স্থানে ভিকটিম- এর সংখ্যা। কিন্তু নিচের অংকগুলোর অর্থ কী?' থামল আহমদ মুসা।

‘জটিলতা একটার পর আরেকটা। ভিকটিম উপরেরটা হওয়ার পর নিচের অংকগুলো এই কলামের জন্যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। এই অংকগুলো বোধ হয় ক্যামোফ্লেজের জন্যে।’ বলল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

‘তা মনে হয় না অফিসার। আচ্ছা দেখুন, টার্গেট কলামের ‘ভিকটিম’ মানে ‘মানুষ ভিকটিম।’ এই মানুষ ভিকটিমরা নিচের সংখ্যাগুলোর অংষ, সেটা অর্থ থেকেই বুঝা যাচ্ছে। যদি তাই হয়, তাহলে নিচের অংকগুলোও এবং মানুষের সংখ্যাও একই। তাই হয় কিনা?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক তাই। ধন্যবাদ আপনাকে।’ বলল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

‘ধন্যবাদ, তাহলে অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ১০০ জনের মধ্যে ভিকটিম ১০ জন। এখন গোটা পেজ নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে আমরা দেখব ধাঁধাঁর মধ্যে দিয়ে যে কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে অমুক স্থানে অমুকের দ্বারা এতজনের মধ্যে ভিকটিম হবে এতজন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওয়ান্ডারফুল! ওয়ান্ডারফুল!’ বলে হাততালি দিয়ে উঠল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

ঠিক এই সময়েই কঁকিয়ে উঠল মালিক মেরারী মালুস। যেন মাথায় তার তীব্র ব্যথা। অস্থির সে।

তার দিকে এগিয়ে গেল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

‘আমার মাথার টুপি খুলে ফেলুন। মাথাটা ফেটে গেল।’ চিৎকার করে বলতে লাগল মালিক মেরারী মালুস।

‘তোমার আবার মাথায় কী ঘটল? দেখি।’ বলে ডিপি খাল্লিকান খাচিপ টুপি খুলতে গেল মালিক মেরারী মালুসের।

আহমদ মুসা শান্তভাবে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল মালিক মেরারী মালুসের দিকে। কিন্তু তার মনে হলো, তার বেদনাকাতর বিলাপের সাথে তার চোখের ভাব প্রকাশের কোন মিল নেই। তাহলে তার এটা অভিনয়? উদ্দেশ্য? টুপি খুলতে বলছে কেন? কোন ফাঁদ? কী হতে পারে? ঠিক বুঝতে পারলো না আহমদ মুসা। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারল যে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

ডিপি খাল্লিকান খাচিপ টুপিতে হাত দিতে যাচ্ছিল।

‘টুপিতে হাত দেবেন না মি. অফিসার।’ দ্রুত আদেশের সুরে বলল আহমদ মুসা।

হাত থমকে গেল ডিপি খাল্লিকান খাটিপের। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘কিন্তু স্যার...?’

আরও ভাবছিল আহমদ মুসা। টুপির মধ্যে যদি বিপদ থাকে। তাহলে সেটা আসবে কিভাবে? সে টুপি খুলতে বলছে, তার মানে টুপি খোলার সময় টুপির বেজ অংশ বর্ধিত হওয়ার ফলেই নিশ্চয় বিপদটা আসবে। সুতরাং, টুপির বেজ অংশ বর্ধিত হবার সুযোগ না দিয়ে যদি টুপিটা খোলা যায়, তাহলে বিপদ আসবে না, অন্যদিকে জানা যাবে টুপির ভেতরের রহস্য।

আহমদ মুসা ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটাকে খুবই ছোট একটা কাঁচি আনতে বলল।

ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটা দৌড়ে গিয়ে একটা ক্ষুদ্র কাঁচি নিয়ে এল।

আহমদ মুসা কাঁচি নিয়ে এগুলো মালিক মেরারীর দিকে। বলল, ‘মি. মালাক, হাত দিয়ে টুপি খুলতে গেলে আপনার কষ্ট লাগবে। আস্তে করে বেজ- এর ইলাস্টিক কেটে দিয়ে টুপিটা আপনার মাথা থেকে তুলে নেয়া হলে আপনি জানতেও পারবেন না।’

মালিক মেরারীর চোখে আগুন। দু’পাশে রাখা আহত দু’হাত নাড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

আহমদ মুসার কাঁচি যখন এগুলো, মানে আহমদ মুসা তার বেডের পাশে পৌঁছাল, সংগে সংগেই সে এক বিকট চিৎকার দিয়ে উঠে দুই আহত হাত উপরে তুলে মাথার টুপি খুলতে গেল।

আহমদ মুসার চোখ মালিক মেরারীর আগুন-ঝরা চোখের দিকে নিবদ্ধ ছিল। কী ঘটতে যাচ্ছে তা বুঝতে পারল আহমদ মুসা।

মালিক মেরারীর আহত হাত দু’টি টুপির কাছে পৌঁছার আগেই আহমদ মুসার বাম হাত পকেট থেকে রিভলভার নিয়ে গুলি করল মালিক মেরারীকে। গুলি গিয়ে লাগল মালিক মেরারীর বুকে। মালিকের দুই হাতকে যেহেতু এক সাথে গুলি করা যায় না, তাই তাকে নিবৃত্ত করার জন্যে বুকে গুলি না করে উপায় ছিল না।

মালিক মেরারীর উঠে আসা দুই হাত আছড়ে পড়ল দু'পাশে।

তার হাত দু'টি আছড়ে পড়ার মতই মালিক মেরারীও শেষ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই।

মুহূর্তেই ঘটে গেল গোটা ঘটনা। বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল উপস্থিত ডিপি খাল্লিকান খাচিপ এবং ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটা।

বিস্ময় কাটিয়ে উঠে ডিপি খাল্লিকান খাচিপ বলল, 'অকল্পনীয় ধরনের বেপরোয়া লোকটা, অদ্ভুত তার নার্ভ। কিন্তু তার টুপিতে কী আছে? কী করতে যাচ্ছিল সে?'

'টুপিতে ভয়াবহ ঘাতক ধরনের কিছু আছে যা দিয়ে সে আমাদের মারতে চেয়েছিল, যাতে আমরা যে রহস্য ভেদ করেছি, তা আর কেউ জানতে না পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'কী এমন ঘাতক থাকতে পারে সেখানে?' বলল খাল্লিকান খাচিপ।

'আচ্ছা দেখা যাক।' বলে আহমদ মুসা মালিক মেরারী মালুসের মাথার দিকে এগুলো। টুপির বেজটা আস্তে করে কাঁচি দিয়ে কেটে দিল আহমদ মুসা। টুপির এক পাশ ঢিলা হয়ে গেল। বিপরীত পাশের ইলাস্টিক তখনও মাথার কাপড়ে আটকে আছে। ওপাশের টুপির ইলাস্টিক বেজটা কেটে দিল আহমদ মুসা। এরপর আলতোভাবে টুপিটা খুলে ফেলল। টুপির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ভয়ংকর পয়জন বোমা। ক্ষুদ্র বোমার গায়ের সাংকেতিক মার্ক দেখেই বুঝতে পারল আহমদ মুসা। বোমা থেকে সুক্ষ একটি বৈদ্যুতিক তার চার ভাগ হয়ে টুপির চারদিকের বেজ ইলাস্টিকের সাথে গিয়ে মিশেছে। যেখানে মিশেছে, সেখানেই সুক্ষ্ম বৈদ্যুতিক তারের সাথে ডেটোনেটর ফিট করা আছে। ইলাস্টিকে টান পড়লেই ডেটোনেটরের দুই পিন একে অপরকে স্পর্শ করবে এবং বৈদ্যুতিক তারের নেগেটিভ-পজিটিভ এক সাথে ক্লিক করার সাথে সাথেই পয়জন বোমার বিস্ফোরণ ঘটবে। ভাবতেই শিউরে উঠল আহমদ মুসা।

বোমাটা সবাইকে দেখিয়ে পয়জন বোমার টেকনোলজিটা সবাইকে বুঝিয়ে বলল আহমদ মুসা, 'টুপির বেজ ইলাস্টিকে সামান্য টান পড়লেই বোমার

ডেটোনেটর ক্লিক করতো এবং তখন ভয়ংকর পয়জন বোমার বিস্ফোরণ ঘটে যেত।'

ডিপি খাল্লিকান খাচিপ এবং ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটার মুখ আতংকে চুপসে গেল।

'আমাদের মারলে সেও তো মরতো।' ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

'না, সে যদি মুখ, নাক ও চোখ বন্ধ করে দেড় মিনিট থাকতে পারতো, তাহলে সে বেঁচে যেত। বোমাটার ক্রিয়াকাল মাত্র দেড় মিনিট। এই দেড় মিনিটে এই বোমা দশ বর্গফুট এলাকার মানুষসহ সকল জীবের প্রাণ হরণ করতে পারে। এর কোন ধোঁয়া নেই। এর অদৃশ্য পয়জন-ওয়েভ চোখের পলকে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।' আহমদ মুসা বলল।

'নিশ্বাস বন্ধ রাখার জন্যে মুখ, নাক বন্ধ রাখার প্রয়োজন আছে। কিন্তু চোখ বন্ধ রাখা কেন?' বলল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

'বোমার পয়জন-ওয়েভ মানুষের দৃষ্টিও অন্ধ করে দিতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

আঁৎকে উঠল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ। বলল, 'সাংঘাতিক অস্ত্র। মালিক লোকটা তাহলে আমাদেরকে মেরে ফেলে পালাবার একটা ব্যবস্থা রেখেই দিয়েছিল। ভয়ানক লোক। আড্ডা গেড়েছিল দেখছি ঠিক জায়গায়!'

'ভয়ানক লোক তো বটেই। কথা বলানো গেল না শেষ পর্যন্ত। আমাদের সব প্রশ্নের সমাধান আমরা পেলাম না।' আহমদ মুসা বলল।

'সব রহস্যের জট তো আপনি খুলেই ফেলেছেন। বড় কী তেমন বাকি আছে?' জিজ্ঞাসা খাল্লিকান খাচিপের।

'রহস্যের শেষ তালাটা খোলা বাকি আছে। অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর রহস্যের শেষ তালাটা খোলা না গেলে জানা যাবে না। ভিকটিম যাদের মধ্যে থেকে হবে, সেই লোকরা কারা? কবে, কিভাবে ভিকটিম হওয়ার ঘটনা ঘটবে? এর উদ্দেশ্যই বা কী? সোর্ডস- মানে আক্রমণকারী, যারা কিছু লোককে ভিকটিম বানাবে, তারা কারা? কেন, কিভাবে তারা এটা করবে? ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই।'

বলে আহমদ মুসা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। চোখ দু'টোও বুজে গেল তার। তার চেহারায় নেমে এলো গভীর ছায়া।

কিছুক্ষণ পর চোখ খুলল আহমদ মুসা। বলল, 'মি. খাল্লিকান খাচিপ, এ বিষয়টা তো পরিষ্কার হয়েছে, একদিকে তাদের উদ্দেশ্য যেমন মাউন্ট আরারাতের স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার, অন্যদিকে তাদের ষড়যন্ত্রটা রাজনৈতিকও।

দেখা যাচ্ছে শহর ও আধাশহর এলাকাতেই তারা ঘটনা ঘটাবে। যাদের ভিকটিম বানাবে বা ঘটনার অস্ত্র হবে, তাদের সংখ্যা কোথাও দু'য়ের বেশি নয়। মাত্র একজন বা দু'জন, কোথাও দু'শ, কোথাও একশ, পাঁচশ জনকে ভিকটিম বানাবে কী করে? এ থেকে বুঝা যায় একজন বা দু'জন লোক যাদের ভিকটিম বানাবে, তারা একাই একশ বা এ হাজারের মত। এমন লোক কারা হতে পারে মি. খাল্লিকান খাচিপ?'

'পুলিশ বা সেনারা হতে পারে।' খাল্লিকান খাচিপ বলল।

'ঠিক বলেছেন মি. খাল্লিকান খাচিপ। তাহলে এখন দেখতে হবে, যেস্থানে সোর্ডস হিসাবে দুই বা ততোধিক বর্ণমালার আড়ালে যাদের নাম আছে, সে স্থানে পুলিশ অফিসার ও সেনা অফিসারদের মধ্যে ঐ বর্ণমালার সাথে মিলে এমন কে কে আছেন। এদেরকে ডিটেক্ট করাটাই এখনকার প্রধান কাজ।' বলল আহমদ মুসা।

'ইউরেকা! ইউরেকা মি. আবু আহমদ, স্যার! আপনি ধাঁধাঁর জট ভেঙে ফেলেছেন। এখন যে কাজটার কথা বলেছেন, তা খুবই সহজ। পুলিশ অফিসারদের নাম আমি দু'এক ঘন্টার মধ্যেই দিতে পারব। সেনা অফিসারদের নামগুলোও যোগাড় করা যাবে।' ডিপি খাল্লিকান খাচিপ বলল। আনন্দের উচ্ছ্বাস তার কণ্ঠে।

'আপনি পুলিশ অফিসারদের নাম যোগাড় করুন। সেনা অফিসারদের নাম আমি যোগাড় করছি।' আহমদ মুসা বলল।

বলেই আহমদ মুসা তার মোবাইলে কল করল জেনারেল মেডিন মেসুদকে।

আহমদ মুসার কণ্ঠ পেতেই জেনারেল মেডিন মেসুদ ওপার থেকে সালাম দিয়ে বলল, 'কনগ্রাচুলেশন মি. আবু আহমদ। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে আপনি

সমস্যা সমাধানের প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। এখন আপনার চাই স্থানগুলোর বিপরীতে আদ্যাক্ষরের সংকেতে যাদের নাম আছে, তাদের নাম। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'আপনি জানলেন কি করে এ সব?' বলল আহমদ মুসা।

'গোপন ব্যাপারটা সহজ! আপনাকে বললে ক্ষতি নেই।'

একটু থামল জেনারেল মেডিস মেসুদের কণ্ঠ। বলল আবার, 'যে ছেলেটা কম্পিউটারে আপনাকে সহযোগিতা করছে, সে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের লোক। মি. মালিকের রেস্টুরেন্টেও আমাদের গোয়েন্দা অফিসার ছিল। ইজদিরের সে হোলি আরারাত হোটেলেও আমাদের লোক ছিল।'

'ওরা কি কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের জন্য?' বলল আহমদ মুসা। তার মুখে হাসি।

'আস্তাগফিরুল্লাহ্! কী বলেন স্যার! ওরা আপনার নিরাপত্তার জন্যে।' জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

'ধন্যবাদ জেনারেল। এবার কাজের কথা বলুন।' বলল আহমদ মুসা।

'স্থানগুলোতে সাংকেতিক বর্ণমালার আড়ালে যে অফিসারদের নাম পাওয়া যাবে, তার তালিক শীঘ্রই আপনাকে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, কী হতে যাচ্ছে স্থানগুলোতে? এটা জানা খুবই জরুরী।' বলল আহমদ মুসা।

'আসলেই খুবই জরুরী।' জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

'আপনি তালিকাটা তাড়াতাড়ি পাঠান জেনারেল। আমার ধারণা সঠিক হলে ঐ চিহ্নিত অফিসাররা ইতমধ্যেই ব্রীফ পেয়ে গেছে। সুতরাং জানার একটা পথ বের হবেই।' আহমদ মুসা বলল।

'পেয়ে যাবেন স্যার। আজ রাত শেষ হবার আগেই পেয়ে যাবেন। আমরা খুব উদ্বিগ্ন স্যার। মার খেতে খেতে ওদের দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে। বড় কোন অঘটন ওরা যে কোন সময় ঘটিয়ে বসতে পারে।' বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

'আল্লাহ্ ভরসা। ওরা ধ্বংসের জন্যে, আর আমরা ভালোর জন্যে কাজ করছি। আল্লাহ্'র সাহায্য আমাদের সাথেই থাকবে।'

‘আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তাই করুন।’ বলল জেনারেল মেসুদ।

‘আমীন। ওকে জেনারেল, রাখি। আস্-সালামু ‘আলাইকুম।’ বলে সালাম নিয়ে মোবাইলের কল অফ করে দিল আহমদ মুসা।

৭

রাত ৩টা। ইজদির প্রদেশের রাজধানী শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছল আহমদ মুসার গাড়ি।

গাড়ি ড্রাইভ করছে আহমদ মুসা। তার পাশের সীটে বসা পূর্ব আনাতোলিয়ার পুলিশের ডাইরেক্টর জেনারেল মাহির হারুন, আর পেছনের সীটে বসা ইজদিরের পুলিশ প্রধান ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

উপরের নির্দেশ পেয়ে রাত দু'টার দিকে এসে পৌঁছেছেন ডিজিপি মাহির হারুন আহমদ মুসার সাথে অভিজানে যোগ দেবার জন্যে।

আহমদ মুসাদের অভিযানের লক্ষ্য হলো ইজদিরের সেনা গ্যারিসনের প্রধান ব্রিগেডিয়ার সেলিম আস সুয়ুতি এবং ইজদির সেনা ইউনিটের কমব্যাট আর্মির প্রধান কর্নেল জালাল জহির উদ্দিনের বাড়ি। তাদের দু'জনকেই গ্রেফতার করতে হবে এই রাতেই। ইজদিরের 'সোর্স' হিসাবে যাদের নাম আছে, তারা এই দু'জনই।

আহমদ মুসা রাত আড়াইটার দিকে সোর্ডসদের তালিকা পেয়েছে। সেই সাথে মেডিন মেসুদ এবং জেনারেল মোস্তফা আহমদ মুসাকে জানিয়েছে, তারা আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভেনে পোস্টেড তাদের এজেন্টের কাছে এটুকু জানতে পেরেছে যে, আগামী কাল সকালে পূর্ব আনাতোলিয়ায় বড় একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ইয়েরেভেনের সরকারী মহল খুব খুশি। ইতোমধ্যে আর্মেনিয়া থেকে বহু সাংবদিক চোরাই পথে পূর্ব আনাতোলিয়ার বিভিন্ন শহরে প্রবেশ করেছে। তারা তাদের নিজের খরচে বিদেশী সাংবাদিকদেরও নিয়ে এসেছে।

সাংবাদিক বিশেষ করে বিদেশী সাংবাদিক আসার খবরে আঁৎকে উঠেছে আহমদ মুসা। তার মনে হয়েছে, নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ খবর হওয়ার যোগ্য কিছু এখানে ঘটতে যাচ্ছে। মালিক মেরারী মালুসের কম্পউটারে পাওয়া পরিকল্পনায় যে ভিকটিমের সংখ্যা আহমদ মুসা পেয়েছে, সেটা বেশ বড়। এত বড় হত্যার ঘটনা

ঘটলে সেটা অবশ্যই এসটা মহাখবর হবে। কিন্তু কারা হত্যা করবে? সোর্ডরা? কেন হত্যা করবে? কাদের হত্যা করবে? তাদের কোথায় পারে? ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে আহমদ মুসা আবার অনেক ভেবেছে। কিন্তু উত্তর পায়নি। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে গ্রেফতার করে তাদের কাছ থেকে কিছু জানা যায় কিনা।

এরপরেই আহমদ মুসারা ছুটে এসেছে ইজদিরে। ব্রিগেডিয়ার সেলিম আস সুয়ুতি এবং কর্ণেল জালাল জহির উদ্দিনের গ্রেফতার থেকে যে রেজাল্ট পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে রাতের মধ্যেই মালিক মেরারী মালুসের কম্পউটারে পাওয়া পরিকল্পনায় উল্লেখিত সব স্থনের, সব 'সোর্ডস'দের গ্রেফতার করা হবে। ওদের সকলের নাম ও লোকেশান চিহ্নিত করা হয়েছে। আহমদ মুসার গাড়ি প্রবেশ করল ইজদির শহরে।

আহমদ মুসার পামে বসা ডিজিপি মাহির হারুনের দিকে চেয়ে বলল, 'মি. মাহির হারুন, ব্রিগেডিয়ার সেলিম আস সুয়ুতি এবং কর্ণেল জালাল জহির উদ্দিনের বাড়ির অবস্থা কী?'

'স্যার, আমাদের গোয়েন্দারা তাদের দু'জনের বাড়িই ঘিরে রেখেছে। ব্রিগেডিয়ার সেলিম রাত সাড়ে দশটায় এবং কর্ণেল জালাল রাত ১১ টায় বাড়িতে প্রবেশ করেছে। তারপর বাড়িতেই আছে।' বলল পূর্ব আনাতোলিয়ার ডাইরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মাহির হারুন।

'কথা ছিল যে, তারা ব্রিগেডিয়ার ও কর্ণেল দু'জনেরই গেটের প্রহরীসহ সেনা অফিসারদের কৌশলে বন্দী করে গেটের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে রাত ৩ টার মধ্যেই এবং দুই অফিসারেরই শয়নকক্ষকে লোকেট করবে এবং কক্ষের সকল এন্ট্রি ও এক্সিট পয়েন্টের উপর নজর রাখবে, এটা কত দূর হয়েছে?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'স্যার, পাঁচ মিনিট আগে আমি ওদের সাথে কথা বলেছি। কাজগুলো সবই ঠিকমত হয়েছে। বাড়ির চারদিক ঘিরে রাখাসহ দুই সেনা অফিসারের শয়নকক্ষকে চোখে চোখে রেখেছে।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

'ধন্যবাদ।' আহমদ মুসা বলল।

ইজদির শহর অতিক্রম করছে আহমদ মুসার গাড়ি। শহরের পূবে পাহাড় ঘেরা একটা সুন্দর সমতল উপত্যকায় ইজদিরের সেনা গ্যারিসন।

এই উপত্যকা ঘিরে পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে সেনা অফিসারদের আবাসস্থল।

গ্যারিসনে ঢোকার পরই পাশাপাশি দু'টি টিলার মাথায় রয়েছে ব্রিগেডিয়ার এবং কর্ণেলের বাসা।

গ্যারিসনে ঢোকার পর উপত্যকার ডান পাশে দুই পাহাড়ের মাঝখানের কয়েকটি টিলার প্রথমটিতেই ব্রিগেডিয়ার সেলিম আস সুয়ুতির বাসা। তার পরের টিলাতেই কর্ণেল জালাল জহির উদ্দিনের বাসা।

উপত্যকা থেকে গাড়ির রাস্তা এঁকে-বেঁকে টিলার মাথায় বাড়ির একদম গাড়িবারান্দায় গিয়ে উঠেছে।

বাড়ির সীমানা প্রাচীরটা গ্রীলের। গেটও গ্রীলের। গেটের পাশেই একটা ছোট কক্ষ। সিকউরিটির লোকদের বসার জায়গা ওটা। গেট রুমে কেউ নেই বলেই তাদের বাধা পেতে হয়নি। নিজেরাই গেট খুলে ভেতরে এসেছে।

গেট থেকে গাড়ি বারান্দার দূরত্ব একশ গজের কম হবে না।

আহমদ মুসার গাড়ি ব্রিগেডিয়ার সেলিমের বাড়ির গাড়িবারান্দায় পৌছতেই ডিজিপি মাহির হারুনের ওয়্যারলেস বিপ বিপ শব্দ করে বলল, 'আমাদের লোকরা জানাচ্ছে, ব্রিগেডিয়ার সেলিম ও আরেকজন ঘর থেকে বেরিয়েছে। সম্ভবতঃ ওরা বাইরে বেরুবে। আমাদের লোকরা ওদের আটকাবে কিনা জানতে চাচ্ছে।' ডিজিপি মাহির হারুনের কণ্ঠে উদ্বেগ।

'বাধা দিতে নিষেধ করুন। ওরা বাইরে আসুক। আমরা গাড়িটা একটু আড়ালে নিয়ে যাচ্ছি। ওদের একটা কথা জিজ্ঞেস করুন, ব্রিগেডিয়ার সামরিক পোষাকে আছে, না সাধারণ পোষাকে।'

ওদিকে ডিজিপি মাহির হারুন আহমদ মুসার মেসেজ তার লোকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

ডিজিপি মাহির হারুন আহমদ মুসার মেসেজ ওদের পৌঁছে দিয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করল এবং আহমদ মুসাকে জানাল যে ব্রিগেডিয়ার সাধারণ পোষাকে রয়েছেন।

আহমদ মুসারা সবাই গাড়ি থেকে নেমেছে। তাদের সকলের চোখ বাড়ির মূল গেট ও গাড়ি বারান্দার দিকে। গাড়ি বারান্দায় একটি প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে। সেনাবাহিনীর নয় গাড়িটা।

আহমদ মুসা ব্রিগেডিয়ার সেলিমকে নিয়ে ভাবছিল। এখন তো তার বাইরে যাওয়ার কথা নয়, ডিউটির প্রয়োজন ছাড়া। আর প্লেইন পোষাকে যখন বেরিয়েছেন, তখন তো অফিসে বা কোন ডিউটিতে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে কেন বেরুচ্ছে? সাথের লোকটি তাহলে কোন গেস্ট বা বিশেষ কউ! শয়নকক্ষে নিয়ে গেছেন যখন, বিশেষ কেউই হবার কথা। গাড়িবারান্দায় যে প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে, সেটা কি তাহলে ঐ গেস্টের! বাড়িটা ঘুরে ওরা বেরিয়ে এল। নেমে এল গাড়িবারান্দায়।

গেস্ট লোকটি পঞ্চাশোর্ধ, টাক মাথা। কমপ্লিট ইউরোপীয় পোষাক, শুধু মাথায় হ্যাট নেই।

ব্রিগেডিয়ার দু'ধাপ সামনে এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে ধরল। গেস্ট লোকটি গাড়িতে ঢোকার আগে ব্রিগেডিয়ারের সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'জেনারেল, ইজদির থেকে মানে আপনার কাছ থেকে কাল সকালেই আমরা বড় আশা করছি। ইজদিরের সাফল্য হবে আমাদের জন্যে বড় সাফল্য।'

'ভাববেন না, সব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। আমরা বড় খবরই দেব।' বলল ব্রিগেডিয়ার সেলিম।

গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। চলতে লাগল গাড়ি।

আহমদ মুসা দ্রুত তাকাল ডিজিপি মাহির হারুনের দিকে। বলল, 'ওকে আপনারা আটকান। গেটে গিয়ে তাকে গেট খোলার জন্যে অথবা সিকউরিটিকে ডাকার জন্যে গাড়ি থেকে নামতে হবে। সেই সুযোগে তাকে আপনারা দু'জন গিয়ে আটকাবেন, আহত করে হলেও। আমি ব্রিগেডিয়ারকে দেখছি।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই ডিজিপি মাহির হারুন ও খাল্লিকান খাচিপ বাগানের মধ্যে দিয়ে দৌড় দিল গেট লক্ষ্যে।

গেস্টকে বিদায় দিয়ে ব্রিগেডিয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল বাড়ির দরজার দিকে।

আহমদ মুসা জুতার আগায় ভর করে বিড়ালের মত নিঃশব্দে ছুটল ব্রিগেডিয়ারের পেছনে।

গাড়িবারান্দা পেরিয়ে বারান্দায় উঠে গেছে ব্রিগেডিয়ার সেলিম।

আহমদ মুসা কয়েক ধাপ পেরিয়ে বারান্দায় উঠতে গিয়ে তার পায়ের শব্দ ব্রিগেডিয়ার সেলিমের কানে পৌঁছে গেল। বোঁ করে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল সে।

আহমদ মুসা তখন বারান্দায় উঠে গেছে। ব্রিগেডিয়ার সেলিমের মুখোমুখি সে।

হঠাৎ আহমদ মুসাকে সামনে দেখে অস্বাভাবিক একটা বিস্ময় ও বিমূঢ়তা ব্রিগেডিয়ার সেলিমকে আচ্ছন্ন করেছিল মুহুর্তের জন্যে। আর সেই সময়েই আহমদ মুসার রিভলভার ব্রিগেডিয়ার সেলিমের বুকে গিয়ে স্পর্শ করল।

ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গিয়েছিল ব্রিগেডিয়ার সেলিম।

আহমদ মুসা সময় নষ্ট করল না। বাম হাতটাকে আয়রন শীটের মত সোজা ও শক্ত করে একটা কারাত ছুড়ে দিল ব্রিগেডিয়ার সেলিমের ডান কানের নিচে ঘাড়ের নরম জায়াগাটায়। বজ্রের মত আঘাত হানল করাতটা।

ব্রিগেডিয়ার সেলিমের মাথাটা আগেই দুলে উঠল। তারপর শরীরটাও। সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেল সে।

আহমদ মুসা তার দু'হাত পিছমোড়া করে বেঁধে কাঁধে তুলে নিয়ে চলল গেটের দিকে।

গেটে গিয়ে আহমদ মুসা দেখল, ডিজিপি মাহির হারুন ও ডিপি খাল্লিকান খাচিপ ঐ লোকটাকে পাকড়াও করে বেঁধে ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু আহত হয়েছেন খাল্লিকান খাচিপ। তার ডান চোখের উপরে কপালটা ফেটে গেছে।

‘আহা, আপনি আহত হয়েছেন দেখছি, উহ! ঐ লোকটা যৌবনকালে মুষ্ঠিযোদ্ধা ছিল নাকি যে, আপনার চোখের আশ-পাশটাকেই টার্গেট করেছে!’ বলল আহমদ মুসা খাল্লিকান খাচিপের প্রতি সমবেদনার সুরে।

‘না, উনি লোকটার পেছনে ছুটতে গিয়ে গেটের দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছিলেন।’ ডিজিপি মাহির হারুন বলল। তার মুখে হাসির কিঞ্চিত ঝলক।

‘এবার চলুন। আমি বন্দী দু’জনকে আমার গাড়িতে নিচ্ছি। আর আপনারা দু’জন বন্দী লোকটির গাড়ি নিন। গাড়িও একটা প্রমাণ হতে পারে। আসুন তাড়াতাড়ি করি। কর্নেলের ওখানে যেতে হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওখানে আর যেতে হবে না স্যার। কর্নেল পালাচ্ছিল। আমাদের লোকদের ধরতে বলেছিলাম। ধরে নিয়ে আসছে। আমাদের এক গোয়েন্দা অফিসার কর্নেলে গুলিতে মারা গেছে স্যার।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

‘ধন্যবাদ মি. মাহির হারুন। আমাদের মিশন সফল। এখন এই মিশনের পেছনে যে আসল মিশন আছে তা সফল হলেই হয়। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। এদের মুখ থেকে দ্রুত কথা বের করতে যেন আমরা সমর্থ হই। সকালেই ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কী ঘটতে যাচ্ছে, কিভাবে ঘটতে যাচ্ছে, সেটা আমাদেরকে রাতের মধ্যেই জানতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমিন।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন সংগে সংগেই।

‘যদি না জানা যায়? যদি না কথা বলে ওরা?’ ডিপি খল্লিকান খাচিপ বলল।

‘চিন্তা নেই। বলবে ওরা কথা। ওদের মত দুর্নীতিবাজ খুনিদের আল্লাহ্ নেই, বেহেশত নেই। দুনিয়ার জীবনটা ওদের বড় প্রিয়। এরাও জানে তারা যা করে তা অন্যায়, দেশের চেয়ে, ঈমানের চেয়ে এদের কাছে জীবন বড়। কারণ জীবনের জন্যেই এদের কমিটমেন্ট। সুতরাং দু’একজন ব্যতিক্রম ছাড়া এরা কমিটমেন্টের জন্যে জীবন খোয়ায় না।’ বলল আহমদ মুসা।

গাড়িতে উঠল সবাই। দু’টি গাড়ি নেমে এল উপত্যকায়।

ওয়্যারলেস বিপ বিপ করে উঠল ডিজিপি মাহির হারুনের।

ডিজিপি মাহির হারুন অয়্যারলেস ধরেই বলল, ‘তোমরা আসছ কর্নেলকে নিয়ে?’

ওপারের কথা শুনে বলল, ‘আমরা গ্যারিসনের গেট পার হয়েই দাঁড়াচ্ছি। তোমরা এস।’

কথা শেষ করে ডিজিপি মাহির হারুন আহমদ মুসাকে বলল, ‘কর্নেলকে ধরে নিয়ে ওরা আসছে।’

গ্যারিসনের গেটের বাইরে কর্নেল জলাল জহির উদ্দিনকে ধরে নিয়ে গোয়েন্দার একটি দল আহমদ মুসাদের সাথে মিলিত হলো।

এবার তিনটি গাড়ি একত্রে যাত্রা শুরু করল। আহমদ মুসার গাড়ি আগে।

‘আমরা কি ইজদিরের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছি স্যার?’ জিজ্ঞাসা ডিজিপি মাহির হারুনের।

‘না, আমরা যাচ্ছি ইজদিরের দক্ষিণের জনমানবহীন মালভূমিতে। কথা আদায়ের ভালো জায়গা ওটা, আবার কবর দেবারও নিরিবিলি জায়গা।’ আহমদ মুসা বলল।

কবর দিতে হয়নি। আহমদ মুসার শুরুর বক্তৃতা, তার হাতের রিভলভার এবং চারদিকের শুনশান অবস্থা দেখেই আত্মসমর্পণ করল ব্রিগেডিয়ার সেলিম এবং কর্নেল জালাল। তারা দু’জনেই বলল, ‘তারা স্বেচ্ছায় নয়, ব্ল্যাকমেইলের শিকার হয়ে ওদের কথা শুনতে বাধ্য হয়েছে। কর্নেল বলেছে, নির্দোষ পথে অঢেল অর্থের লোভ দেখিয়ে ওরা তাকে তাদের জালে আটকায়। জালের অক্টোপাশ ক্রমশ কঠিন হয়ে ওঠে তার জন্যে। এভাবে সে ওদের হাতের পুতুলে পরিনত হয়েছে। আর ব্রিগেডিয়ার সেলিম বলেছে, ‘আমি যখন বিয়ে করার চিন্তা-ভাবনা করছিলাম, ঠিক তখনই সুন্দরী ও প্রতিভাবান এক মেয়ের প্রেমের ফাঁদে পড়ে যাই। বিয়ে হওয়ার পর মেয়েটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আমাকে নানা রকম অসৎ কাজে জড়ায় এবং আমাকে একজন ক্রিমিনালে পরিনত করে। আমি তারপর তাদের কাজ উদ্ধারের যন্ত্র হয়ে যাই।’

রাত শেষের সকালে তারা কী করতে যাচ্ছিল তার বিবরণ দেয়ার পর তারা কান্নজড়িত কণ্ঠে তাদের দুর্ভাগ্যের পটভূমি বর্ণনা করেছিল।

পরদিন সকালে তারা কী ঘটাতে যাচ্ছিল তার বিবরণ দিতে গিয়ে দু'জন একই কথা বলেছিল। তারা যে বিবরণ দিয়েছিল, তা এই:

'আমাদের বলা হয়েছিল তুরস্কে বিশেষ করে পূর্ব আনাতোলিয়ায় সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী শত শত বছর ধরে হত্যা, নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার। আর্মেনীয় জেনোসাইড তার একটা প্রমাণ। গোটা দুনিয়া এটা জানে, কারণ এই ঘটনা প্রচার পেয়েছে বিশ্ব জুড়ে। সেই হত্যা, নির্যাতন ও বৈষম্য এখনও চলছে। মাত্র গত কিছু দিনের মধ্যে পূর্ব আনাতোলিয়ায় হাজার হাজার মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে, জেলে গেছে আরও হাজার হাজার। পরিকল্পিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে ড্রাগ চোরাচালানসহ অন্যান্য অমূলক অভিযোগ আনা হয়েছে। আর...

আহমদ মুসা কর্নেল জালাল জহির উদ্দিনের কথার মাঝখানে বলে ওঠে, 'কিন্তু উচ্ছেদ হওয়া ও জেলে যাওয়া লোকজন যে আর্মেনীয় বা ইহুদি সংখ্যালঘু নয়, তা কি আপনারা জানেন? জানেন কি সংখ্যাগুরুরাই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে উচ্ছেদ হয়েছে এবং জেলেও গেছে সংখ্যাগুরুরাই? আর এই ষড়যন্ত্রের শিকার করেছে মাউন্ট আরারাতের উল্কি আঁকা আর্মেনীয় সংখ্যালঘুরাই করেছে।'

চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠেছে কর্নেল জালাল ও ব্রিগেডিয়র সেলিম দু'জনেরই। বলেছিল ব্রিগেডিয়ার সেলিম, 'আমরা এ বিষয়টা জানি না। আমরা তাদের কথা বিশ্বস করেছি। কারণ আমরা এটুকু জানতে পেরেছি, কিছুদিন থেকে পূর্ব আনাতোলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে ব্যপকভাবে লোক উচ্ছেদ হচ্ছে এবং ব্যপকভাবে গ্রেফতারও হচ্ছে। কারা গ্রেফতার হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কারা করছে, এ বিষয়গুলো আমাদের সমনে আসেনি।'

হেসেছিল আহমদ মুসা। বলল, 'যারা উচ্ছেদ করিয়েছে, জেলে পাঠিয়েছে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, তারাই নিজেদের নির্যাতিত বলে আপনাদের বোকা বানিয়েছে। যাক, বলুন কর্নেল আপনার কথা।'

কর্নেল শুরু করে আবার, 'তারা বলেছে, এই হত্যা, নির্যাতন, জেল জুলুমের অবসান ঘটাতে আন্তর্জাতিক মহলকে সবকিছু জানাতে হবে। জানাতে

হলে আর্মেনীয় জেনোসাইডের ভিকটিম হবে সংখ্যালঘুরাই। কয়েক হাজার সংখ্যালঘুর জীবনের বিনিময়ে যদি পূর্ব আনাতোলিয়া থেকে জুলুমশাহীর অবসান ঘটে, তাহলে এই আত্মত্যাগে কোন ক্ষতি নেই। এই আত্মত্যাগে সংখ্যালঘুরা প্রস্তুত। এখন তাদের হত্যা করার কাজটা সেনা অফিসারদের করতে হবে। এই হত্যা করার সময় পূর্ব আনাতোলিয়ার বিভিন্ন শহর, বন্দর, বাজারে হাজার হাজার লোক বিক্ষোভে ফেটে পড়বে। দোকন-পাট, হাট-বাজারে আগুন দেবে, পুলিশের উপর হামলা করবে। ব্যাপক বিক্ষোভ, বিদ্রোহের মুখে আসহায় পুলিশ পিছু হটবে। নৈরাজ্য বন্ধের জন্যে তখন সেনাদের ডাক পড়বে। সেটাই হবে আপনাদের এ্যাটাক করার মুহূর্ত। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখ বন্ধ করে গুলি চালাবেন। আপনাদের ইজদিরে ৫০ হাজার লোকের বিক্ষোভ হবে। এখানে কমপক্ষে ৩ হাজার লাশ আরা চাই।' থামে জালাল জহির উদ্দিন।

'অর্থাৎ, এভাবে পূর্ব আনাতোলিয়ার পূর্বাঞ্চলে ২৪টি শহর, বন্দর, বাজার থেকে লাশ চায় তারা। কিন্তু এই লাশ দিয়ে কী করবে তারা? তারা এই হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ্য করে গণবিপ্লব ঘটাতে চায়? কিন্তু তারা তো তা পারবে না। এত লাশ পড়ার পরে রাস্তায় কেউ নামবে না অবশ্যই সেনাদের মোকাবিলা করার জন্যে। তাহলে তারা কী চায়?' বলেছিল আহমদ মুসা।

'আমরা সেটা সুনির্দিষ্টভাবে জানি না স্যার। এ'নিয়ে তারা কখনও কথা বলেনি।' বলেছিল ব্রিগেডিয়ার সেলিম।

'আচ্ছা, আজ সকালে তোমাদের প্রোগ্রাম কী ছিল?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

কর্নেল জালালই শুরু করল আবার, 'আজ সকাল আটটায় শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ওরা মিছিল শুরু করবে। নয়টায় পৌঁছবে তারা সিটি সেন্টরে। এই সময়টা অফিসে যাবার, কাজে যাবার, কাজ শুরু করার সময়। মিছিলের ফলে শহরে একটা অচলাবস্থা দেখা দেবে। সিটি সেন্টার থেকেই ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ শুরু হবে। পুলিশের উপরও হামলা হবে। পুলিশকে ছত্রভংগ করা হবে। আত্মরক্ষার জন্যে তারা সরে দাঁড়াবে। এই সময় দশটার দিকে স্যার ব্রিগেডিয়ার সেলিম আস্-

সুযুতী আর্মি মুভ করতে নির্দেশ দেবেন বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্যে। এভাবেই তিন হাজার লাশ পড়ার ব্যবস্থা হবে।' থামে কর্নেল জালাল তার কথা শেষ করে।

কথাগুলো বলছিল কর্নেল জালাল ও ব্রিগেডিয়ার সেলিম ষড়যন্ত্রকারীদের একজন আগাসি খান জিয়ানকে সামনে রেখেই। যিনি ধরা পড়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার সেলিরে সাথে তার বাড়িতে।

আগাসি খান জিয়ান মাথা নিচু করে বসেছিল। তার হাত দু'টি পিছ মোড়া করে বাঁধা।

আহমদ মুসা বাম হাত দিয়ে তার মুখ উপরে তুলে ধরে বলল, 'আপনার পরিচয় ব্রিগেডিয়ার বলেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, আপনি বড় কোন নেতা নন। বিচারে আপনার শাস্তি হতে পারে, কিন্তু সেটা প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডের পর্যায়ে যাবে না। আর যদি আপনি সহযোগিতা করেন, তাহলে আপনার এই সহায়তার জন্য শাস্তি আরও লঘু হতে পারে। অন্যদিকে, আপনি যদি আমাদের সহায়তা না করেন, তাহলে আপনার প্রাণ যাবে। আপনার কাছে যে সহায়তা আমরা চাই, সেটা হলো, আপনাদের সংগঠন এই লাশ চাচ্ছে কেন? কী লক্ষ্য তাদের? আপনি শুনে রাখুন, এক প্রশ্ন আমি দু'বার করি না। আমি দশ পর্যন্ত গুণব, এর মধ্যে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আপনাকে।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা দশ পর্যন্ত সংখ্যা গুণা শুরু করল।

গুণতে গিয়ে নয় উচ্চারণ করেই আহমদ মুসা তার রিভলভার তুলে একটা গুলি চালাল আগাসি খান জিয়ানের লক্ষ্যে। গুলিটা তার মাথার ডান পাশের এক গুচ্ছ চুল তুলে নিয়ে চলে গেল।

লোকটা ভীষণ চমকে উঠল। ভয়ে আতংকে চুপসে গেল তার মুখ।

আহমদ মুসা দশ গুণার সাথে সাথেই সে চিৎকার করে উঠল। বলল, 'আমি বলছি, সব কথা আমি বলছি।'

আহমদ মুসা দশ না গুণে রিভলভার নামিয়ে নিয়ে বলল, 'বলুন, লাশ কেন চাচ্ছে আপনাদের সংগঠন?'

'আমাদের সংগঠন এই ধরনের একটা জেনোসাইড চাচ্ছে সারা বিশ্বকে পাশে পাবার জন্যে। বিশ্বের কাছে প্রমাণ করার জন্যে যে এই ভূখণ্ডের মানুষ

তুরস্কের হাতে নিরাপদ নয়, এই কথাও প্রমাণ করার জন্যে যে, এই ভূখণ্ড তুরস্কের অধীনে থাকতে পারে না।’ বলল আগাসি খান জিয়ান।

‘কিভাবে বিশ্বকে সব উল্লেখযোগ্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক পূর্ব তুর্কিস্তানের ২৪টি স্পটে এসে পৌঁছেছে। তারা সব হত্যার ফটো ও নিউজ সংগ্রহ করবে এবং আজ থেকে কয়েকদিন পূর্ব-তুর্কিস্তানের এ ঘটনাই বিশ্বের প্রধান নিউজ হবে। ছবি ও নিউজের অব্যাহত প্রচার এমন জনমত গঠন করবে যা তুরস্ককে একঘরে করে পূর্ব আনাতোলিয়াকে একটা স্বাধীন আর্মেনীয় রাষ্ট্রে পরিণত করবে। যেমনটা পূর্ব তিমুরের ক্ষেত্রে হয়েছে।’ কথা শেষ করল আগাসি খান জিয়ান।

আহমদ মুসার মুখে অবাক বিস্ময়ের ছাপ। আহমদ মুসা অনেক কিছু ভেবেছে, কিন্তু এই সংঘাতিক বিষয়টা তার ভাবনায় আসেনি। একটা রাষ্ট্রের একটা অঞ্চলকে নিয়ে কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র!

আহমদ মুসা আগাসি খান জিয়ানকে ধন্যবাদ দিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করে জেনারেল মোস্তফাকে আগাসি খান জিয়ান যা বলল সব জানাল।

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। তুরস্ককে আপনি বাঁচালেন। ২৪টি স্পটের বিক্ষোভের স্থানে গুলি করার জন্যে যারা নির্ধারিত তারা সকালের অনেক আগেই গ্রেফতার হবে। তাদের সবার বাড়ি ঘিরে রাখা হয়েছে। আপনার এই টেলিফোনের অপেক্ষায় ছিলাম শুধু। তারা ২৪টি স্পটের কোথাও জমায়েত হতে পারবে না তার ব্যবস্থা ভোর হওয়ার আগেই সম্পন্ন হবে। বিদেশী প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদিকরা সব জায়গায় শান্তি শৃঙ্খলা দেখতে পাবে। আপনি ডিজিপি মাহির হারুনকে আমার সাথে কথা বলতে বলবেন। আমি সেনা প্রধান, পুলিশ প্রধান এখন প্রধানমন্ত্রীর অফিসে বসে আছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আস্-সালামু আলাইকুম।’ মোবাইলে কথা শেষ হতেই আগাসি খান জিয়ান বলল, ‘স্যার, এই ষড়যন্ত্রই শেষ নয়। এর চেয়েও ভয়াবহ এক ষড়যন্ত্র তারা এঁটেছে।’

‘কী সেটা?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আদিগন্ত এক সমুদ্রের বিশাল জনমানবহীন এলাকার একটা দ্বীপে ইউরোপ আমেরিকাসহ কিছু দেশের আলট্রান্যাশনালিস্ট মন্ত্রীদের যুক্তফ্রন্ট ব্ল্যাকহেড সিন্ডিকেটের রাজ্য গঠন হচ্ছে। অস্ত্র-শস্ত্রসহ সব ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা তাদের থাকবে। গণতন্ত্র, ধর্মসহ সব ধরনের নীতি-নৈতিকতার তারা বিরোধী। পশ্চিমের কিছু দেশ ও সরকারও তাদের টার্গেট। কিন্তু প্রধান টার্গেট হলো ইসলাম ও মুসলমানরা। কারণ তারা মনে করে আজকের দুনিয়ায় ইসলামই একমাত্র নৈতিক বিধানের ধর্ম। তাই ইসলাম তাদের প্রথম টার্গেট। মুসলিম দুনিয়ার সফল রাজনীতিক, সফল বিজ্ঞানী, সফল শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের শত্রু। ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকজন সফল বিজ্ঞানী, সফল রাজনীতিক, সফল শিক্ষাবিদকে কিডন্যাপ, নিস্ক্রিয় ও ইলিমিনেট করা হয়েছে। এটা সময়কে তারা নির্দিষ্ট করেছে। এই সময়ের মধ্যে তারা ইলিমিনেশন প্রোগ্রাম শেষ করবে।’ থামল আগাসি খান জিয়ান।

‘কিন্তু তাদের আল্টিমেট টার্গেট কী? তারা কোন লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘সেটা আমি জানি না স্যার। ঘটনাক্রমে আমি এ বিষয়টা জানতে পারি এবং আমি নিজে মানবতা বিরোধী এই কাজকে সমর্থন করি না বলেই বিষয়টা আপনাকে জানালাম।’ বলল আগাসি খান জিয়ান।

আগাসি খান জিয়ানের এই কথাগুলোর একটা বর্ণও আহমদ মুসার কানে প্রবেশ করেনি। তার মনে পড়ে গিয়েছিল কয়েকদিন আগে ভ্যান টাইমসে পড়া একটা ছোট খবরের কথা। খবরে রহস্যপূর্ণভাবে হারিয়ে যাওয়া কয়েকজন মানুষের কথা বলা হয়েছিল। বিভিন্ন দেশ থেকে দুইজন বিজ্ঞানী, তিন জন রাজনীতিক ও চারজন বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাবিদ হারিয়ে যাওয়ার খবর ছিল ঐ নিউজ আইটেমে। সবাই মুসলিম দেশের নাগরিক এবং হারিয়ে যাওয়া লোকরা সবাই ছিল মুসলিম। নিউজের বিষয়টা মনে হতেই আঁৎকে উঠল আহমদ মুসা। খবরটা মিলে যাচ্ছে আগাসি খান জিয়ানের কথার সাথে।

‘আচ্ছা, ব্ল্যাকহেড সিন্ডিকেটের লোকদের রাজনৈতিক মতাদর্শ কী?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘কিছু আলোচনা আমি শুনেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, ওরা দুনিয়ায় হোয়াইটদের সুপ্রিম্যাসি এবং হোয়াইটদের ধর্ম ক্রিশ্চিয়ানিটি ও ইহুদিবাদের সুপ্রিম্যাসি চায়।’ বলল আগাসি খান জিয়ান।

‘কিন্তু ইহুদি ধর্ম তো হোয়াইটদের নয়, সেমিটিকদের। এখনও তাদের ধর্মগোষ্ঠীকে সেমেটিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখায় সফল হয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার কথা ঠিক। গত দেড়শ’ বছরের খ্রীস্টান ইভানজেলিস্ট আন্দোলন একটি রাজনৈতিক লক্ষ্যে খ্রীস্টান ও ইহুদিদের একটা ঐক্য গড়তে সমর্থ হয়েছে। এখন খ্রীস্টানরা একথা বলছে যে, আরাইলই হবে যিশুখ্রীস্টের শেষ যুদ্ধের শেষ রঙ্গমঞ্চ। অতএব, ইসরাইল শুধু ইহুদিদের নয়, খ্রীস্টানদেরও। এই লক্ষ্যে খ্রীস্টান ও ইহুদিদের নতুন প্রজন্ম একটা ঐক্য গড়ে তুলেছে।’ আগাসি খান জিয়ান বলল।

‘হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। এ বিষয়ে আমারও কিছু জানা আছে। এটা একটা ডেকোরাম কোয়ালিশন। ব্ল্যাকহেড সিন্ডিকেটের এটাই যদি রাজনৈতিক মতাদর্শ হয়, তাহলে তা খুবই বিপজ্জনক হবে।’

বলেই আহমদ মুসা তাকাল ডিজিপি মাহির হারুনের দিকে। বলল, ‘আমি এখন উঠব। কাজ এখানে শেষ। আপনি এই তিনজনকে পুলিশ কাস্টডিতে পাঠিয়ে দিন। আমি এদের ব্যপারে সরকারকে বলব, যাতে এদেরকে আসামী নয়, সাক্ষী বানানো যায়।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালো।

ডিজিপি মাহির হারুন ও খাল্লিকান খাচিপ তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তাদের চোখে অসীম শ্রদ্ধার বহিপ্রকাশ। ওরা কিছু বলতে চেয়েও পারল না। আমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করেছে গাড়ির দিকে।

সদ্য বিবাহিত ড. আজদা আয়েশা ও ড. মোহাম্মদ বারজেনজো, দু'জনেই বর ও বধূবেশে এসে সালাম করল আহমদ মুসাকে! তাদের দু'পাশে দু'জনের পরিবারের সিনিয়র সদস্যরা।

আহমদ মুসা ড. আজদা ও ড. বারজেনজো-কে দোয়া করে বলল, 'তোমরা নবী-নন্দিনী ফাতেমা (রাঃ)ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মত হও।'

অশ্রু গড়াচ্ছিল বর-বধুর চোখ থেকে।

পাশে দাঁড়ানো ড. বারজেনজো'র পিতা বলল, 'স্যার, আপনি শুধু দু'জনকে, দুই পরিবারকে নয় দুই বিবাদমান কম্যুনিটিকে একাত্ম করেছেন। আপনি আমাদের তুরস্ককে বাঁচিয়েছেন যেমন, তেমনি বাঁচিয়েছেন দুই কম্যুনিটিকে।' তার কণ্ঠ আবেগরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল শেষ দিকে।

'দুই কম্যুনিটিকে একাত্ম শুধু নয়, আমাদেরকেও একটা অন্ধকার গহ্বর থেকে তুলে এনেছেন। আমাদের ঈমান ফিরে পেয়েছি। আমাদের রাজনীতিও হয়েছে পরিশুদ্ধ। আমাদের পরিবার ও আমাদের কম্যুনিটি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।' বলল মস্কো থেকে আসা ড. আজদার বাবা। তারও কথাগুলো শেষে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

'আমি শুধু নিমিত্ত মাত্র। আল্লাহর ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

স্যার, সকলের ইচ্ছায়ই 'ভ্যানে'ই বিয়ের আনুষ্ঠান হলো। আগামী পরশু আমাদের গ্রামের বাড়ি আরিয়াসে উভয় পক্ষ থেকে যৌথভাবে অনুষ্ঠান হবে, সেখানে আপনি প্রধান অতিথি। আজই আপনাকে আমরা সেখানে নিয়ে যাব। বর-বধু বাসর হবে।' বলল ড. আজদার মা।

আহমদ মুসা শুনে হাসল। বলল, 'যেতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু আমার ফ্লাইট আজ সাড়ে ১২টায়।'

চমকে উঠল ড. আজদা এবং ড. বারজেনজো, দু'জনেই। বলল ড. আজদা, 'সাড়ে ১২টায় আপনার ফ্লাইট? কোথায় যাবেন? আমরা তো কেউ জানি না!'

'আমার এ ফ্লাইট যাবে মদিনা শরীফে।' বলল আহমদ মুসা।

‘কোথায় ভাইয়া, জরুরী কাজটা কী? আর কোন আজদা আপনাকে ডেকেছে?’ বলল ড. আজদা। বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলল।

‘না বোন, এবার কোন আজদার সন্ধানে নয়, এবার আমার যাত্রা একটি দ্বীপের সন্ধানে।’

বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে। ফিরে তাকাল টার্কিস এয়ার লাইন্সের এক অফিসারের দিকে। বলল, ‘দেরি করে ফেললাম কি খুব?’

‘না স্যার, আপনার জন্যে একটা বিশেষ বিমান তুরস্ক সরকার ব্যবস্থা করেছেন। অসুবিধা নেই।’ বলল টার্কিস এয়ার লাইন্সের অফিসার।

আহমদ মুসা সবাইকে সালাম দিয়ে টার্কিস এয়ার লাইন্সের অফিসারের সাথে হাঁটতে লাগল।

ফিরে তাকাল না পেছনে। অশ্রু ও স্নেহের বাঁধনের কাছে সে খুব দুর্বল। সে জন্যেই অতীতের দিকে তাকাতে তার ভয় হয়। ভয় হয় ফাতেমা ফারহানা, মেরী, আয়েশা আলিয়েভা, তাতিয়ানা, মেইলিগুলিদের মুখ সামনে আনতে।

আহমদ মুসারও চোখের দু’কোণ ভিজে উঠেছিল। আঙুল দিয়ে চোখটা মুছে ফেলে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল আহমদ মুসা।

পরবর্তী বই

একটি দ্বীপের সন্ধানে

কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. **Ferdous Al Quraeshi**
2. **Bondi Beduyin**